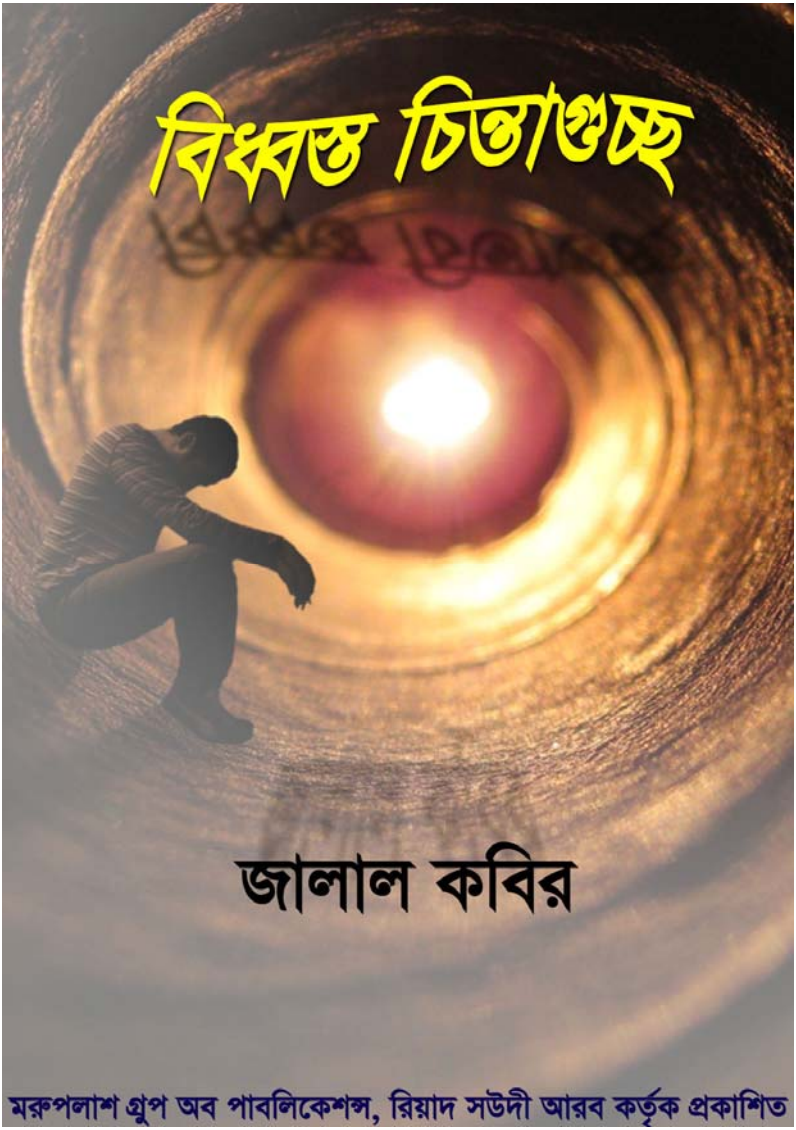

www.marupalash.net e-mail: marupalash@gmail.com

মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স, রিয়াদ, সউদী আরব কর্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশঃ (সংশোধিত) ৩০ মার্চ ২০১২। পৃষ্ঠা #১/১৩০

www.marupalash.net e-mail: marupalash@gmail.com

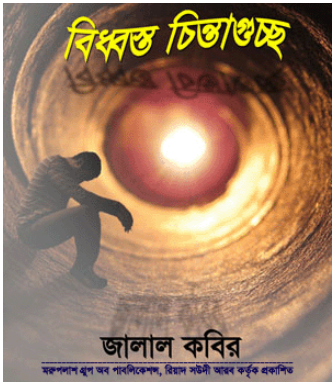

বিধ্বস্ত চিন্তাগুচ্ছ

জালাল কবির

(নির্বাচিত প্রবন্ধ)

প্রকাশকঃ দেওয়ান আবদুল বাসেত
প্রচ্ছদ শিল্পীঃ আনোয়ার হোসেন শিপন
ইন্টারনেট সংস্করণঃ মরুপলাশ এ বিশ্বব্যাপী প্রচারিত।

ইন্টারনেটে প্রকাশ ঃ সংশোধিত সংস্করণ মার্চ ৩০, ২০১২

গ্রন্থস্বত্বঃ লেখক

মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স, রিয়াদ -সউদী আরব।

www.marupalash.net e-mail: marupalash@gmail.com

লেখক পরিচিতি

জালাল উদ্দিন কবিরের জন্ম সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার 'নালবহর' গ্রামে। বিয়ানীবাজার কলেজ থেকে ১৯৭৫ সালে গ্রাজুয়েট পরীক্ষা দেন। বাঙলা ভাষা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদে পরম বিশ্বাসী জালাল কবির ১৯৭৫ এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষোভে ঘৃণায় দেশ ত্যাগ করেন শরবিদ্ধ পাখির মতো। তারপর উড়ে উড়ে চলাই হয়ে উঠে তার জীবনের অংশ।

স্বদেশে বিদেশে পথ চলতে চলতেই সব কিছু দেখা এবং লেখা। মানবিক ন্যায়-নীতি, সরলতা, সমবেদনা, দেশপ্রেম, বিরহ, নারী ও প্রকৃতির অনন্য রূপ তাকে তাড়িয়ে মেরেছে জীবনের পথে পথে। তার প্রবন্ধ এবং কবিতার সরল রৈখিকে ফুটে উঠেছে এর স্বাক্ষর। ২০০৯ সালের বই মেলাতে জালাল কবিরের গবেষণামুলক রাজনৈতিক প্রবন্ধের বই "বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতির রূপরেখা" প্রকাশ হয়েছে আর ২০১০ সালে প্রকাশ পেয়েছে কবিতার বই "হৃদয়ের একূল ওকূল"।

২০১১ সালে ছাপা হলো "বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতির রূপরেখা" বইটির দ্বিতীয় সংস্করন। একই সাথে ছাপা হলো **"বিধ্বস্ত চিন্তাগুচ্ছ"** নামের নতুন বইটি। জালাল কবির আবেগ ও রোমান্টিকতার সরোবরে ঝাপ না দিয়ে দেশের নির্যাতিত বঞ্চিত মানুষের প্রতি ভালোবাসার সাক্ষর হিসাবে চালিয়েছেন তার কলম। অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে মানুষের সামনে নিয়ে এসেছেন বাস্তবধর্মী ও মর্মস্পর্শী কথাগুলো। সেই কথাগুলোর সঙ্গে **'বিধ্বস্ত চিন্তাগুচ্ছ'** ছড়িয়ে যাক জনকল্যালের স্বার্থে 'মরুপলাশ' এর মাধ্যমে স্বদেশে ও বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে। বরাবরের মতো জালাল কবিরের বইগুলো পাঠক সমাজে বিপুল সাড়া জাগাবে - এটাই আমাদের বিশ্বাস।

- দেওয়ান আবদুল বাসেত

সম্পাদক, মরুপলাশ, রিয়াদ সউদী আরব।

৩০মার্চ, ২০১২।

প্রকাশকালঃ
প্রথম প্রকাশ – অমর একুশে বইমেলা ২০১১

প্রকাশকঃ মোস্তাফা সেলিম
উৎস প্রকাশন
১২৭ আজিজ সুপার মার্কেট (দোতালা)
শাহবাগ – ঢাকা
ফোন: ০১৭১৫ ৪০৪১৩৪
utsopro@yahoo.com

প্রচ্ছদঃ নাবিলা মারজুক শান্তা
মোট শব্দ সংখ্যাঃ ৩১,১২৭

ইন্টারনেট সংস্করণঃ মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স, সউদী আরব
৩০ মার্চ, ২০১২ (সংশোধিত)

মুল্যঃ স্বদেশে ১৭৫ টাকা : ইউরোপ ও আমেরিকায়: ৮ ডলার
মধ্যপ্রাচ্যে ঃ ১২ সৌদি রিয়াল

ISBN NO:

সুচিপত্র

১। গরিবের দুয়ারে হাতীর পা
২। ক্ষমতার নীলনক্সায় তৃণমুল মানুষের অবস্থান
৩। আমি বাংলার গান গাই।
৪। সমস্যার মুল শিকড়
৫। অর্পিত সম্পত্তি আইন এবং আমাদের জাতীয় সঙ্কট
৬। হৃদয় দিয়ে দেখো
৭। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং আমাদের রাজনীতি
৮। বাঙালির অতীত প্রেম ও দুরের মানুষ
৯। সত্যের নুপুর ধ্বনি
১০। বিএনপি'র রাজনীতি
১১। সম্মিলিত বৃহৎ বাংলার স্বপ্ন ও বর্তমান বাঙালি
১২। একটি অপুরণীয় ক্ষতি
১৩। বদরাগী বউ
১৪। হামছে বড়া কৌন হ্যায়
১৫। কালের চক্রে দুর্ভিক্ষের বিশাল দৈত্য
১৬। বিছমিলস্নাহর রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা
১৭। পাকিস্ত্মান রাষ্ট্রটি আর আমাদের কত জ্বালাবে?
১৮। জাতীয় বিপস্নব এবং সংহতি দিবস
১৯। ছোট্ট মুখে বড় কথা
২০। দিন বদলের সরকার
২১। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা
২২। জনগণ আর কত ষড়যন্ত্র দেখবে
২৩। নির্মম ফারাক্কা বাঁধ
২৪। ওদের ফাঁসি কত দুরে
২৫। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক
২৬। যদি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ আসে
২৭। নতুন ঘরে পুরানো আসবাবপত্র
২৮। হরতালের রাজনীতি
২৯। পারিবারিক নির্যাতন
৩০। ডক্টর ইউনুসের ঘোষণা

উৎসর্গ

যে ব্যক্তিদ্বয়ের সাথে আমার কোনো বাস্তব পরিচয় নেই, অথচ তাঁদের লিখা পড়ে শ্রদ্ধায় বিগলিত হয় হৃদয়ের পাপড়ি; যাঁদের কলমের ঘন্টাধ্বনি দেশ ও সমাজ নিয়ে ভাবায় ; সেই শিক্ষক **তারেক শামসুর রহমান** এবং সাংবাদিক **আব্দুল মতিন খান**'কে–

দু'টো কথা (মুখবন্ধ)

দেশ, সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে অনেকেই ভাবেন, হয়তো লিখতে পারেন না বলে মনে মনে অনুতাপও করেন। কিন্তু সব লিখাই যে সবার মনের মতো হবে এমন কোনো কথা নেই। কারণ জাগতিক জ্ঞান অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক দর্শন সবার সমান নহে। বিভিন্ন সময়ের নানাবিধ সমাজচিত্র মনকে উত্তপ্ত করে, কখনও কখনও তা আমাদেরকে আক্ষেপের আঁধারে নিয়ে যায়। মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে আমরা সমাজে বাস করতে চাই একটুখানি শান্তির আলো-বাতাসে।

অথচ রাজনীতির চত্বরে সমাজের জটিল ও কুটিল বাস্তবতা আমাদেরকে সর্বদাই করেছে হতাশ। সেই হতাশার জন্য যারা দায়ী তাদেরকে চিহ্নিত করাও ন্যায়বোধের একটি দাবী। বাস্তবতা এবং অভিজ্ঞতার চেতনা থেকেই আমি লিখেছি এসব ছোট্ট ছোট্ট কথাগুলো সাপ্তাহিক পত্রিকায়। ধন্য হবো যদি আমার কথাগুলো আপনার মনের কথা হয়ে যায়।

জালাল উদ্দিন কবির।
১লা জুন ২০১০
Jalal.kobir@gmail.com

১ ♦ গরিবের দুয়ারে হাতীর পা ♦

গত ১৯ জুন ২০০৩ তারিখে আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী কলিন পাওয়েল বাংলাদেশে এক ঝটিকা সফর করেন। এই সফরের উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ভিন্ন মতামত ছাপা হয়েছে। ইরাকে শান্তি, পুনর্বাসন ও স্থিতিশীলতার নামে বাংলাদেশ থেকে সৈন্য পাঠানোর অনুরোধ, বাংলাদেশে সীমিত সংখ্যক আমেরিকান সৈন্য রাখার অঘোষণীয় আলোচনা, বাংলাদেশের সন্ত্রাস দমন, দরিদ্র বিমোচন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা দান এই সফরের মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে প্রতিটি পত্রিকা দেশবাসীকে অবহিত করেছে।

'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকাটির খবর থেকে আরও জানা যায় অর্থনৈতিক স্বার্থে বাংলাদেশ কি ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করতে পারে সে বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করতে চায়। বাংলাদেশ কী ভাবে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন করবে তার উপর জরুরি উপদেশ খয়রাত ইত্যাদি ছিল খবরের মুখ্য বিষয়।

উপরে উলিস্নখিত খবর বাংলাদেশের রাজনৈতিক পালাবদলের ভিক্ষুকদের জন্য মহা উলস্নাসের ব্যাপার। কিন্তু যারা ইতিহাস জানেন, যারা প্রতিনিয়ত বিশ্বের রাজনৈতিক উত্তেজনাময় ঘটনার খবর রাখেন এবং নিজের দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে দূরদর্শী তারা ভালই জানেন কলিন পাওয়েলের এ সফর 'গরিবের দুয়ারে হাতীর পা' রাখার মতো অত্যন্ত অর্থবোধক। বৈদেশিক সাহায্যের বিনিময়ে কখনও কোনো জাতির মাথাপিছু আয় বাড়ে না কিংবা ক্রয় ক্ষমতাও বাড়ে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চাকুরির সামান্য সংস্থান হলেও তা হয় অস্থায়ী এবং সেখানে থাকে শ্রমিক শোষণের নির্যাতন।

বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য আমেরিকার মাথা ব্যথার কি কারণ থাকতে পারে? তা সাধারণ খবর পাঠকও বুঝতে পারেন। যারা মিথ্যে অজুহাতে পৃথিবীর যে কোনো দেশ আক্রমন করার গুন্ডামী দেখায়, যারা মুসলিম অধ্যুষিত কোনো দেশে আণবিক শক্তির অধিকার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তাদের নিজের প্রযুক্তির কাছে জিম্মি ও বন্ধকী রাখতে বদ্ধ পরিকর, তাদের মুখে আরেকটি দেশের উন্নয়নের কথা শুধু কুমীরের মায়া কান্না নহে পুরোদস্তুর বেহায়ার মুখ যুঝানোর মতো ব্যাপার। এসব উন্নয়নের জন্য নানাবিধ গোপনীয় শর্ত থাকে। উদাহরণ হিসাবে প্রথমে উলেস্নখ করা যায় বিদেশী এক্সপার্ট নিয়োগের কথা।

এই নিয়োগের মাধ্যমে পারিশ্রমিক হিসাবে উন্নয়নের একদশমাংশ অর্থ হাতিয়ে নেয়ার মূল পরিকল্পনাটি নিহিত থাকে। যারা প্রতিনিয়ত বহুমুখি অস্ত্র ও গোলাবারুদ উৎপাদন করে বিশ্বের দেশে দেশে বিক্রি করে এবং পুণরায় রাজনীতির মঞ্চে এসে সন্ত্রাস বন্ধের কথা বলে তখন বনের ভাষাহীন গাধাও হেসে উঠে। দরিদ্র বিমোচন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং গণতন্ত্রের উন্নয়ন, এসব কথা আমাদের বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষ শুনে এসেছেন, আমরাও প্রতিনিয়ত শুনছি।

দেশের মানুষ খাদ্য শিক্ষা চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক চাহিদার যে অন্ধকারে ডুবে রয়েছেন সেই অন্ধকার থেকে তারা আজও আলো পায় নি। যুগে যুগে ভিন দেশী বেনিয়ারা গরিব ও নিরীহ জাতির সম্পদকে ছলে বলে কলে কৌশলে হাতিয়ে নিয়েছে। সেই উদ্দেশ্য আজও বহাল তবিয়তে ঠিকে আছে, বদলেছে শুধু কৌশল।

তাদের মুখে থাকে তোষামোদী আশ্বাস, আর ভিতরে থাকে ভিন্ন ভিন্ন কঠিন শর্তের বন্ধন। সরকার দেশের জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের কথা বলে, কিন্তু চলে শ্রেণী-শোষকদের নির্দেশে। ভোট জয়লাভের পর তারা সাম্রাজ্যবাদী বেনিয়াদের পণ্য বিক্রির অধিকার এবং মুনাফার নিশ্চয়তা প্রদান করে। মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সকল প্রকার সুবিদা দানের শর্তাদি হচ্ছে তার উপযুক্ত প্রমাণ। স্যুটপরা অদক্ষ রাজনীতিবিদ কিংবা মধ্যপ্রাচ্যের উপাধি দেওয়া মিছকীন রাজনীতিবিদ ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গোরা বৈদেশিক সুদভিত্তিক সাহায্যের সিংহভাগ দিয়ে বসুন্ধরা, আলপনা, মধুমতি এরকম বহু ধরনের আবাসিক ইমারত নির্মাণের ব্যবসা খুলে বসে।

উন্নয়নের বড় বড় কণ্ট্রাক্ট গুলো নিজেদের আত্মীয় স্বজন এবং শ্রেণী শোষকদের মধ্যে বিলিবণ্টন করে। ২০ জুন ২০০৩ তারিখের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বিশ্ব ব্যাঙ্কের ৫৩ কোটি ৬০ লাখ ডলারের ঋণসহায়তার কথা। তাও নাকি বিনা সুদে। জন্মের পর এই প্রথমবার আমি জানতে পেলাম বিনা সুদে বাংলাদেশ ঋণ পাচ্ছে। এই ঋণের টাকায় শোষণমূলক মুনাফা লুটার যে ব্যবসায়িক নীলনক্সা আছে, সে কথা তো বনের সেই গাধাটিও জানে। তেপান্ন কোটি ষাট লাখ ডলার দিয়ে বাংলাদেশের মতো একটি দেশকে জাপানী কিংবা কোরিয়ান প্রযুক্তির সহায়তায় বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে সারাদেশকে শিল্পখাত সহ বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত করা যায়।

সরকার কেন সেই পদক্ষেপ নেয় নি ? সরকার প্রেসনোটে ঘোষণা দেন, 'যে কাজ করার জন্য শর্ত সাপেক্ষে ঋণ এনেছি সেই কাজ না হলে আমরা চুক্তি অনুযায়ী ভবিষ্যতে সাহায্য পাবো না'। তাহলে প্রশ্ন দাড়ায় প্রতি বৎসর'ই তো সরকার চুক্তি অনুযায়ী সব কাজ করতে পারে না তখন নানা রকমের ধমকানি, শাসানি ও কানমলা খেতে হয় ঋণ দাতা দেশ বা

প্রতিষ্ঠান গুলোর পক্ষ থেকে। বারবার গ-ারের চামড়া গায়ে দিয়ে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ান হয় আমাদের সরকার। এতগুলো টাকা ঋণ এনে তা যদি আজে বাজে প্রকল্পতে না খাটিয়ে এক তরফা বিদ্যুৎ উৎপাদন করে দেশকে স্বয়ংসর্ম্পুণতার দ্বারে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে ঋণ দাতাদের নাকানি চুবানি কিংবা নাকমলা কানমলা খেয়ে হজম করা হাজার গুণে শ্রেয় নয় কি ? যদি তাও না করা যায় তাহলে প্রতিটি বাড়িতে সৌরবিদ্যুতের ব্যবস্থা করে আলো জ্বালানো এবং ফ্যান চালানোর দায় থেকে যে পরিমান বিদ্যুৎ বাঁচবে, সেই বিদ্যুৎ শিল্পখাতে কিংবা কৃষিখাতে কাজে লাগালে দেশের প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে।

দেখা যাক সেই বিনা সুদের ঋণ দিয়ে কোন কোন উন্নয়নের জোয়ারে (বিএনপি) দেশটা ভাসবে। (১) পলস্নী এলাকার উন্নয়ন মানেই তো সাহায্যের মাত্র ৩% খরচ করে পঁচা সুতার মতো কিছু কাঁচা রাস্ত্মা নির্মাণ আর দাত-খেলাল সদৃশ্য খুঁটি ও রড দিয়ে কার্লভার্ট নির্মাণ। হালু-বাঙ্গালের জন্য এসব রাস্ত্মাই যথেষ্ট। কারণ তাদের আত্মসন্তুস্টি হচ্ছে 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো'। বিদেশী পণ্য হিসাবে পায়ের 'নাইকী' জুতো এই রাস্ত্মার জন্য বেশ আরামদায়ক। এসব রাস্ত্মা দিয়ে কলিন পাওয়েলের কোকা-কোলা থেকে শুরম্ন করে পিস্ত্মল গোলাবারম্নদ এবং আজকালকার 'ডলার শপে' (প্রত্যেক আইটেমের দাম ১ ডলার) পাওয়া যায় যেসব মালামাল, সেরকম অগণিত মালামাল গ্রামে গঞ্জে ভালই বিক্রি হবে এই দরিদ্র দেশটিতে।

এই সাহায্যের কথা ভাবতে গিয়ে বাল্যকালের একটি কথা আমার মনে পড়ে। যেদিন আমার চাচার বাড়ীতে সকাল বেলা গাভী দুধ দিত না। সেদিন চাচা দিন মজুর জওহর সিংকে ডেকে বলতেন 'যা তো বাছাধন টিলা বাগান থেকে গাভীর জন্য তাজা দুবড়ি ঘাস নিয়ে আয়'। পরদিন দেখা যেত গাভী ঠিকই দুধ দিচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতি আমেরিকার এই সাহায্য নতুন করে গাভীকে দুবড়ি ঘাস গেলানোর মতই স্পষ্ট। বিনা সুদে ঋণদান এ যেন স্বর্গীয় আম্বিয়াদের মতো মহা উদারতার পরিচয়।

ভাল করে খোঁজ খবর নিলে দেখা যাবে, এই বিনা সুদের ঋণ হয়তো বড়জোর এক বৎসরের জন্য। দাতা গোষ্ঠী ভালই জানে বাংলাদেশ একশো বৎসরেও এই ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না। এবং এর'ই বিনিময়ে অন্যান্য সুবিধাদি হাতিয়ে নেয়া যাবে। এ কারণে জনগণকে খুশ করা আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অদুরদর্শী রাজনীতিবিদদের টোপ গেলাতে পারলে ঋণদাতাদের পোয়াবারো।

(২) বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ও কারিগরি সহায়তা বলতে দেশের জনগণ বুঝেন 'উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে'। অর্থাৎ একজন ফোন করবে আর অন্যজনের ঘাড়ে তার বিল পরিশোধের ঝামেলা বাড়বে। (মোবাইল ফোন দেশে চালু হওয়ার আগের কথা)

বাংলাদেশের মতো গরিব রাষ্ট্রের জনসাধারণের জন্য মোবাইল বা সেলুলার ফোনের অঢেল ব্যবসায় বহুজাতিক কোম্পানীগুলো প্রচুর মুনাফা লুটে নিচ্ছে। মানুষের খাদ্যের অভাব, উপযুক্ত পুষ্টির অভাব, শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাব, সেদিকে পয়সা খরচের নজর না দিয়ে মোবাইল ফোন দিয়ে কথা বলার খাহেশকে আরও চাঙ্গা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে অপব্যয়ী করে তুলা।
এক টাকা, দুই টাকা, এমনি করে সর্বত্রই যখন ফোন চলতে থাকে তখন দেখা যায় কথা বলার প্রতিমিনিটের প্রতি কারো খেয়াল থাকে না। শেষ অবধি যা হবার তা হয়, সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রতি মাসে কমপক্ষে দুই তিনশত টাকা ব্যবসা হয়ে যায়। এভাবে লাখ লাখ গ্রাহকের কাছ থেকে কত টাকা আয় হয় তা সহজেই অনুমান করা যায়। মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত এবং বিত্তবানদের কথা নাই বা বল্‌লাম।

এই শোষণ ও অপব্যয়ের কৌশল হচ্ছে বিবেকের বিবেচনায় এক ধরণের সামাজিক অপরাধ। আর এসব অপরাধের মুল হোতারা হচ্ছে ব্যবসায়ী নামক সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিপতি ও তাদের লেজুড়বৃত্তির দোঁসররা। মোবাইল ফোনের বিল পরিশোধ কিংবা ফোনটি চালু রাখতে হলে মানুষকে অবশ্যই কোনো না কোনো উপায়ে পয়সা যোগাড় করতে হবে। এতে চরম দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে মানুষ দ্বিধাবোধ করবে না। ফোনের কারনে বেড়েছে ব্যাপক সিঁ-কেট তথা বিশেষ উদ্দেশ্যে 'জোট বাধার' অবাধ প্রবণতা। যার ফলে দ্রব্যমুল্যের উর্ধ্বগতি কেউ ঠেকাতে পারছে না। বেড়েছে মেয়েদের নিরাপত্তাহীনতাসহ চুরি ডাকাতি সন্ত্রাসীসহ ব্যাপক সামাজিক অপরাধ। ডাকাত এবং সন্ত্রাসীরা এসবের বিনিময়ে আরও নিরাপদ ভাবে মানুষের জান-মালের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে এবং যাবে।

(৩) আনন্দ ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের নামে বহুমুখী টেলিভিশন ষ্টেশন এবং প্রগ্রাম চালু করার যে ইচ্ছে বা অভিলাষ তার মধ্যে ও লুকিয়ে থাকে মুনাফা ও বাণিজ্যের নীল নক্সা। এই নীল নক্সায় আছে এদেশের মানুষকে ফ্যাশন ও আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে প্রতিটি অপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য খরিদ করার নেশাকে চাঙ্গা করে তুলা। কারণ রঙ্গে ঢঙ্গে প্রচার, বানিজ্যের জন্য রঙ্গিন টেলিভিশন সবচেয়ে ভাল মাধ্যম। শুধু তাই নয় বিভিন্ন ফ্যাশন এবং পশ্চিমা উলঙ্গ সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে (যেমন: অশস্নীল ছায়াছবি, রোক-রল মিউঝিক এবং হার্ডরক হিপহপ ইত্যাদি নামের দেহসর্বস্ব যৌন আবেদনের নাচ গান) অতি সুদুর প্রসারী চিন্ত্মাধারায় এদেশের মানুষের ধর্মীয় আদর্শ এবং মুল্যবোধকে মগজ ধোলাই এর মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। আজকাল দেশের উন্নত শপিং সেন্টারে গেলে দেখতে পাওয়া যায় পশ্চিমা জগতের সমস্ত্ম ফ্যাশন বস্ত্র, প্রসাধনী, গানের রের্কড দেদারছে বিক্রি হচ্ছে। এসমস্ত্ম গানের মধ্যে বাঙালির কী এমন মহাত্ম্য এবং মুল্যবোধ লুকিয়ে আছে? তা বিবেকবানদের মোটেই বোধগম্য নয়। দেশের সম্ভ্রান্ত্ম এবং অভিজাত নামের জ্ঞানপাপী মানুষগুলো আজও জানে না গায়ে ময়ুরপুচ্ছ লাগালে কখনও ময়ুর হওয়া যায় না।

(৪) ব্যাঙ্কিক খাতে উন্নয়ন বলতে এদেশের মানুষরা মনে করে ‘ ঋণ খেলাপীদের আরও বেশী সুবিধা দান’ এবং গরিব মানুষের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা না থাকলে তার সর্বস্ব মালামাল ক্রোক করার অভিযান। এটা বাংলাদেশের সমাজে হরহামেশা ঘটছে বলে এধারণা এখন মানুষের মনে বদ্ধমূল। কী ভাবে কোন খাতে ঋণ দিলে ঋণগ্রহীতার ব্যবসায়িক ঝুঁকি কম হবে, ওই সম্বন্ধে ট্রেনিং কিংবা প্রাকটিকেল ফিল্ড ওর্য়াক এর ব্যবস্থা থাকা প্রত্যেকটি ব্যাঙ্কের আবশ্যিক নিয়ম হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না হয়ে, তা হয়ে গেছে স্বজনপ্রীতি ও সুবিধাবাদী একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান।

(৫) বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন বলতে দেশের কৃষকগণ মনে করেন আরও বেশি করে সার খরিদ করা, কীট পতঙ্গ ধ্বংসের নামে তরল ও পাউডার জাত কেমিকেল দ্রব্যসম্ভার খরিদ করা এবং বীজ সরবরাহ করা ইত্যাদি। এই উন্নয়ন বলতে আরও বুঝায় জমি চাষের জন্য ট্রাকটর এবং সেচের জন্য ওয়াটার পাম্প মেশিন ও তৎসম্মন্ধীয় খুচরা যন্ত্রপাতি খরিদ করা। বাংলাদেশের শতকরা নব্বই (৯০)ভাগ কৃষক জানেন না এসব কীটনাশক দ্রব্যাদি এবং সার প্রয়োগের মধ্যে কী গুঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে। তারা শুধু জানে আরো বেশি ফসল এতে পাওয়া যাবে। আমেরিকার চাষাবাদের সাথে বাংলাদেশের চাষাবাদের তুলনা আকাশ পাতাল তফাৎ। আমেরিকাতে একটি কীট পতঙ্গের জীবন নিয়ে যেভাবে গবেষণা হয়, এক কণা মাটি, নদীর জল কিংবা আবহাওয়া নিয়ে যেভাবে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচা হয় তার কিছুই বাংলাদেশে হয় না।
সুতরাং আমেরিকার অস্ত্র ব্যবসায়ীদের মতো কৃষি দ্রব্য ব্যবসায়ীদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মুনাফা। বাংলাদেশের কি ক্ষতি হবে তা তাদের ব্যবসার কোনো বিষয় নয়। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে ‘বাংলাদেশকে কি ভাবে এই সব কৃষিজাত দ্রব্যের উপর আরও বেশী করে নির্ভরশীল রাখা যায় তার ব্যবস্থা করা’।

এই সুদুরপ্রসারী লক্ষ্যে তাদের কৃষিজাত দ্রব্যাদি গুলো ব্যবহারের ফলে প্রথম প্রথম খুব ভাল ফলন পাওয়া যায় বিনিময়ে স্বাদটা একটু ভিন্ন ধাচের হয়। তারপর আস্তে আস্তে সেই চমক দেয়া ফলন আর হয় না। তখন নির্ভর করতে হয় আরও ভিন্ন রকমের তৈরি কৃষি দ্রব্যাদির উপর। এমনকি যে বীজ দিয়ে ফসল বা শস্যদানা উৎপাদিত হয়, সেই ফসল বা শস্যদানা পেকে যাওয়ার পর তা থেকে বীজ রড়্গণের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার ফসল ফলানো যায় না। এজন্য আবার নতুন বীজের প্রয়োজন। এটাকে বলা হয় ‘হাইব্রিড’ পদ্ধতির বীজ।
এর মানে হচ্ছে কৃষককে প্রতিবারই বীজের জন্য ওইসব বিজ্ঞান প্রযুক্তির আওতায় মুনাফাখোরদের দ্বারস্থ হওয়া। অর্থাৎ আপগ্রেইডেড প্রডাক্ট খরিদ করা। জানি না যারা দেশ চালায় তাদের মাথায় কেন এটা ঢুকে না যে, এটা কত বড় শোষণ এবং একটা জাতিকে চিরতরে নি:শ্বেষ করে দেয়ার পায়তারা। কীটনাশক এবং সারের কথা বলতে গিয়ে বলতে হয় ভাগ্যিস যে বাংলাদেশে প্রচুর নদনদী ও মৌসুমী বায়ু থাকার কারণে এসব জমিনের

উৎপাদন ক্ষমতা সমুলে বিনাশ হচ্ছে না। সব কথার মুল কথা হলো ওইসব সার কিংবা কীটনাশক দ্রব্যাদি খরিদ করার অর্থ হচ্ছে জমিনের উর্বরা শক্তিকে ক্রমে ক্রমে ধ্বংস করে দেয়া।
আমেরিকার এসব ব্যবসা ও চালবাজির অর্থ হলো চট্টগ্রাম বন্দরে কলিন পাওয়েল ও তার দোসরদের পাঠানো গমের উপর এলাহি ভরসার সাইনবোর্ড লাগিয়ে অপেক্ষায় থাকা। কথা এখানে শেষ নয়, সেই গম গরিবের ঘরে কখনও পৌছাবে না। সেই গম যাবে এক্সপোর্ট ইমপোর্ট নামের ব্যবসায়ীদের হাতে। যাবে সরকারি দুর্নীতি পরায়ন আমলা ও তোষামোদকারীদের হাতে। টেলিফোন আলাপের মাধ্যমে যাদের ব্যবসা চলছে অহরহ। তারপর সেই গম তারা বিক্রি করবে পাইকারী বিক্রেতাদের কাছে বিশেষ চ্যানেলে। পাইকারী বিক্রেতারা সেটাকে মেশিনে ভাঙ্গিয়ে দ্বিগুণ ত্রিগুণ মুনাফায় বিক্রি করবে খুচরা বিক্রেতারে কাছে। তারপর তা দিয়ে তৈরি হবে বিস্কুট ফ্যাক্টরী ও বেকারির মজাদার রম্নটি, কেক, পরোটা, খাজা লবঙ্গ ইত্যাদি।

ভারত আন্তর্যাতিক আইন ভঙ্গ করে নদীর উপর যেমন ইচ্ছে বাঁধ দিচ্ছে। নদীর তীরে তীরে মিল কারখানা স্থাপনের অনুমতি দিয়ে ওই মিল কারখানার বিষাক্ত বৈর্জ্য নদীতে ফেলছে। ওই বিষাক্ত নদীর জলে নেই মাছের বংশ বিস্তারের অগ্রগতি। বরং ওই জল সেঁচের আওতায় এসে আমাদের চাষাবাদ যোগ্য ভূমিতে উৎপাদনের হার কমিয়ে দিচ্ছে।

অপর দিকে সার ও কীট নাশক কেমিক্যাল প্রয়োগের অত্যাচারে আমাদের ফল ফসলের স্বাদ দিনে দিনে বিষাদে পরিণত হচ্ছে। এই সমস্যার জন্য দাতা গোষ্ঠীর কিংবা মন্ত্রীদের কোনো বাস্তব পদক্ষেপ নেই। আছে শুধু লোক দেখানো মুখের ভাষণ, সেমিনার, কমিটি গঠন ইত্যাদি। মাটির স্তর, মাটির গঠনশৈলী, পলিমাটি উর্বর জমিনের স্তর এসব বিষয়ে যারা অতি সামান্য লেখাপড়া করেছেন তারাও জানেন নদীর নাব্যতা ও তার প্রাকৃতিক গতি রোধের কারণে বাংলাদেশে আর্সেনিক এর মত মারাত্মক বিষব্যাধির উদ্ভব ঘটেছে।

আমাদের এসব মৌলিক সমস্যার প্রতি কোনো দাতা গোষ্ঠির কোনো সৎ উদ্দেশ্য কখনও ছিল না, ভবিষ্যতে ও থাকবে না। বরং সুযোগ পেলে উলেস্নখযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদকে কীভাবে কূটকৌশলের মাধ্যমে কিংবা (ফুলবাড়ী, মাগুরছড়া ইত্যাদির কথা নিশ্চয়ই মানুষ ভুলে যায় নি) জোরপূর্বক হাতিয়ে নেয়া যায় তারই বাস্তব চিত্র আমরা দেখতে পাবো সময়ের আবর্তে। দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের নামে ব্যবসায়িক স্বার্থ ও শোষণের বাজার কলোনী হিসেবে আমাদেরকে চিহ্নিত করে রেখেছে দুনিয়ার দাতাগোষ্ঠী নামক বণিক সাম্রাজ্যবাদীরা।

আমাদের জাতীয় ঋণের বোঝা বাড়ছে তিলে তিলে আর ঋণের সুবিধা ও আরাম আয়েশ ভোগ করছে সরকারি বেসরকারি আমলা, লুটেরা, ফড়িয়া, কমিশনভোগী মন্ত্রীদের দল এবং তাদের সাঙ্গোপাঙ্গারা। আমাদের ওই সব মৌলিক সমস্যার সমাধানে কে বাস্তব পদক্ষেপ নেবে ? এটাই দেশের আপামর জন সাধারণের একটি চিরন্তন জিজ্ঞাসা।

২ ♦ ক্ষমতার নীলনক্সায় তৃণমুল মানুষের অবস্থান ♦

পৃথিবীতে ক্ষমতার দখল, ক্ষমতার লড়াই অতীতে যেমন অব্যাহত ছিল আজো তাই আছে। ক্ষমতার অপর নাম হলো কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, দুর্বলকে নুইয়ে রাখা, নিজের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরশ পাথর মনে করা। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মানে হলো নিজেকে কিংবা নিজের বংশকে সবচেয়ে বেশী শক্তিমান, বুদ্ধিমান ও অহংকারি মনে করা। সেই হিসেবে নিজেকে বা নিজের খান্দানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা।
সর্বশক্তি নিয়োগ করে ফসলী জমি ও গৃহ নির্মাণের জন্য ভূমি দখল করা, পানির উৎস দখল করা, ফলবান বৃক্ষ এবং মুল্যবান কাঠের গাছ গাছালি দখল করা। এগুলো দখল হলে এগুলোর আয় থেকে ব্যবসার প্রসার ঘটানো।

ব্যবসার প্রসার ঘটানো মানে হলো অর্থে ও সম্পদে নিজের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা। তারপর তা দীর্ঘস্থায়িত্ব করার কৌশল অবলম্ভন করা। নিজেদের ক্ষমতাকে স্থায়ী করতে হলে প্রয়োজন লাঠি তথা অস্ত্রের। এই বাহুবল যদি না থাকে তাহলে যে কোনো সময় অন্য শক্তিমান শত্রুর কাছে পরাজিত হলে নিজের কর্তৃত্ব কিংবা ক্ষমতা খোয়াতে হবে। সুতরাং যারা যুদ্ধে বিজয়ী হয় তারাই টিকে থাকে।

যেমন করে প্রকৃতি ও পরিবেশ বিজ্ঞানী ডারউইন বলেছিলেন যারা প্রকৃতির শক্তিতে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে টিকতে পারে তারাই তাদের বংশ নিয়ে টিকে থাকবে। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'নেচারেল সিলেকশন' অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্বাচন। তাইতো সমাজে নিজের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে প্রয়োজন বহু সন্তানের পিতা হওয়া। তাই ঘন ঘন সন্তান উৎপাদন কিংবা বহু বিবাহের মাধ্যমে এই খাহেশকে পুরণ করে নিচ্ছে বলশালী পুরুষ।

'ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের' মানে হলো দুর্বলদের যেমন করেই হোক দাবিয়ে রাখা। দাবিয়ে রাখার জন্য প্রথম উপায় হলো সমাজে ঘৃণা ও অবহেলার বদ অভ্যাস চালু করে উচু নীচু স্তর জনমনে সৃষ্টি করা। ফার্সী ভাষায় যাকে বলা হয় আশরাফ ও আতরাফ । এ জন্য কৌশল

ও ষড়যন্ত্র হিসাবে প্রথমেই বড় ভূমিকা রাখে জাতপ্রথার ব্যবধান। অর্থাৎ আমি উত্তম জাত, আমার বংশ গৌরব আছে, প্রতাপশালী হিসাবে ঐতিহ্য আছে।

জাতের প্রতি অহংকারিদের মনের কথা হলো এই; তোমরা অর্থাৎ সমাজের অন্যান্যরা হলে জাতহীন মানুষ, তোমরা দরিদ্র, ভুখা, তোমাদের কোনো জাত নেই, সমাজে তোমরা নিম্ন শ্রেণীর মানুষ। তোমরা যতসব নোংরা ও নিম্ন মানের কাজ কর্ম করে জীবন বাঁচাও। তোমরা অপরের দাসত্ব করো। তোমরা ভীরম্ন কাপুরম্নষ, প্রতিবাদ করার মতো শক্তি তোমাদের নেই। তোমরা তাই নীচু জাতের।

এই মনোবৃত্তি সমাজে চালু হওয়ার ফলে দুর্বলরা আরও দুর্বল হয়ে যায়। তারা নিজেদেরকে ছোট জাত হিসাবে ভাবতে থাকে। এক অদৃশ্য **হতাশা** তাদের মনে বাসা বাঁধে, যা সে নিজে টের পায় না কিংবা সনাক্ত করতে পারে না। যেমন করে আজকের যুগে ক্যানসার ব্যাধি নিরবে মানুষের দেহে বাসা বেধে আক্রমণ করে। 'গরীব এবং নীচু জাত' এই দুই মনেবৃত্তির চাপে ও প্রভাবে দুর্বলরা একরকম **মানসিক হীনমন্যতায়** ভোগে। তারা হয়ে উঠে চরম ভাগ্যে বিশ্বাসী। ওরা মনে করে আলম্নাহ'ই তাদের কপালে কমজাতের বংশ ও গরিব থাকার সীলমোহর এঁটে দিয়েছেন।

সুতরাং এর থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই। তাই সমাজের এই প্রচলিত সংস্কৃতিকে মেনে নিতেই হবে। এভাবে সমাজের দুর্বল জাতিগুলো শিক্ষাবিমুখ অবস্থায় চিরকালই দুর্বল থাকে। সমাজে যারা নিজেদের জাতপাতকে সুদৃঢ় করেছে তাদের প্রধান মনোবৃত্তি হলো মানুষকে শিক্ষা বঞ্চিত করে রাখা। বিষয়টি ধরা পড়ে তখন যখন তারা কথা প্রসঙ্গে বলাবলি করে "সবাই যদি শিক্ষিত হয়ে যায় তাহলে মা'কে মাছ ধরে খাওয়াবে কে" ? "সবাই শিক্ষিত হয়ে গেলে গরুর ঘাস কাটবে কে"? এসব উক্তি হচ্ছে শিড়্গাবঞ্চিত মানুষদের নিয়ে এক ধরনের উপহাস।

এই উপহাসের মাধ্যমে হিংসা করার যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ফুটে উঠে তার ব্যাখ্যা দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। একারণে জাতপাতে চরম বিশ্বাসী মানুষগুলো তাদের নিজেদের সন্তান সন্ততিদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে কার্পণ্য করে না। নিজেদের বাড়ীতেই তারা গৃহ শিক্ষক রেখে এই ধারা বজায় রাখে এবং বহুমুখি বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করে।
যুগের হাওয়ায় বিশ্ব পরিস্থিতি বদলাতে শুরম্ন হলে আস্তে আস্তে শিড়্গাবিমুখ জাতিদের প্রতি কিছু কিছু সমাজ হিতৈষী মানুষ এবং সরকার জনশিক্ষার নামে মৌলিক শিক্ষার প্রবর্তন করে। প্রাথমিক ভাবে ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে চিটি পত্র লিখা এবং মৌলিক গণনা ও অংক শিক্ষাই হলো এর মূল। চাকরি বাকরি নিয়ে কোনো কথা নেই, লিখা পড়া জানতে হবে, শিখতে হবে।" লিখাপড়া করে যে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে" কিংবা "সকালে উঠিয়া

আমি মনে মনে বলি, আমি যেন সারা দিন ভাল হয়ে চলি।" এসব আবহাওয়া দিয়ে শিক্ষা বঞ্চিত মানুষকে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে সাড়া জাগানোর চেষ্টা শুরম্ন হয়।

এর পর ধর্মীয় মক্তব এবং ধর্মীয় পড়াশুনার প্রতি ও শিক্ষাবঞ্চিত মানুষদেরকে নানা ভাবে আহ্বান করা হয়। মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত মুসলিম ভাগ্যান্বেষীরা ধর্ম প্রচার এবং ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আসলেও এদেশের আনাচে কানাচে ধর্মের প্রভাব ও বিস্ত্মার লাভ করতে বহু কাল অতিবাহিত হয়েছিল।
ভাষা বোঝা ও আয়ত্ব করা, ধর্মান্ত্মরিত হওয়া, কালচার বা সংস্কৃতির পরিবর্তন মানুষকে এক মিশ্র সংস্কৃতির দ্বন্দ্বে নিক্ষেপ করে। এদিকে জাতপাতের সমস্যাতো আছেই। তাই নিয়ে সাধারণ দিন মজুর থেকে শুরম্ন করে সাধারণ পেশাজীবি ও কৃষক মানুষের মধ্যে তেমন কোনো ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটলো না।

সময়ে সময়ে বিভিন্ন মতার্দশের রাজা, আঞ্চলিক সামন্ত্ম সরদার, ভুস্বামী, নানা বংশের সুলতান, সম্রাট, বাদশাহ, নবাবরা এদেশ শাসন করেছে।

তাদের স্বেচ্ছাচারী আইন ও তাদের নিযুক্ত চেলা চামুন্ডা, মধ্যস্বত্বভোগীদের করুন নিস্পেষণে এদেশের সাধারণ মানুষ বার বার হয়েছে নির্যাতিত শোষিত। থেকেছে চির দরিদ্র। জমিনের মালিক কে ? আর ভোগ করে কে ? তারা ছিল "উড়ে এসে জুড়ে বসা" শকুনের দল। তাদের পাখায় ছিল ধর্মের লেবাস, ঠোঁট ছিল তরবারির মতো ধারালো, আর পায়ের নখ ছিল বর্শার ফলার মতো তীক্ষ্ণ।

সাধারণ মানুষেরা দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছিল এই জনশিক্ষা এই মক্তব শিক্ষা তাদের কোনো অর্থনৈতিক মুক্তি কিংবা শোষণ থেকে রেহাই দেবে না। একারণে স্কুল ও মক্তব শিক্ষা নিয়ে মানুষের মনে সন্দেহের দানা বাঁধতে থাকে। তাই দেখা গেলো দেশের আনাচে কানাচে শিক্ষা নিয়ে মানুষের মধ্যে বিশ্বাস এবং উপহাস দুই'ই চলছে। স্কুলের ছাত্র এবং ধর্ম ও মক্তব শিক্ষকদের নিয়ে নানা প্রকার ব্যঙ্গো-বিদ্রম্নপের ছড়া চালু হয়। যুগের পরিবর্তনের দাবিতে আর অভিভাবকদের চাপে মক্তব এবং স্কুল শিক্ষা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে পাকিস্ত্মান আমল পর্যন্ত্ম।

ইংলিশ, আরবী, উর্দু এবং বাংলা এই চারটি ভাষার চাপে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল চরম নুজ্য। ইংরেজী ভাষায় দক্ষ হলে ডাক্তারি, ওকালতি এবং প্রকৌশলী ব্যতিত অন্য কোন পেশার কথা মানুষ বুঝতেই পারতো না। প্রকৌশলীর ব্যাপারেও কত শাখা প্রশাখা রয়েছে তাও ছাত্ররা জানতো না। এসব পেশায় শিক্ষিত হতে হলে যে অর্থের প্রয়োজন তাও শতকরা ৯০ ভাগ মানুষের ছিল না। বাংলাদেশে বিগত শতাব্দির নব্বুই এর দশক থেকে ইলেকট্রনিক

ও টেলিকমিউনিকেশনের ব্যাপক প্রসারের ফলে দেশের শিক্ষা জগতে এক আড়োলন সৃষ্টি হয়। অপরদিকে দরিদ্রতার সাথে পালস্না দিয়ে অসংখ্য ধর্মীয় শিড়্গা প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠে।

এর কারণ হলো ব্যাপক হারে মানুষের মধ্যপ্রাচ্যে গমন এবং রম্নজি রোজগার। সব হিসাব মিলিয়ে দেখা গেল শিক্ষা এবং আধুনিকতার উত্তপ্ত ঢেউ আমাদেরকে নাড়া দিলেও তা সমাজের সর্বস্ত্মরে সাড়া জাগাতে পারে নি। সব কিছুর পেছনে বাণিজ্যিক ব্যবস্থা এবং চাকচিক্যের মধ্যে অপব্যয়ের মানসিকতাই সৃষ্টি হয়েছে সমাজের সর্বত্র। চাকুরির সংস্থান, কলকারখানা বা অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক ত্রম্নটি রয়ে গেছে।

আজকের বাংলাদেশে যে শিক্ষা আছে তা যুগের তুলনায় বা চাকুরিও ভাগ্য উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট নয়। একারণে দেশ থেকে ডিগ্রী নিয়ে এলেও উন্নত দেশগুলো এর তেমন মুল্যায়ন করে না। একারণে বিদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসে আবার পড়াশুনা করতে হয়।

কথায় বলে "শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড-"। জাতীয়তাবাদের দ্বারা জাতি তৈরি হলে তবেই না মেরম্নদ- পাওয়া যাবে। **কিন্তু যেখানে জাতি গঠনের জন্য হাজার হাজার বাধাঁ সেখানে জাতির মেরম্নদ- কোথায় ?** নিজেকে 'বাঙালি জাতি' কিংবা 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের' নাম মুখে আনলে বহিরাগত শকুনের দল ও ধর্মীয় রক্ষণশীলরা ঘৃণায় থুথু ফেলে। ওরা বলে আমার বাপের দাদার-দাদা (পিতামহের পিতামহ) তো ইরান থেকে এসেছেন, আমরা জাতে খাঁন না হয় সৈয়দ। সুতরাং আমরা বাঙালি হই কেমন করে? আজকের বাংলাদেশের দুঃখ দুর্দশার চিত্র অংকন করতে গিয়ে ভাবতে হয় কেন আমরা এই একবিংশ শতাব্দিতেও এত দরিদ্রতা, এত রক্তপাত এত নিরাপত্তাহীনতায় জীবপ যাপন করছি ?

এই দেশের উপর ড়্গমতা ও কর্তৃত্ব যারা প্রতিষ্ঠা করেছে তারা ছিল বর্হিদেশীয় । তুরস্ক, জর্ডান, আরব, ইরাক, ইরান, আফগানিস্থান, উজবেকিস্ত্মান, ইয়েমেন ও আবিসিনিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে আগত। সব শেষে এসেছিল ইংলিশ জাতি এবং স্বাধীনতার নামে পাকিস্ত্মানিরা। ওরা এদেশে এসেছিল ভাগ্যঅন্বেষনে, সাথে নিয়ে এসেছিল ধর্ম। গরিব, শিড়্গাবঞ্চিত এবং জাতপাতের করম্নন নিষ্পেষণে জর্জরিত ভারতীয় নিম্নবর্ণের মানুষেরা মুক্তির কামনায় গ্রহণ করেছে ইসলাম ধর্ম। বিনিময়ে তারা খুঁইয়েছে তাদের জমি জমা, শস্যভা-ার ও নিজেদের আত্ম স্বাধীনতা।
দলে দলে আসা বর্হিদেশীয়রা কি জাতের ছিল এদেশের মানুষ প্রশ্ন তুলে নি। তারা নিজেরাই নিজেদেরকে সম্ভ্রান্ত তথা আশরাফ হিসেবে পরিচয় দিত। নিজেরাই নিজেদের নামের আগে পাছে টাইটেল তথা উপাধি বসিয়ে এলিট শ্রেণী তথা আভিজাত্যের গর্ব করতো।

এই শ্রেণীগুলো আজো বাংলার আনাচে কানাচে তাদের শিকড় গেড়ে আছে। কিন্তু এদেশের মানুষের সাথে তারা মনে প্রাণে একাত্ম হয়ে যায় নি। তাই তো "বাঙালি জাতীয়তাবাদ" কিংবা "ধর্মনিরপেক্ষ" শব্দটি তাদের সব সময়েই বজ্রাঘাত করে। অতীতের ধারাবাহিকতায় ভুমি, সম্পদ, প্রশাসনিক পদ ও রাজনীতির মঞ্চে তারা ঝেঁকে বসেছে। যেমন করে মুসা নবীর অনুসারীরা আজকের আমেরিকায় ঝেঁকে বসেছে। তাইতো বাংলাদেশের মাটিতে আজো গরিব মানুষের উন্নয়ন নেই, শিক্ষা নেই, বাক স্বাধীনতা নেই। আছে কেবল ধর্মীয় মুনাফার আশ্বাস। সেই আশ্বাসে ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত্ত হয় না, কর্ম সংস্থান হয় না। অসুখের পথ্য হয় না, শিক্ষার আলোয় জীবন গড়ে উঠে না।

সমাজে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন বোধে কৌশল, ষড়যন্ত্র হত্যা, দাঙা, আগুনে ঘরবাড়ি পুড়ানো, সম্পদ লুট ও আয়ের উৎস সমুহের চরম ক্ষতি করতে হবে। এটাই হলো আত্ম অহংকারি ও শক্তিমান মানুষের স্বৈরাচারি ও অত্যাচারি চরিত্র। বাংলাদেশের মাটিতে গরিব জনগণকে পুঁজি করে এসব কর্তৃত্ব ও ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে এক শ্রেণীর মানুষ।
ভালভাবে প্রত্যক্ষ্য করলে দেখা যাবে শুধু শহরে আর রাজনীতির মাঠে এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের যে লড়াই চলছে তা নয়। এই লড়াই চলছে গাও গেরামের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও, চলছে সমুদ্র উপকুল এলাকায়, চলছে নদীভাঙা ও ভেসে উঠা চর এলাকায়ও । এক কথায় দেশের সর্বত্র। এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের লড়াইয়ে সুবিধা করা যায় ধর্মের নানাবিধ ব্যাখ্যা এবং শান্ত্বনা দিয়ে।

কারণ গরিব ও জাতপাতহীন মানুষগুলো যেহেতু শিক্ষাবঞ্চিত এবং ভাগ্যবিশ্বাসী তাই তারা মনে করে মৃত্যুর পর সবকিছুই আমরা পেয়ে যাবো সুতরাং এখানকার শোষণ অত্যাচার মুখবুঝে 'ছবর' করে নিলে কোনো ক্ষতি হবে না। কথায় বলে "সবুরে মেওয়া ফলে" এভাবে ধর্মের বুলিতে তাদের বিদ্রোহকে সহজেই ঠেকানো যায়। এতে কাজ না হলে সর্দার গোছের দু'একজনকে টাকা দিয়ে বশ করা যায়। তাও যদি না হয়, তাহলে পর্ক্ষা বা তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে গু-া লেলিয়ে দেয়া কিংবা মিথ্যা মামলা দিয়ে সহজেই কাবু করা যায়।
এসব চালবাজি বুঝতে পেরে দুর্বলরা ভয় পায়, তাদের ঘরে পরবর্তী দিনের খাবার নেই, সুতরাং ঝামেলায় গিয়ে কি লাভ ? শিক্ষার মাধ্যমে শোষণের ফাঁকিজুকি বুঝা যায়, শিক্ষার মাধ্যমে ঐক্য স্থাপিত হলে ক্ষমতাবানরা ভয় পায়। একারণে এসব তৃণমুল সাধারণ মানুষকে সব সময়েই টানা পোড়নের সংসার তথা অভাব আর শিক্ষার অভাব দ্বারা ঝগড়া ঝাটির মধ্যে রাখা গেলে ক্ষমতাশীলরা তাদের কায়েমী স্বার্থকে রক্ষা করতে পারে। কারণ ক্ষমতা লিপ্সু ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত শোষকরা ভালই জানে তারা কিংবা তাদের বাপ দাদারা যে সহায় সম্পত্তি রেখে গেছে তা লুট পাট, জবর দখল, ষড়যন্ত্র ও বিভিন্ন অপরাধের মাধ্যমে

এসব পুঞ্জীভূত করা হয়েছে। সুতরাং তারা চায় না এমন কোন শক্তির উদ্ভব হোক যে এ নিয়ে প্রশ্ন করে।

৩♦আমি বাংলার গান গাই♦

বাংলাদেশ একটি দেশের নাম, একটি ভূখন্ডের নাম। যে ভূখন্ডে বাঙালি নামক একটি বৃহৎ মানবজাতির বসবাস। যে মানব গোষ্ঠীর একটি তাথপর্যপুর্ণ ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসের অধ্যায় বিস্তর। পৃথিবী ও মানব সভ্যতার বিবর্তনের মতো এ জাতির বিবর্তনে আছে বহু ধাপ, বহু সিঁড়ি, বহু রক্ত ঝরার বিষাদ কাহিনী। এদেশের বুক চিরে কালজয়ী মহাপুরুষদের মতো দুর্বার বেগে প্রবাহিত হয়েছে পদ্মা মেঘনা, যমুনা, সুরমা, কর্ণফুলী, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, আরও অসংখ্য নদ-নদী।

বিলিয়েছে জল, গিলেছে ঘরবাড়ী, অকৃপণ হৃদয়ে দান করেছে উর্বর পলিমাটির সোনাদানা। আর এজন্যই বোধ করি এটির আরেক নাম সোনার বাংলা। হাঁ নামটি একটি যাদুকরী নাম, একটি মোহ। যে নামের সাথে তার সুখ ও ঐশ্বর্যের সম্পর্ক নিহিত। সোনারগাঁও, সোনারকেলস্না, স্বর্ণকুটীর প্রভৃতিতে যেমন আজ নেই সোনা। তেমনি বাংলায়ও নেই সেই ঐতিহ্যের সোনা। সোনার বাংলা বলি আর বাংলাদেশ বলি এর সঠিক পরিচয় কোথায় ? ইতিহাস তো মুছে যায় নি, জাতি ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। জ্যামিতিক পরিমাপের একটি ত্রিভূজ কিংবা চতুর্ভূজ এর এক বাহুকে আঁকড়ে ধরে কেউ যদি সেটাকে চতুর্ভূজ কিংবা ত্রিভূর্জ বলে চিৎকার করে, সে চিৎকার অর্থহীন।

এদেশ এজাতি এ ভূখে-র একটি স্বতন্ত্র পরিচয় আছে। আছে ভাষা ও আচরণগত এক সার্বিক ঐক্যের একক স্বত্ত্বা। জলপ্রবাহিত নদ-নদীগুলো এদেশকে খ--বিখ-িত করলেও মানুষের হৃদয়কে খ-িত করে নি। এদেশকে যারা খ-িত করেছে তারা ছিল ভিনদেশী ও কিছু স্বদেশী শাসক, বেনিয়া ও বণিকগোষ্ঠী। তারা তাদের স্বার্থেই এ কাজটি করেছে। পুঁতেছে স্থায়ী শোষণের লৌহ খুঁটি। এ দেশকে এরা করেছে ল-ভ-।

সহজ সরল মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে বার বার। বাংলার সাথে করেছে রাজনৈতিক বলাৎকার। বাঙ্গালির বহু প্রতিবাদকে স্তব্ধ করে দেয়া হয়েছে বাহু জোরে। অনেক স্বদেশী বীর সন্তানরা এসমস্থ ধোঁকাবাজি বুঝতে পারলেও তাদের বুঝানো হয়েছে অন্য ভাবে।
স্বার্থের কুয়াশাজাল তারা ভেদ করতে পারেন নি, অপর দিকে এরা কেউ কেউ ছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক রশিতে বাধা। অনেক সময় শুভ ইচ্ছে থাকলেও তা খ-িত হয়েছে

অসামর্থ্যের নানা প্রতিবন্ধকতায়। দাবাড়ু যেমন জিততে গিয়েও হারে, এদেরও হয়েছে তাই। কাজেই দোষ খোঁজে লাভ নেই। দোষ খোঁজে কেউ ভবিষ্যত গড়তে পারে নি। এখন আমাদেরকে গড়তে হবে এদেশ এ-ঘর। সোনার বাংলা নামের এঘরটি বিদেশী ছাড়াও দিলস্নী, বোম্বে ও কলকাতার বহু বেনিয়া উইপোকারা খেয়ে ফেলছে।

এ ঘর এখন পতন উম্মুখ। তাই বাঙালি আজো দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পায় নি। বণিকদের অদৃশ্য যাতাকলে এ জাতি নিষ্পেষিত। বাঙালির দুঃখ দুর্দশাকে কেউ হৃদয় দিয়ে বুঝতে চায় নি। ইতিহাস খুলেও দেখতে চায় নি সত্যের দীপ্ত শিখা। বাংলাদেশ ভূখ- চলছে আজ কিছু গোঁড়া মুসলমানদের আষ্ফালন। অদুরদর্শী কর্মকা-ের অনর্থক চেঁচামেচি।

যে সমস্ত দেশে খুঁদ ইসলামের ঝা-া উড়েছিল, ওই সমস্ত এলাকায় আজ প্রায় হাজার বছর ধরে হয়নি প্রতিষ্ঠিত কোনো সত্যিকারের ইসলামী রাষ্ট্র , বরং ওই সমস্ত এলাকা ছিল বহু দ্বন্ধ সংঘাতের সঙ্গামস্থল। অথচ এই বাংলাদেশ এখানকার ভাষা সম্পূর্ণই আরবী থেকে আলাদা। যেখানে প্রার্থনা, উপাসনা, তসবীহ, তেলাওয়াত বাংলা ভাষায় করার কোনো স্বীকৃতি নেই, সেখানে এমন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সংঘাতের স্বপ্ন ছাড়া আর কী হতে পারে ?

অপরদিকে গোঁড়া হিন্দুরা তাদের দেব দেবীর শাসন প্রতিষ্ঠা, মসজিদ ভাঙ্গা এসব কুকর্মে লিপ্ত থাকার প্রয়াসে প্রয়াসী। এ দুই গোড়াপন্থীদের কাছে আমার এসব লিখালিখি তিক্ত বিষাক্ত। এরা পরস্পরের মধ্যে সংঘাতে লিপ্ত থাকার নামেই স্বর্গের সার্টিফিকেট পাওয়ার আকাঙ্খা করে থাকে। বাংলা, বঙ্গ, বাঙালি, বাংলাদেশ, কিংবা সোনার বাংলা এদের কাছে অর্থহীন। ওই সমস্ত নাম তাদের হৃদয়ে কোনো গৌরব কিংবা আনন্দের সঞ্চার করে না। ইতিহাস এদের দৃষ্টিতে অকেজো।

কাজেই আসুন এ ভূখ- কতজন প্রকৃত বাঙালি আছেন তার হিসাব করি । এ হিসাব আঙ্গুলে কষার নয়, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতেই হবে এ হিসাব। বাংলাদেশ এবং আজকের ভারতের ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয় নিয়েই হতে পারে বৃহৎ বাংলার অস্তিত্ব ও ঐহিত্য। আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ তার বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন। জ্যামিতিক ত্রিভূজ কিংবা বহুভূজের বাকি বাহু খুইয়ে সে স্বপ্ন দেখে সোনার বাংলার। এদেশের স্বাধীনতার তিন যুগ হয়ে যাচ্ছে তবুও এ স্বাধীনতার হিসাব বাঙালিরা মিলাতে পারে নি। শোষণ বিচারহীনতা আর ক্ষুধা নিয়ে কত শতাব্দি চলবে এ জাতি ? এ প্রশ্ন প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে।

জার্মানরা যেমন সইতে পারেনি প্রথম যুদ্ধের গস্নানি, সইতে পারেনি ২য় যুদ্ধে দ্বিখ-িত বেদনার মর্মজ্বালা। তেমনি আমি সইতে পারি নি বাংলার ব্যবচ্ছেদ। দীর্ঘ ৩৭ বৎসরের

স্বাধীনতা আজও তৃণমুল বাঙালির কাছে নিঃস্বতার প্রতীক। তাই এ স্বাধীনতায় নিজের ঘরেই নিজে পরবাসী। আমি বিশ্বাস করি বাংলার স্বাধীনতা বৃহৎ বাংলার একটি বীজ, একটি অংকুর। দিলস্নীর দাসত্ব থেকে কোন দিন মুক্তি পাবে আজকের শোষিত বাঙালি? এ প্রশ্ন জাতীয়তাবোধে বিশ্বাসী প্রত্যেক বিবেকবান বাঙালির ঘরে ঘরে।

বাংলাদেশকে চাপে রেখে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর মাঝে মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠা বাঙালি খেদাও আন্দোলন ঘটিয়ে বাঙালিকে আর কতকাল দাবিয়ে রাখা হবে ? বণিকদের স্বার্থের বোঝা বাঙালি আর কত বহন করবে ? রাশিয়ার বিভিন্ন ভূখে- স্বাধীনতার বিজয় পতাকা উড়ছে। দুই জার্মানীর মিলন ঘটেছে। বাঙালির মিলনে আর কত দেরী ?

আমি জানি আমার এ বক্তব্য দেশবাসীর মনে যোগাবে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া। ঘরের বাপ একদিকে, পুত্র অন্যদিকে। মা ডান পথে, তো ঝি বামপথে। ভয় ও আশঙ্কা তাদেরই বেশী যারা ৪৭ সাল ও পরবর্তীতে এবং ৭১ সাল ও পরবর্তীতে দরিদ্র মানুষের সম্পত্তি আত্নসাৎ করে আয়েশের জীবন ভোগ করেছে।
ভয় ও আশঙ্কা তাদেরই যারা অনেক অনেক আগে বর্হিদেশ থেকে এসে এদেশে ধর্মীয় রাজনীতির মাধ্যমে নিজেদের খান্দানদের স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত আছে। ফারাক্কা বাঁধের কারণে বাঙালির যে দুর্দশা হচ্ছে এটা দুরদর্শী রাজনৈতিক দৃষ্টির বিচারে বড় সমস্যা নয়।

সমস্যা বহু বিভক্ত বাংলা ভাষাভাষী জাতি-গোষ্ঠী নিয়েই। ফারাক্কা সমস্যার জের কিংবা পাবর্ত্য চট্টগ্রামের উপজাতি বিরোধ ও মধ্যে মধ্যে সীমান্তের সীমানা সংঘাত এ সমস্ত সবই বাঙালির ঐক্যের ফাটলকে জিইয়ে রাখার অপকৌশল মাত্র। এ অপকৌশল চিরকাল থাকবে না।
একথা সুদুর প্রসারী চিন্তাধারায় অত্যন্ত সত্য যে; বাঙালিরা আজ হোক কাল হোক এক হবেই। গঙ্গার পানি সমস্যা সমাধান হবেই। অপেক্ষা শুধু সেদিনের, যেদিন বাঙালির পূর্ণ স্বাধীনতার দুর্বার জোয়ার আসবে প্রলয় ঝঞ্জার মত নেচে।
১৪-২-১৯৯৯, ২৮ মুক্তিসন।

৪ ♦ সমস্যার মূল শিকড় ♦

পৃথিবীতে সকল মানুষের এবং সকল জাতির সমস্যা থাকে। জীবন ধারণের তাগিদে মানুষ বাঁচতে গিয়ে কত প্রকার যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তার যেন শেষ নেই। একেকটা সমস্যা শেষ হয়, তো আরেকটা নতুন সমস্যা এসে হাজির হয়। পশু বা অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা হয় তার মোটা রেখাটা আমরা জানি। পশু পালনের অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আমাদেরকে মোটামুটি অনেকটা তা জানতে দিয়েছে। ভাগ্যিস মানব জাতির মত অন্যান্য প্রাণীদের সুসংগঠিত ভাষা নেই, থাকলে বুঝা যেত প্রাণীদের সমস্যা কত প্রকার ও কি? কি?

খাদ্যাভাব প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অসুখ বিসুখ হচ্ছে প্রাণীদের সমস্যার অনেক কারণ। কিন্তু মানব জাতি? হায় ! তার সমস্যা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এবং সর্বত্র। আর বাংলাদেশের মানুষের সমস্যা আমি বোধ করি সবচেয়ে প্রকট এবং গভীর। যদি সমস্যাকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যায় তাহলে দেখা যাবে খাদ্যের সমস্যাই হচ্ছে সবচেয়ে প্রকট। খাদ্য মানেই বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা, খাদ্য মানেই পুষ্টি ও শক্তি। আর পুষ্টি ও শক্তির মানে হচ্ছে মানসিক এবং শারিরিক ভাবে কর্মদক্ষতায় যোগ্যতা থাকা। পুষ্টি নামক খাদ্য গুণের দ্বারা মানুষের বুদ্ধি, মেধা ও চিন্তা শক্তির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।
খাদ্যের সঙ্গে জীবন ধারণের জন্য বিশুদ্ধ পানিরও প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করেছেন আমাদের এই গ্রহে পানির অস্তিত্ব শুরুন্ন থেকেই না থাকলে এখানে জীবনের কোনো সৃষ্টি হতো না। সেজন্য দার্শনিকরা তো আগে থেকেই পানির অপর নাম দিয়েছেন 'জীবন'। পানি বিশুদ্ধ না হলে মানুষের শরীরের নানাবিধ জীবাণু ও ব্যাকটেরিয়া সর্বদাই আক্রমণ করে। মানুষ তখন অসুখের জ্বালায় দুশ্চিন্তা নিয়ে বাঁচে। দুশ্চিন্তা থাকলে সুস্থ ও সাবলীল চিন্তাধারা মানুষের মনকে আলোকিত করে না।

এরপর আমাদের আরও একটি বড় সমস্যা হচ্ছে বাসস্থান। মানুষ যতই বাড়বে বাসস্থানের প্রয়োজন বা চাহিদা ততই বাড়তে থাকবে। আজকের বাংলাদেশে আমরা লক্ষ লক্ষ সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি। সমস্যা সমাধানের জন্য নানাবিধ বৈজ্ঞানিক, অবৈজ্ঞানিক ও বিকল্প পন্থার খুঁজ করি।
যখন যা পাই তাই কাজে লাগাবার চেষ্টা করি। শুধু বাঁচার তাগিদে নয়, ধৈর্য্যের অভাবে এবং লোভের পালস্নায় পড়ে বাঙালিরা যে কত প্রকার ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে তার বিশাল প্রমাণ এদেশের পত্র-পত্রিকা আর প্রতিদিনের বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতা।

অত্যন্ত তুচ্ছ এবং ছোট্ট খাটো ব্যাপারেও " নৈতিকতা" বিষয়টিকে চরম অবহেলা করতে বাঙালিদের জুড়ি নেই, তা প্রমাণিত। আমরা আমাদের সমস্যা নিয়ে যতই চিৎকার করিনা

কেন, সমস্যার মুল শিকড়টি কোথায় তা খুঁজে না বের করা পর্যন্ত আমাদের কোন মুক্তি নেই। সেটি আমাদের চোখের সামনে জ্বলজ্যান্ত সমস্যা, যা দেখেও দেখছি না এবং শুনেও শুনছি না। সেটি হচ্ছে জনসংখ্যার সমস্যা। এটি হচ্ছে বাংলাদেশের মুল সমস্যার আসল শিকড়।

বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, আজ থেকে চলিস্নশ বৎসর আগে যে গ্রামে পঞ্চাশটি "পরিবার" ছিল, সে গ্রামে এখন হয়েছে দেড়শত "পরিবার"। প্রতিটি পরিবারের গড় লোক সংখ্যা হচ্ছে ১০ জন। এভাবে ৬৮ হাজার গ্রামের কথা একবার চিন্তা করে দেখুন, জনসংখ্যার বিস্ফোরণ কী ভাবে হচ্ছে। বাংলাদেশের রিক্সা ও অন্যান্য যানবাহনে নিযুক্ত পেশাদার লোকদের সংখ্যা খাটো করে দেখা যায়না।

এক জরীপ থেকে দেখা যায়, সাধারণ দিন মজুর সহ রিক্সাওয়ালা, কমবেশি সকলেই তিন চারটি বিয়ে করে। কয়দিন এই বউয়ের সাথে, আরও কয়েকদিন অন্য বউয়ের সাথে ঝগড়াঝাটি করে সংসার চালায়। যেখানে বিয়ে করে তাও অন্য রিক্সাওয়ালা কিংবা কোন এক দিনমজুরের মেয়ে, যার বয়েস বড় জোর ১৪-১৫। কখনও কখনও তালাক প্রাপ্তা কারো বউ, বোন বা ভাগ্নী।

তাদের বিয়েতে কোন কাগজ কিংবা লেখাখির ব্যাপার নেই। মোহরানা লাগেনা, কাজী লাগেনা, ঘটক লাগেনা, সাক্ষী সাবুদের ও তেমন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু একজন হুজুর এবং আশে পাশের দু' একজন পরিচিত মানুষ কিংবা আত্মীয়। বিয়ে করার পর এরা কয়েক সপ্তাহ স্ত্রীর সাথে খুব দরদ দেখায়। তারপর আস্তে আস্তে সপ্তাহ বা মাসের জন্য লাপাত্তা হয়, কখনও কখনও তা বৎসর গড়ায়। তারপর আবার হাজির হয়। আবার আসে, আবার যায়। নানাবিদ বানানো অজুহাত তাদের তৈরি করা থাকে। কয়েক বৎসর পর দেখা যায় তাদের নানা যায়গায় বিয়ে করা বউদের ঘরে কাচ্চা বাচ্চার পরিমান ডজন খানেকের উপরে।

এর মধ্যে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান রোগ বালাই নিয়ে সমস্যার চরম আবর্তে ঘুরতে থাকে বিবাহিতা নারীটি। বিবাদ, গালাগালি, মারামারি, ছুড়াছুড়ি, বিচ্ছেদ, তালাক, আবার মিটমাট, আবার সংসার সবটাই চলছে, ভাঙছে, গড়ছে যেন বৃত্তাকারে আবর্তিত জোয়ার ভাটার জীবন। এই দিনমজুরগুলো, নারীদের জীবন নিয়ে এভাবে জুয়া খেলার অধিকার পায় কোত্থেকে? যে নিজের পেট বাঁচাতে পারে না সে আবার একাদিক বিয়ে করার অনুমতি পায় কোত্থেকে? না কোনো সরকারি নিয়ন্ত্রণ, না কোনো সামাজিক বাধা।
এই শ্রমিক মানুষগুলো বড় জোর ৪০-৪৫ বৎসর বাঁচে। কিন্তু সমাজের জন্য ও দেশের জন্য রেখে যায় ডজন ডজন ইয়াতীম শিশু এবং বিধবা নারী। এদের দেখশোন কে করবে ?

দেশে আছে কি অগণিত অবাধ জমি? যেখানে যত ইচ্ছে চাষ করে জীবন বাঁচানো যায় ? শুধু দিন মজুর আর যানবাহনে নিযুক্ত শ্রমিকদের দোষ দিয়ে আমি থামছি না। আমি আরও দেখাচ্ছি কৃষক, মাদ্রাসা শিক্ষিত হুজুর এবং স্কুল কলেজে পড়ুয়া শিক্ষিত মানুষদেরও জ্ঞানের বাহাদুরি।

জরিপ করলে দেখা যাবে সন্তান উৎপাদন প্রতিযোগিতায় কেউ কারো চেয়ে কম নয়। পুরো দেশটার জনগোষ্ঠী ধর্মীয় রক্ষণশীলতার পাথর বুকে চেপে বেঁচে আছে। এই জনগোষ্ঠির অধিকাংশ মানুষ এখনও বলে থাকে "পোকার মুখে মউ" কথাটির অর্থ হলো যত বেশি মৌমাছি হবে তত বেশী মধু আহরণ সম্ভব। অর্থাৎ মৌমাছির মত আমার যত বেশি ছেলে সন্তান হবে তত বেশি রম্নজি রোজগারের অর্থ সম্পদ আমার ঘরে আসবে। আমি সুখী হবো। তাদের আরেকটি বড় যুক্তি হলো "রিজেকের মালিক আলস্নাহ" রিজেকের মালিক তো আলস্নাহ ঠিকই, তিনিতো সেই সুযোগ সুবিধার অস্তিত্ব সৃষ্টি করে সবার জন্য রেখে দিয়েছেন।

কিন্তু রিজেক পাওয়ার জন্য যে শ্রম করতে হয়, যে বুদ্ধি খাটাতে হয়, যে লাভ লোকসানের কথা ভাবতে হয়, সেটা করবে কে ? এই বাক্যের যারা অপব্যাখ্যা করে মানুষকে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বানাবার পক্ষপাতিত্ব করে, তারা দারম্নন গোঁড়া এবং দেশ ও সমাজের জন্য বিরাট বোঝা। আসলে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠির বিশাল অংশটি বুদ্ধিতে অতি দুর্বল ও দায়সারা গোছের। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসার কী প্রকট ও বিভিষীকাময় অবস্থা, তা সত্ত্বে ও সন্তান উৎপাদনের বিষয়ে তারা অত্যন্ত ধৈর্যহীন।

রক্ষণশীলতা ও মৌলবাদিতার প্রভাবে পুরম্নষদের যৌনাচার আরও ভয়াবহ । তারা জীবনে নারী সঙ্গ পায় নি। তাই বিয়ের মাধ্যমে যেই নারীর মিলনসঙ্গ পেলো, তখন তাদের আর সামলায় কে ? এযেন এক ভয়ানক শিকার শিকার খেলা। নারী ! সে'তো ভীতু হরিণী, শত যৌন অত্যাচার সহ্য করাই যেন তার ধর্মীয় অধিকার। লজ্জা, আর সামাজিক পুরম্নষ প্রশাসনের অত্যাচারে সে ম্রিয়মান। তার বলার কিছু নেই, বলার অধিকারও নেই। সব কিছু পাথর চাপা। "আমি পুরুষ যা ইচ্ছে তা করবো , যতবার ইচ্ছে ততবার কাজের আদেশ করবো, দিনের বেলা বোরখা পরানোর জন্য সংগ্রমা করবো। আমি উঠ কইলে উঠতে অইবো, বোও কইলে বইতে অইবো, না মানলে পিটায়া হাড্ডি গুড়া কইরা ফালামু "।
এই আমাদের সমাজ, এই তার আসল চেহারা। শিক্ষিত বলি আর শিক্ষা বঞ্চিত বলি সবই যেন এক দলের কচু। পার্থক্য শুধু ভাষা ব্যবহারে, মানসিক দিক দিয়ে তেমন কোনো ব্যতিক্রম নেই। যে সমস্ত মানুষের উন্নত মানসিকতা আছে অথবা বিচার বিবেক আছে, তা শতকরা ১০% থেকে ১৫% ভাগ মাত্র। তা দিয়ে কী পুরো সমাজের কুসংস্কার ও বিবেকহীনতাকে পাল্টে দেয়া যায় ?

আমাদের সমাজে সকলের একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, বিয়ের পর বৎসর যেতে না যেতে যদি সেই বিবাহিতা মেয়েটি মা হবার কোনো সম্ভাবনা না থাকে তখন বিভিন্ন আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশি ও সমাজের অন্যান্য স্ত্রীলোকগুলো মুখরা হয়ে উঠে। কেন মেয়েটি গর্ভবতী হচ্ছে না? এই নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনার ঝড় বইতে শুরম্ন করে ? অপর দিকে আরও বৎসর ২-৩ অতিবাহিত হয়ে গেলে পুরম্নষটিও আরেক বিয়ে করার জন্য মনে মনে ড়িপ্র হয়ে উঠে। অধিকাংশ পরিবারের অভিভাবকরা ছেলেকে দ্বিতীয় বিয়ে দেবার জন্য উসকানি দিতে শুরম্ন করে।

শুধু তাই নয় অধিকাংশ পরিবার মনে মনে কামনা করে ছেলে সন্তান হওয়া চাই। ছেলে সন্তান না হলে ঘরের বৌকে আর তেমন স্নেহের দৃষ্টিতে দেখা হয় না। নানাবিধ কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে সেই বিবাহিতা বৌটি'কে তারা নানা কথার খুঁচায় ঘায়েল করে তুলে। এই হচ্ছে আমাদের সমাজের প্রতিচ্ছবি। এই প্রতিচ্ছবি বড়ই করম্নণ। ৮০ শতাংশ মানুষের জীবন সম্পর্কিত ধ্যান ধারণা অত্যন্ত সংকীর্ণ ও সীমিত। এই মানুষগুলোর মধ্যে বাস্তবমুখি ও বিজ্ঞানমুখি শিড়্গায় শিড়্গিত করে তুলতে হলে কম পক্ষে কত বৎসরের প্রয়োজন তা আন্দাজ করা বাস্তবিকই কঠিন।

ঢাকা : ১৯ জুলাই রোজ রোববার ২০০৯ তারিখে 'দৈনিক প্রথম আলো'তে' "বাংলাদেশে প্রতি এগারো সেকেন্ডে একটি শিশুর জন্ম " এই শিরোনামে একটি বিস্ময়কর খবর তথা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

প্রতিবেদনটি লিখেছেন শিশির মন্ডল। জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের পরিচালক আহমেদ আল-সাবির বলেন ২০০৭ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৬৫ দিনে বাংলাদেশে ২৯ (উনত্রিশ) লাখ ৮৬ হাজার শিশু জন্ম নেয়। জনসংখ্যা দিবস (উদযাপন) প্রাক্কালে ১০ জুলাই ২০০৯ মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী আ.ফ.ম. রম্নহুল হক বলেন দেশে প্রায় ১৫কোটি মানুষের বাস এবং **জনসংখ্যা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।**

বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেল্‌থ সার্ভের তথ্য অনুযায়ী দেশে কিশোরী মাতৃত্বের হার শতকরা ৩৩%। বিশ্বের আর কোথাও এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজমান নেই। একই প্রতিবেদনে ইউনিসেফ তথা জাতিসংঘের বিশ্ব শিশু বিষয়ক পরিস্থিতির কথা উলেস্নখ করে বলা হয় জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলা দেশে প্রতি বৎসর ১ লাখ ২০ হাজার শিশু মারা যায়, একমাস বয়েসের মধ্যে।

সোমবার, ২৪ আগষ্ট ২০০৯ তারিখে দৈনিক প্রথম আলো "অপুষ্টি জনিত কারণে দেশে ঘন্টায় ১০ শিশু মারা যাচ্ছে"। এই নামে লেখক শিশির মন্ডলের আরেকটি প্রতিবেদন ছাপে। অত্যন্ত যুক্তি নির্ভর এবং বিভিন্ন সংগঠন ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের মতামত এই প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়। জাতিসংঘের রিপোর্ট সহ বলা হয় বাংলাদেশে অপুষ্টিজনিত কারণে ২ লাখ ৪৪ হাজার শিশু মারা যায়, যাদের বয়েস পাঁচ বৎসরের নিচে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে শিশু জন্মের হার থেকে শিশু মৃত্যুর হার বাদ দিলেও প্রতি বৎসর ২৬ লাখ ২২ হাজার শিশু টিকে থাকে। যদি অন্যান্য কারণে আমরা আরও দুই লাখ শিশুর মৃত্যুকে হিসাবের মধ্যে ধরি তাহলে বাস্তব প্রতিচ্ছবি হচ্ছে বাংলাদেশে প্রতি বৎসর ২৪ লাখ ২২ হাজার মানুষের জন্য অন্ন বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজন।

বার্ধক্য, অসুখ বিসুখ এবং দুর্ঘটনার জন্য যদি আমরা আরও ৬ লাখ মানুষের বাৎসরিক মৃত্যু গণনায় হিসেব করি তাহলে বাংলাদেশে প্রতি বৎসর ১৮ লাখ ২২ হাজার মানুষের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের একান্ত প্রয়োজন। **এর অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশে প্রতি পাঁচ বৎসরে এক কোটি মানুষের ঠেলা সামলাতে হবে।** এই তো গেল জনসংখ্যার একটা গড় হিসাব। এই লিখাটি চুড়ান্ত করার এক পর্যায়ে গত ২৬শে ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে "দৈনিক ভোরের কাগজে" জনাব আবুল হাসানাত বিভিন্ন রেফারেন্স দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন।

প্রবন্ধের হেডিং ছিল " জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না" সেখানে তিনি উলেস্নখ করেছেন 'প্রতি বছর (জনসংখ্যার খাতায়) নতুন যুক্ত হচ্ছে ১৮ লাখ মানুষ' এবারে আমরা যদি বাংলাদেশের কৃষি জমির হিসাবটা দেখি তাহলে বুঝতে একটু ও অসুবিধা হবে না যে আমরা আছি কত দুঃখ কষ্টের নরকে। নিচের প্রতিবেদনটির বিশেষ গুরম্নত্বপুর্ণ অংশ আমি পাঠকের সুবিধার্তে হুবহু উলেস্নখ করে দিলাম।

"২০ বছরে কৃষি জমি কমেছে প্রায় ৫০ লাখ একর" ল্যান্ড জোনিং কর্মসূচির অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক নয়। ঢাকা: দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ই আগষ্ট ২০০৯।। মনির হায়দার।। জনসংখ্যার চাপ ও ভূমির যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে গত ২০ বছরে দেশে কৃষি জমির পরিমাণ কমেছে প্রায় ৫০ লাখ একর। অন্যদিকে অপরিকল্পিতভাবে বিস্তৃতি ঘটেছে নগরায়ণসহ জনবসতি এবং শিল্পায়নের। প্রতিদিন গড়ে ২২০ হেক্টর কৃষি জমি চলে যাচ্ছে শিল্প-কারখানা স্থাপন, নগরায়ণ, বসতবাড়ি তৈরি ও রাস্তাঘাট নির্মাণের কাজে।

এর ফলে সামগ্রিক পরিবেশের ওপর যেমন হুমকি সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি দ্রম্নত সংকুচিত হয়ে পড়ছে দেশের কৃষি খাত। এসব হিসাব ভূমি মন্ত্রণালয়ের। এ অবস্থায় কৃষি জমি রড়্গা তথা ভূমির যথেচ্ছ ব্যবহার রোধে ভূমি মন্ত্রণালয় সারাদেশে ল্যান্ড জোনিং কর্মসূচি হাতে নিলেও

এর অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। এ কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিকভাবে দেশের উপকূলবর্তী ১৭টি ও সমতলের ২টি জেলার সর্বমোট ১৪৭ উপজেলায় ভূমির জোনিং কার্যক্রম শুরম্ন হয়েছে প্রায় ৩ বছর আগে। আগামী বছরের জুন মাসের মধ্যে এসব উপজেলার সমস্ত জমির শ্রেণী-বিন্যাসকরণের কাজ শেষ করার কথা।

ভূমি প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অভিজ্ঞ একাধিক ব্যক্তির অভিমত, প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো ভূমি। এই ভূমি থেকেই আসে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, এমনকি জীবনরক্ষাকারী প্রয়োজনীয় উপাদানও।
এই হচ্ছে বাংলাদেশের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। এই পরিস্থিতিকে সামাল দেবার জন্য যে ভাবে রাজনীতি হচ্ছে, যে ভাবে রিজেকের মালিক আলস্নাহ এবং অভাব অনটনের জন্য অদৃষ্টকে দায়ি করা হচ্ছে তা অত্যন্ত বোকামি ও বিবেকহীনতার পরিচয়।

পৃথিবীতে এমন কোনো সরকার কিংবা এমন কোনো ধর্ম নেই, যে বাংলাদেশের এই পরিস্থিতিকে সামাল দিতে পারে। আজকে এই যে পথে ঘাটে চাদাবাজি, চর দখল, জল মহাল দখল, বনাঞ্চল দখল, পাহাড় দখল, রাস্তা দখল, রেললাইনের সম্পত্তি দখল, সংখ্যালঘুর সম্পত্তি দখল, গরিবের জমি দখল, এইযে ভুমিদস্যুতা এসব কেন হচ্ছে তা কি আর বুঝিয়ে দেয়ার প্রয়োজন আছে? এদেশে জনসংখ্যা বাড়তে বাড়তে পা রাখার যায়গাটুকু ও শেষ হয়ে যাচ্ছে। ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা তবু ও এদেশের জনগণের কোন হুশ হচ্ছে না।

উঠতি যুবকদের না আছে মানানসই শিক্ষার ব্যবস্থা, না আছে কর্মসংস্থান সুতরাং এরা যে নানাবিধ বিভীষিকাময় অপরাধে জড়িয়ে পড়বে তাতে আর সন্দেহ কি ? অপর দিকে উঠতি কিশোরী ও যুবতি যাদের মা বাবা ক্ষুধার জ্বালায় নিজেদের পেট বাঁচাতে পারছে না। এই দুঃখ তাদের নিজেরও। চোখের সামনে মা বাবা ভাই বোন ধুঁকে ধুঁকে মরছে চিকিৎসার অভাবে, পুষ্টির অভাবে, চাকুরি ও খাদ্যের অভাবে। সুতরাং এই পোড়া মন নিয়ে আর কত সহ্য করা যায়। তাদের ক্ষমতা নেই পুরম্নষ কিংবা যুবকদের মতো বাইরে গিয়ে সন্ত্রাসী, চাদাবাজি, মাদক ব্যবসা কিংবা ভূমি দস্যুতা করবে।

তাইতো নিজেদের সীমিত যোগ্যতায় বাসা বাড়ীতে "কাজের মেয়ে বা বুয়া" হিসাবে যোগ দিয়ে সেখানে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কাজ করতে হয়। এই কাজের বিনিময়ে যে বেতন দেয়া হয় তা অত্যন্ত অমানবিক এবং শোষণের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এরপর তাদের উপর যেভাবে মানসিক ও শারিরিক ও যৌন নির্যাতন করা হয় তা ধর্ম, গণতন্ত্র কিংবা সাধারণ বিবেকের বিচারেও কিছুতেই গ্রহণ যোগ্য নয়। পত্রিকার পাতায় প্রতিদিন আসছে এসব খবর। তদ্রুপ গার্মেন্টস এ চাকুরি করতে আসা মহিলা ও কিশোরীদের দুঃখের খতিয়ান কোনো অংশে কম

নয়। সপ্তাহে ৫০/৬০ ঘন্টা কাজ করে সারা মাসে পায় তারা দুই থেকে তিন হাজার টাকা বেতন।

ঘর ভাড়া, খোরাকি, গাড়ী ভাড়া ও চা পানের পর তাদের আর কি থাকে ? দরিদ্রতার চরম নিস্পেষনে অনেক কিশোরী ও তালাকপ্রাপ্তা মেয়েরা শেষ সম্বল এই যৌবন বিক্রির মাধ্যমে জীবন বাঁচাতে চায়। চাকুরির নামে দালালদের খপ্পরে পড়ে একদিন তারা বুঝতে পারে তারা এখন সমাজের পতিতা। তারা একূল ওকূল দুকূল হারিয়ে কেবল চোখের জল নিয়েই বেঁচে থাকে। অনেক আশা আকাঙ্খা করে অনেকে বিয়ের পিড়িতে বসলেও শেষ অবধি দেখা যায় যৌতুকের কারণে তাদের উপর চলছে অমানুষিক অত্যাচার। হায়রে স্বামী ! হায়রে আদরের সন্তান ! কোথায় গেল আজ স্নেহ ভালবাসা আর পারিবারিক মমতার বন্ধন ?
সুতরাং সরকারি আইন আর পুলিশ, মামলা মকদ্দমা, পঞ্চায়েত বিচার এই সেই দিয়ে যতই ধরো মারো কাটো জেল দাও সমস্যার সমাধান হবেনা। একশত সন্ত্রাসী চাদাবাজ কিংবা ডাকাতদের যদি কচু কাটা করে বুড়িগঙ্গায় ভাসিয়ে দাও কিছু হবে না। আর ও দুইশত সন্ত্রাসী চাদাবাজি পেছনে লাইন ধরে আছে। তুমি কত মারবে, কাটবে কিংবা শাস্তি দেবে ? কারণ সারা দেশজুড়ে প্রতিদিন মায়ের গর্ভে আসছে হাজার হাজার নতুন সন্তানের বীজ। এর একাংশ খাওয়া পরার তাগিদে সন্ত্রাসী, চাদাবাজ কিংবা ভূমিদস্যুতে পরিণত হবেই হবে। তদ্রুপ বাজারে আছে জিনিসপত্রের আকাল আর দ্রব্যমুল্যের গতি আকাশ ছোয়া। এসব সমস্যা কখনও সম্ভব হবেনা, কারণ দেশে চাষাবাদের জমি কমছে আর জনবিস্ফোরনের জন্য খাদ্যের চাহিদা লাগামহীন ভাবে বেড়েই চলছে।

সুতরাং যারা কৃষিদ্রব্য উৎপাদন করবে তাদের নিজেদের খাদ্য সমস্যা সামাল দিতে পারছে না। আপনি বাজারে গিয়ে এত খাদ্য শস্য ও তরি-তরকারি কোথায় পাবেন ? অধিক চাহিদা ও উৎপাদনের জন্য বর্তমানে পাবেন বিষাক্ত ক্যামিকেল প্রয়োগের সব খাদ্য দ্রব্যাদি। আমাদের বাপ দাদারা, ও বর্তমানে আমরা বাঙালিরা দিন রাত নারীতে লিপ্ত হয়ে যে স্বর্গীয়সুখ উপভোগ করেছিলাম বা বর্তমানে করে যাচ্ছি এটা তারই ফল।

এই অধিক জনসংখ্যার বিষয়টি আলোচনা করতে গেলে অনেকেই মনে করেন এতে মানুষকে, জনগণকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে অপমান করা হচ্ছে। এই ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। অনেকেই জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনার কথা বলেন। এমনটি আমিও অনেক ভেবেছি। কিন্তু শেষ ফলাফল তেমন ভালো হবার সম্ভাবনা খুব কম। কারণ আছে বহুবিধ। একবার প্রশাসনের গদীতে বসলে বুঝতে পারা যাবে 'কত ধানে কত চাল'। ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বিতরণ করে দিলে সেই জনগণ সম্পদে পরিণত হবেন না। সেটা হবে মানবতাবাদের একটা সুস্থ চিন্তা।

মানুষের মৌলিক চাহিদা হচ্ছে খাদ্য। উদাহরণ স্বরূপ বলছি আমাদের ৬৪ হাজার গ্রাম এবং সকল শহরবাসীর জন্য যদি প্রতিদিন এক লক্ষ গরম্ন জবাই করা হয় তবুও পরবর্তী দিনের ক্ষুধা মেটানো আমাদের জন্য সম্ভব নয়। মুল খাদ্য চাল ডালের কথা বাদ দিয়েই শুধু আমিষ ও লৌহজাত অভাব পুরনের কথা চিন্তা করেই কথাটা বল্লাম। খাদ্যে স্বয়ং সম্পুর্ণতা এবং শিক্ষা ছাড়া কী ভাবে এই অনাগত অনাহুত জনগোষ্ঠীকে আমরা সম্পদে পরিণত করবো? হাঁ করতে পারবো যদি পরিকল্পিত ভাবে সন্তান জন্মদানের বিষয়টিকে জনগণের সচেতনতার মধ্যে আনয়ন করতে পারি।

কাজেই সমস্যার শিকড়ে না গিয়ে শুধু সরকারকে দোষাদোষি করে কোনো লাভ হবে না। সরকার কি আলাদীনের চেরাগ? আজ যদি অভিনব ভাবে সন্তান উৎপাদনের জন্য সরকার কোনো কঠিন পদক্ষেপ নেয় তাহলে দেখা যাবে সমাজের আনাচে কানাচে সর্বত্রই ধর্ম বিশ্বাসী কিছু সংখ্যক মানুষ জ্বলন্ত আগুনের মিছিল নিয়ে ভূমিকম্প শুরম্ন করে দিয়েছে। যে দেশের মানুষের জীবনে চিত্ত বিনোদনের জন্য, খেলাধুলা, সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য, ভ্রমন, একজিভিশন, নারী পুরম্নষের মধ্যে মুক্ত বন্ধুত্ব ইত্যাদি বহুমুখি বিষয়গুলোতে ধর্মীয় বাধা রয়েছে, সেখানে মানুষ ঘুরে ফিরে স্ত্রী মিলনকেই চিত্ত বিনোদনের একান্ত উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করছে।

সুতরাং সমস্যার শিকড় হচ্ছে আমাদের বিবেকহীন জনসংখ্যার বিস্ফোরণ। এজন্য দেশে খাদ্য সমস্যার সমাধান, অপুষ্টির চিকিৎসা, চোর ডাকাত সন্ত্রাসী সমাধান, ঘরে ঘরে দুর্নীতি ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য নানাবিধ প্রকল্প, সংগঠন আর বিদেশী এক্সপার্ট নিয়োগ করলেও আমরা আশাতীত ফল পাবো না। যা প্রয়োজন তা হচ্ছে বাস্তবতার ভিত্তিতে ধর্মীয় শিক্ষাকে ঢেলে সাজানো।

মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাসকে কাটছাট করে তা স্কুল বোর্ডের আওতায় নিয়ে আসা এবং মাদ্রাসার ঘরগুলোকে পাবলিক লাইব্রেরিতে পরিণত করা। বিজ্ঞানমুখি শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামুলক বাস্তবায়ন করা। বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ এবং অতিরিক্ত সন্তান জন্মদানের জন্য শাস্তি ও জরিমানার আইনগত কাঠামো চালু করা।

৫ ♦ অর্পিত সম্পত্তি আইন এবং আমাদের জাতীয় সঙ্কট ♦

উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দ্বন্ধে ১৯৪৭ সালের চৌদ্দ এবং পনেরো আগষ্ট ভারত উপমহাদেশে পাকিস্ত্মান ও ইন্ডিয়া নামে দুটি রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছিল। এতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছিল বাংলা ও পাঞ্জাব নামের দুটি সম্পদশালী প্রদেশ। এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থানের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে মানুষে মানুষে হিংসা, হানাহানি, এবং রক্তপাত ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় নি। মানুষ হিংসা আর রক্ষণশীলতার মধ্যে কেবল ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে। শান্তি শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, কিংবা জাতীয় উন্নয়নের উলেস্নখযোগ্য বিকাশ ও বিস্ত্মার ঘটে নি। যা উন্নয়ন হয়েছে তার পেছনে ব্যবসা, শোষণ ও অপচয় মনোবৃত্তি ব্যতিত জাতি আর কিছু পায় নি।

ফলশ্রম্নতিতে জীবনের মান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, মাথাপিছু আয় ইত্যাদি যে তিমিরে ছিল তা আজো সে তিমিরেই আছে। এসব সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উপর ভিত্তি করে লাভবান হয়েছে কেবলমাত্র বিশেষ শ্রেণীগোষ্ঠী। যাদেরকে আমরা সামন্তবাদ, বর্জোয়া পুঁজিপতি, অসৎ বেনিয়াদের দল, সরকারি প্রশাসনের ছত্রছায়ায় রক্ষিত কায়েমী স্বার্থবাদী আমলা ও রাজনীতিবিদ হিসাবে চিনি। এই চালচিত্র শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতে পাকিস্ত্মানে এবং শ্রীলংকাতেও একই ভাবে প্রযোজ্য। তবে শিড়্গা ও প্রযুক্তির বদৌলতে ভারত অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মনোভাবকে সজীব ও সচল রাখার জন্য পাকিস্ত্মানের প্রতিরক্ষা বিধির ১৮২নং বিধি বলে তৈরি "দি এনিমি প্রপার্টি" {শত্রম্ন সম্পত্তি} নামের আইনটি একটি উলেস্নখযোগ্য হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি একটি নির্লজ্জ ও নগ্ন আইন, যাকে অনেকে কালো আইন বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই আইনটি পরবর্তী কালে বাংলাদেশে তার খোলস বদলে "অর্পিত সম্পত্তি" নাম ধারণ করে পুরো সমাজকেই টিটকারি দিচ্ছে। সকল ধর্মেই উলেস্নখ আছে "পর সম্পত্তিতে লোভ করা কিংবা ভোগ করা অন্যায় এবং মহাপাপ"।

ধর্মীয় আলেম সম্প্রদায়গণের কাছে শুনেছি একজন মানুষ কেয়ামতের দিন কিছুতেই মুক্তি পাবে না, যতক্ষণ না সে অন্যের ভোগকরা জিনিসের দাবী সেই লোক থেকে ছাড়িয়ে না নেয়। এবং সেই দুর্যোগ মুহূর্তে কেহই নাকি দাবী ছাড়বে না, বিনিময়ে সে এমন কিছু চেয়ে বসে যা দেয়া সম্ভব নয়। অথবা তার আমলনামায় সংরক্ষিত পুণ্য বা নেকী সমুহ দিয়ে দিতে হয়, ফলশ্রম্নতিতে অপরের সম্পত্তি বা জিনিষ ভোগকারী ব্যক্তিটির নরকে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা থাকে না।

পাকিস্থান রাষ্ট্রটি যেহেতু দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে জন্য সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য এরা "শত্রম্ন সম্পত্তি" নামে কালো আইনটি এদেশে প্রতিষ্ঠিত করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে করেছে নিঃস্ব ও জর্জরিত। আর প্রশাসনের আওতায় প্রতিষ্ঠিত গুণীজনদের নামিয়ে এনেছে অপরের সম্পত্তি হরণের পাপ-পঙ্কিল নর্দমায়।

আমার এক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন কেউ যখন দু'একজন মানুষ খুন করে, সমাজ তাকে খুনী হিসাবে চিহ্নিত করে। কিন্তু ওই লোকটি যখন শত শত মানুষ খুন করে সমাজ তখন হত্যাকারীকে বীর উপাধি দেয়। কথাটি একারণে বললাম যে, কেউ যখন অপরের সম্পত্তি কিংবা গরিবের সম্পত্তি জোর জুলুম করে আত্মসাৎ করে সেটা তখন খুবই পাপের কাজ হয়। আর যখন সম্মিলিত ভাবে শলাপরামর্শ করে কালো আইন তৈরি করে তা দখল বা আত্মসাৎ করা হয় তখন সেটা আর পাপ হয় না, অন্যায়ও হয় না। সেই অধ্যাপকের উদাহরণের ন্যায় খুনীকে বীর উপাধি দেয়ার মতো।

"অর্পিত সম্পত্তি" আইনের মুলকথা হচ্ছে সাবেক পূর্ব পাকিস্থান আমলে ১৯৬৫ ইংরেজীর ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালের ১৬ই ফেব্রম্নয়ারি পর্যন্ত যেসকল নাগরিক দেশ ত্যাগ করেছিল তাদের সকল সম্পত্তি "শত্রম্ন সম্পত্তি" হিসাবে অধ্যাদেশ জারি করে মানুষকে লুণ্ঠনের উস্কানী দেয়া। উলেস্নখ্য যে এসময় ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে ১৭ দিন ব্যাপী যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। সুতরাং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়ে অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভারতে অস্থায়ী ভাবে পাড়ি জমায়।

উলিস্নখিত ওই তারিখের আগে শত্রম্ন সম্পত্তি হিসাবে কোনো প্রকাশ্য আইনজারি না থাকলেও অলিখিত এবং অঘোষিত ভাবে (রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভাষায় যেমন করে অনেক রাষ্ট্রের লিখিত এবং অলিখিত শাসনতন্ত্র থাকে) সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি গ্রাসের সুযোগ সুবিধা ছিল। সাবেক পূর্ব পাকিস্থান আমলে কুমন্ত্রণার কুমীর বলে খ্যাত নুরম্নল আমীন, মোহাম্মাদ আলী, মোনায়েম খাঁন, ফজলুল কাদের চৌধুরীর মত বৈশ্য ও তাদের তাবেদার গোষ্ঠীর অনেকেই এসব সম্পত্তি গ্রাস করার সুযোগ পায়। এরা ছিল ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের অনুসারী।

তখনও এদেশের মানুষ রাজনৈতিক ভাবে এত সচেতন ছিল না। সরকারের গুপ্ত কুট-কৌশল বা এজাতীয় অনেক কিছু কোথায় কি হচ্ছে তা জানা ও সম্ভবপর ছিল না। ধর্মের ঢাকঢোল পিটিয়ে সবকিছু গোপন রাখাই ছিল তাদের স্বভাব। বিত্তশালী সংখ্যালঘুদের অনেককে মিথ্যা মামলায় হেনস্থা করে তাকে উচ্ছেদের ব্যবস্থা করা হতো। সাবেক পূর্ব পাকিস্থানে যেসব পশ্চিম পাকিস্থানি বণিক গোষ্ঠী (যেমন দাউদ, ইস্পাহানী, বাওয়ানী ইত্যাদি) এবং

উর্দুবাসী বিহারীরা ছিল, তারা পুর্ব পাকিস্থানে অনেক মিল, ফ্যাক্টরী, ইন্টেডিং ফার্ম এবং অন্যান্য ব্যবসা বাণিজ্য খুলে বসে।

ওইসব ব্যবসা বাণিজ্যের সন্ধান এবং পুঁজি তারা কোথায় পেয়েছিল ? তারা পেয়েছিল ওই অঘোষিত অলিখিত "শত্রম্ন সম্পত্তি" নামক সম্পত্তি থেকে। উনিশশো চুয়াত্তর সালে স্বাধীন বাংলাদেশে চরম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুরাবস্থার মধ্যে এই "শত্রম্ন সম্পত্তি" নামের আইনটি বাতিলের উদ্যোগ নিয়েও তা কার্যকারী সম্ভব হয় নি। এর পেছনে কিছু রাজনৈতিক কারণ ছিল। শেষ অবধি তা "অর্পিত সম্পত্তি" হিসাবে আখ্যা পায়। ১৯৯৮ **সালের শেষের দিকে রাজনৈতিক দল 'আওয়ামী লীগ'** এই আইন বাতিল হিসাবে ঘোষণা করে। যা ছিল সরকারের একটি দুঃসাহসী পদক্ষেপ, এতে কোন সন্দেহ নেই।

এই ঘোষণার পর দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা গুরম্নত্ব সহকারে উক্ত খবর ছাপায়। নিউইয়র্ক থেকে "সাপ্তাহিক ঠিকানা ও পর পর কয়েকটি সংখ্যায় এই সংবাদ প্রকাশ করে। পত্রিকার বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে জানা যায় অর্পিত সম্পত্তির দখলদারীরা হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এবং বিভিন্ন সময়ে সরকারি ক্ষমতায় কিংবা আশ্রয়ে থাকা এক গোষ্ঠী কায়েমী স্বার্থবাদী দল বা শ্রেণী। (অর্পিত সম্পত্তি কার দখলে কত? ৮ জানুয়ারী ১৯৯৯ তারিখে প্রকাশিত "সাপ্তাহিক ঠিকানা" এবং "দৈনিক জনকণ্ঠ" শেষ পৃষ্ঠা প্রযোজ্য)

প্রকাশিত এই সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট থেকে যে তথ্যচিত্র পাওয়া যায় তা সাদামাটা খবর হিসাবে না নিয়ে অন্তরচক্ষুর সাহায্যে যাচাই করলে পুরো সমাজের একটি বিশাল ও ভয়াবহ রূপ আমাদের কাছে ধরা পড়বে। এগুলো তো সরকারের বড় বড় হিসাব। কিন্তু এই হিসাবের বাইরে আছে অসংখ্য জমি-জমা, ঘর বাড়ির ইতিহাস, যেগুলো খরিদ-বিক্রির নামে সংখ্যাগরিষ্টদের হস্তগত হয়েছে, কিন্তু সরকারের ঘরে কোনো সত্য রেকর্ড নেই।

এগুলো অধিকাংশই ভুয়া রেকর্ড। হাজার হাজার ফাইলের মধ্যে পুরানো তারিখ না হয় পুরানো ষ্ট্যাম্প-দলিলে তা লিখিয়ে নেয়া হয়েছে। নতুন চাউলের মধ্যে পুরানো চাউল মিশিয়ে ব্যবসা করার মতই। কারণ সত্যমিথ্যা যাচাই করবে কে ? যারা যাচাই করবে তারাইতো ফাইলগুলো মিশিয়ে রেখেছে।

১৯৯৮/৯৯ সালে আওয়ামী লীগের ঐ (অর্পিত সম্পত্তি) আইন বাতিলের পদক্ষেপ অবশ্যই দুঃসাহসী পদক্ষেপ, কেননা পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী এটা আওয়ামী লীগের নিজের পায়ে নিজে কুঠার মারার মতই আত্মঘাতী। এই কায়েমী স্বার্থদ্বন্দ্বের কারণে দলের মধ্যে শুধু ভাঙন নয় বরং বিরোধী দলে যোগদান করে প্রতিপক্ষকে শক্তিশালী করে আওয়ামী লীগের পতন ঘটানোর মতো দুরভিসন্ধিমুলক ভুমিকা যে থাকবে না তা কখনও হলফ করে বলা যায় না।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বাস্তবে এটা কতটুকু কার্যকারী করা যাবে তা ভেবে দেখার বিষয়। অনুন্নত বিশ্বে এসব বাস্তবায়িত করা শুধু দুরহ নয় অবিশ্বাস্য ও বটে। এই কালো আইনের আওতায় আমরা কী ভাবে আঞ্চলিক এবং জাতীয় ভাবে চরম সঙ্কটের বেড়া জালে জড়িয়ে পড়েছি। তার দু'টি উদাহরণ প্রয়োগ করলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে।

প্রথমে জাতীয় সঙ্কটের কথা বলি।

যে কোন সমাজে ধনী কিংবা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যে যেখানে জন্ম গ্রহণ করে শত সমস্যা থাকলেও নিজের ঘরবাড়ি, নিজের আত্মীয় স্বজন, নিজের সমাজে বসবাস করার যে সুখ শান্তি ও সম্মানবোধ থাকে তা আর পৃথিবীর কোথাও থাকে না। মানুষ যে পরিবেশে বড় হয়ে ওঠে সেখানকার মাটি ও প্রকৃতির সাথে তার এক অদৃশ্য ও নিবিড় সমন্ধ স্থাপিত হয়ে যায়। তারপরে ও থাকে বংশ ও উত্তরাধিকার সুত্রের নানা ঐতিহ্য। মানুষ এই বন্ধন থেকে যখনই বিচ্ছিন্ন হওয়ার মত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখন বাইরের অশ্রুন্ন বর্ষন শেষ কথা নয়। তার অন্তরের অদৃশ্য হাহাকারকে কেউ দেখে না, যে হাহাকারে খোদার আরশ কাঁপে।

ক্যানাডার টরন্টো থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'দেশে বিদেশের' ২৪ ডিসেম্বর ৯৮ ইংরেজী সংখ্যায় বুদ্ধিজীবি ডঃ গবিন্দ চন্দ্র দেব (সংক্ষেপে ডঃ জি.সি.দেব) এর মত একজন ভাল, ভদ্র ও নিরীহ মানুষের সম্পত্তিকে কি ভাবে অর্পিত আইনের আওতায় গ্রাস করা হচ্ছে তার বিবরণ ছাপা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তার পরিস্থিতি যখন চরমে দাড়ায় মানুষ তখন বাধ্য হয়েই নিজের বাস্তভিটা ত্যাগ করে। আর এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য দায়ী হচ্ছে উলিস্নখিত "দ্য এনিমি প্রপার্টি বা অর্পিত সম্পত্তি" নামক পাকিস্থানের তৈরি কালো-আইন।

একজন মানুষ যে দেশে জন্ম গ্রহণ করে, যে দেশে বড় হয়, সে মানুষ কোনো রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপ ব্যতীত কী ভাবে জাতীয় শত্রুন্নতে পরিণত হয় এবং তার সম্পত্তি শত্রুন্ন সম্পত্তিতে পরিণত হয় এই নজীর পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রে আছে কিনা আমার জানা নেই। একজন মানুষ কোনো কারণে রাষ্ট্রদ্রোহী হলে তার বিরদ্ধে মামলা হতে পারে, আদালতে বিচার হতে পারে তাই বলে সেই লোকগুলো কোনো কারণ ছাড়াই কি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যে একটি দেশের সরকার তাদেরকে উচ্ছেদ করার জন্য " শত্রুন্ন সম্পত্তি" নামে একটি অন্যায়, অমানবীয় আইন তৈরি করে তার পরিণতি কেবল মাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে? আসলে এটা ছিল মধ্যযুগীয় বর্বর প্রথার মত সম্পত্তি গ্রাসের একটি বিকল্প অনুকরণ। অর্থাৎ তুমি যদি সংখ্যাগরিষ্টদের ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যাও তাহলে তোমাকে এই সমাজে ঠাই দেয়া হবে, অন্যতায় তোমার উচ্ছেদ অনিবার্য।

পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর কত হাজার বা কত লক্ষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এই দেশ ত্যাগ করেছে তার সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও এই

অভিযোগ একেবারে থেমে থাকেনি। বিভিন্ন সরকারের আমলে অনেক সাম্প্রদায়িক ঘটনাবলীর জন্ম দেয়া হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ছিল খুবই উচ্চবিত্ত, তারা খুব একটা ক্ষতিগ্রস্থ হয় নি, কারণ তাদের নিজস্ব শিক্ষা এবং বংশগত প্রতিপত্তি থাকার বদৌলতে তারা এদেশে প্রচলিত মুল্যমানে বা কিছুটা কমমুল্যে তাদের সম্পত্তি বিক্রি করে দেশ ত্যাগ করেছে। বিনিময়ে তারা ভারতে গিয়ে বাড়িঘর খরিদ করতে পেরেছে না হয় ব্যবসায় পুঁজি খাটাতে পেরেছে। এদের অনেকে আবার সম্পত্তি বিনিময়ের মাধ্যমেও নিজেদের সামাজিক অবস্থানকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে।

এই সংখ্যক দেশত্যাগী মানুয়ের সংখ্যা শতকরা (মোট দেশত্যাগীদের মধ্যে) আট থেকে দশ ভাগ বলে গবেষকরা অনুমান করেন। কিন্তু ভারত সরকার মাঝেমধ্যে যে রিপোর্ট প্রকাশ করে তা ভূয়া এবং মিথ্যায় পরিপুর্ণ। এসব রিপোর্ট তৈরি করে তারা দুই বাংলার বাঙালির মধ্যে একটা দ্বন্ধ একটা উত্তেজনা একটা ক্রোভ সৃষ্টি করে রাখে। জাতীয় ঐক্যে ফাটল না ধরার জন্যই ভারত সরকার তা করে। বাংলাদেশ থেকে উচ্চপদস্থ বা নামী দামী মানুষেরা যখন দেশত্যাগ করে তখন তাদের নিজ নিজ এলাকায় যে সকল মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত সম্প্রদায় ছিল তারা খুবই অসহায় হয়ে পড়ে। কারণ বিপদে আপদে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, কিংবা মামলা মকদ্দমায় এই উচ্চবিত্ত জ্ঞানী লোকগুলো ছিল তাদের সম্প্রদায়ের মুরব্বী। সাধারণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এদের কাছ থেকেই আশ্বাস, অভয় বাণী, সাহায্য সবকিছুই পেত। কারণ তারা ছিল অধিকাংশই কৃষক, কামার, কুমার, তাতী, জেলে, ও অন্যান্য শ্রমজীবি সাধারণ মানুষ। এই সাধারণ মানুষরা পরবর্তীতে "শত্রম্ন সম্পত্তি তথা অর্পিত সম্পত্তি" নামক কালো আইনের চরম শিকারে নিঃস্ব এবং জর্জরিত হয়।

এসব সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ করার জন্য নানা ভাবে হয়রানি করা হত। যেমন ক্ষেতের ফসল কেটে নেয়া, জমিনের আইল ঠেলে তা বর্ধিত করা, গৃহপালিত জীবজন্তু জোর করে জবাই করা না হয় চুরি করা, রাত্রিবেলা ফল ফসলের গাছ উপড়ানো, মাছের পুকুরে বিষ প্রয়োগ, মাছ ধারার জাল কেটে ফেলা, খড়ের ঘরে আগুন দেয়া , যুবতী মেয়েদের সাথে অবৈধ প্রেমের পায়তারা ইত্যাদি শত রকমের উৎপাত। উৎপাতে অতিষ্ট হয়েই এই শ্রেণীর মানুষ তাদের সম্পত্তি কম মুল্যে বিক্রি করে ভারতে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিত। অনেক সময় তারা একই সম্পত্তি দু তিন জনের কাছে বিক্রি করতো গোপনে। কারণ তারা জানতো তাদেরকে কৌশলে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। সুতরাং ছল-চাতুরী ও প্রতারণা করে নগদ যা পাওয়া যায় তাই লাভ। এই শ্রেণীর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রা ভারতে গিয়ে ও খুব একটা লাভবান হয় নি। কারণ সেখানকার সমাজও তাদেরকে মন দিয়ে গ্রহণ করে নি। তারা বাস্তুত্যাগী হিসাবেই সেখানে চিহ্নিত হয়েছে। হয়েছে নানা হিংসার শিকার। তারা খুইয়েছে তাদের সামাজিক মর্যাদা।

কী জাত? কী বংশ ? কুলীন না অকুলীন, স্পৃশ্য না অস্পৃশ্য ইত্যাদি শত-রকমের মানসিক পীড়াদায়ক যন্ত্রনা নিয়ে তাদেরকে করতে হয়েছে বসবাস। একূল ওকূল, দুকূল হারিয়ে তারা হয়েছে পথের ভিখারী। আগেই বলেছি পাকিস্থানি আমল থেকে কত লোক দেশ ত্যাগ করেছে তার সঠিক পরিসংখ্যান নেই। গত ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত বিশেষ টাস্কফোর্স সরকারের কাছে যে রিপোর্ট পেশ করে তাতে উলেস্নখ করা হয়েছে সারা ভারতে অবৈধ বাংলাদেশীদের সংখ্যা ১ কোটি ৮০ লক্ষ। এর মধ্যে পশ্চিম বঙ্গেই আছে ১ কোটি ২০ লক্ষ।

তবে এত সংখ্যক অবৈধ বাংলাদেশীদের হিসাব কবে থেকে ধরা হয়েছে (১৯৭১ ইং থেকে না ১৯৪৭ থেকে) তা উলেস্নখ করা হয় নি। ভারতের তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট মন্ত্রী এল.কে.আদভানী লোকসভায় জানিয়েছেন গত ৪ বছরে শুধু পশ্চিম বঙ্গ থেকে ৫০ হাজার ১৩২ জন বাংলাদেশীকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। আদভানী আরও বলেছেন এই সীমান্ত অনুপ্রবেশকে রোধ করার জন্য কাঁটা তারের বেড়ার কাজ এবং সীমান্ত সড়ক নির্মানের কাজ দ্রম্নত এগিয়ে চলেছে। এই কাঁটা তারের বেড়া আমাদেরকে খোয়াড়ের মধ্যে পুরে রাখার মতই একটি হেয় এবং অশোভনীয় পদক্ষেপ। বিশ্ব সমাজে আমাদেরকে এভাবে অপদস্থ করার কোনো অধিকার ভারতের নেই। অপরদিকে সীমান্ত সড়ক নির্মাণ যে কত ভয়াবহ হবে তা বলাই বাহুল্য।
(ভারতের এবার সীমান্ত সড়ক প্রকল্প, মিনি ফারাক্কা। বাংলাদেশের ঘটবে পরিবেশ বিপর্যয়, সাপ্তাহিক "ঠিকানা" ১৯৯৯ ইংরেজীর ১ লা জানুয়ারী সংখ্যা, নিউইর্য়ক)

এই "অর্পিত সম্পত্তি" নামক কালো আইনটির যদি উৎপত্তি না হত তাহলে এতসংখ্যক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হত না। এরা দেশ ত্যাগী হয়ে যাওয়ার কারণে ও চোরা চালানির কারণে ভারত কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ এবং সীমান্ত সড়ক নির্মাণের ছুতা বা উছিলা খুঁজে পেয়েছে। বাংলাদেশের এক শ্রেণীর সুবিধাভোগী লোকেরা অর্পিত সম্পত্তি ভোগ দখল করছে। আবার সেই সম্পত্তি কোনো কোনো স্থানে ডি.সি, সার্ভেয়ার ও ভূমি প্রশাসক কর্তৃপক্ষাদের দুর্নীতি ও কলমের জোরে খাসজমিতে পরিণত হয়েছে। ওইসব জমি খুব কম সংখ্যক ভূমিহীনরা পেয়েছে। এসব অধিকাংশ জমি রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ, মধ্যস্বত্তভোগী, ফড়িয়া ও দালালরা সামান্য টাকা নাহয় প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে হাতিয়ে নিয়েছে। এই অর্পিত সম্পত্তির লেজুড় বেয়ে অনৈতিক কার্যকলাপের জন্য আজকে জাতীয়ভাবে আমাদের সকলকেই কাঁটা তারের বেড়া শুধু সীমান্তে নয় ইজ্জতের দিক থেকে তা গলায় পরতে হচ্ছে। অতএব এই আইন বাতিল করা আর না করা এখন আমাদের কাছে সমান কথা।

কারণ সব দেশত্যাগীদের যেমন দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়, তদ্রুপ "শত্রুর সম্পত্তি এবং খাসজমি" যাদের দখলে আছে তাও উদ্ধার করা সম্ভব নয়। অতএব যারা ওইসব সম্পত্তি ভোগ দখল করে কাঁটা তারের সমস্যা এনেছে তাদের গলায় যদি এই কাঁটা তার পরানো যায়, এবং যেকোন ক্ষমতাসীন সরকার যদি সেই ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলেই নিস্পাপ জনগণ স্বস্তি পাবে।

"অর্পিত সম্পত্তি" আইনের আওতায় একটি জাতি কি ভাবে আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব ও রেষারেষিতে জড়িয়ে পড়তে পারে তার একটি উদাহরণ আমি দেব। আমি ৯৯ সালের গোড়ার দিকে "সাপ্তাহিক দেশে বিদেশের" একটি সংখ্যায় মতামত কলামে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সংক্রান্ত কথা লিখতে গিয়ে খাস জমি বিতরণের ব্যাপারে সরকারের কিছু শর্তাবলী থাকা প্রয়োজন এর উপর গুরুত্ব দিয়ে কয়েক লাইন লিখেছিলাম । কিন্তু স্থানাভাবে হোক বা অন্য কোনো ভুলে হোক সেই কথাগুলো পত্রিকায় ছাপা হয় নি, এখন পুণরায় সেই শর্তাবলীর কথা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে কিন্তু কীভাবে ব্যাখ্যা করে উপস্থাপনা করবো তা ভেবে পাচ্ছিনা।

তবে আসল কথা হল খাস জমি কারা পেতে পারে ? এবং কি কি শর্তে পেতে পারে ? তার কিছু নিয়ম কানুন ও বাস্তব আইনের প্রয়োগ থাকা চাই, অন্যতায় খাস জমি নিয়ে রক্তারক্তি হোক কিংবা আঞ্চলিক দ্বন্দ্বের সুত্রপাত হোক আবার তা থেকে জাতীয় ঐক্যে ভাঙন ধরন্নক এজাতীয় পদক্ষেপ কিছুতেই একটি রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গালজনক হতে পারে না। আমাদের জাতীয় প্রশাসনে একটি নিয়ম আছে আর তাহলো ; কোনো জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত প্রশাসক, কালেক্টর কিংবা থানার বড় অফিসার কেহই নিজ নিজ জেলাতে বা এলাকাতে চাকুরি করতে পারেন না। কারণ এতে স্বজনপ্রীতির ডামাঢোলে তিনি স্বেচ্ছাচারী হয়ে যেতে পারেন। একারণেই এ নিয়ম। কিন্তু কথায় বলে "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে"।

জমিদারী প্রথা বিলোপের পর সঠিক দলিল দস্তাবেজের ঘাপলায় এবং পরবর্তী কালে অর্পিত আইনের আওতায় সিলেটে প্রচুর খাস জমি বরাদ্দ ছিল। ওইসব জমি অনেক সরকারি প্রতিনিধি, স্থানীয় প্রভাবশালী মাতব্বর, বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্রনেতা ও অন্যান্য টাউট, বাটপাড়েরা সামান্য টাকার বিনিময়ে এবং দক্ষিণ হস্তের পারদর্শিতায় ওইসব জমি ভোগ দখল করে। পরবর্তী কালে দেখা গেল সিলেটে অবস্থানরত বহু জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য সরকারি প্রতিনিধিরা ওইসব খাস জমি সিলেটবাসীদের কাছে ভোগ দখলের সুযোগ না দিয়ে নিজেদের জেলার লোকদের জন্য বন্দোবস্ত করে পেঁচালো কৌশলের মাধ্যমে সল্পমুল্যে তা বিক্রি করাতে লাগলেন। এতে করে সিলেটের আনাচে কানাচে নতুন নতুন কমিউনিটি বাড়তে লাগলো।

আস্তে আস্তে অনেক পাড়া পরিণত হলো গ্রামে। ওই সঙ্গে বাড়তে লাগলো নানাবিধ অপরাধ ও অপকর্ম। জনাধিক্যের ভারে নানাবিধ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং স্বাস্থ্যগত ভারসাম্যতা হল নুজ্য। সুতরাং স্বভাবজাত রেষারেষি আর হিংসা কোন্দল ওই সঙ্গে বেড়ে চললো। শান্তির পায়রা পালিয়ে বেড়ালো এইসব স্থান থেকে। অতএব "অর্পিত সম্পত্তি" আইনের আওতায় কত অশান্তির বীজ ছিল তা কালের যাত্রায় বেরিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব থেকে জাতীয় দ্বন্দ্ব সবকিছুরই ফলাফল আমরা দেখতে পাচ্ছি এই আইনের কারণে।

যদি খাস জমি বিতরণের মধ্যে বিভিন্ন শর্তাদি থাকতো এবং শর্ত ভঙ্গের কারণে তা পুণরায় সরকার ফিরিয়ে নিতে পারতো তাহলে হয়তো আমরা শান্তির পথে এগুতে পারতাম। আজ পযন্তর্ আমরা দেখিনি অতীতের কোনো সরকার, খাস জমিকে জাতীয় এবং সামাজিক কল্যাণমুলক কাজে লাগিয়েছে। বড় বড় শহরে হয়তো নিজেদের চাকুরি বাঁচানোর জন্য বা লোক দেখানো মর্যাদা পাওয়ার জন্য একটু আধটু করা হয়েছে।

কিন্তু উলেস্নখযোগ্য ভাবে সামাজিক উন্নতির জন্য তেমন কিছুই করা হয় নি, যেমন "গ্রাম গঞ্জের" সরকারি জমিতে হাসপাতাল তৈরি করা কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, কর্মসংস্থান তৈরির জন্য মিল কারখানা তৈরি করা, বিনোদনমুলক প্রতিষ্ঠান খোলা, দুর্ভিক্ষের সময়ে খাদ্য গুদামজাত করার জন্য গুদাম তৈরি করা, কিংবা ঝড় বন্যার সময় আশ্রয়স্থল নির্মাণ করা। বৃদ্ধদের অবসরের জন্য বিনোদন মুলক খেলাধুলা কিংবা লাইব্রেরি তৈরি করা। গৃহহীন কিংবা প্রাকৃতিক ভাবে অসামর্থ্যদের জন্য বাসস্থান তৈরি করা, বাজার বা মার্কেট তৈরি করে তার মুনাফা দিয়ে সরকারের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে সাহায্য করা, এজাতীয় অনেক কিছুই করা হয়নি। কেবল টাকা ও স্বজন-প্রীতির আওতায় বড় বড় রম্নই কাতলাদের তেলা মাথায় তেল দেয়া হয়েছে।

বিগত সৈন্য সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পর আমরা দেখলাম এবং জানলাম মন্ত্রী মিনিস্টার সহ সকল পর্যায়ের দুর্নীতিবাজদের আত্মসাৎ করা টাকার পরিমান কত বেশি ছিল। যা দেশের জনগণ কল্পনাও করতে পারে নি। ওই টাকাগুলো শক্তহাতে উদ্ধার করে উপরে উলিস্নখিত সমাজ ও রাষ্ট্র কল্যাণের কাজ সহজেই বাস্তবায়িত করা যেত।
কিন্তু সেটা তো হলো না, এমন কি "শত্রম্ন সম্পত্তি" আইনটির ও কোনো সুরাহা হলো না। অতএব শত্রম্ন সম্পত্তি আইনের আওতায় আজ আমাদের জাতীয় ও সামাজিক পরিস্থিতির ভবিষ্যত কি ভয়াবহ হচ্ছে এবং তা ক্রমাগতই ভেবে দেখার বিষয়। ২০০৮ সালের ১৯ নভেম্বর, বুধবারে "সমকাল" নামে ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'কাজী আব্দুল হান্নানের' লিখিত একটি কৌতুহল উদ্দীপক খবর ছাপায়। পত্রিকাটির শেষ পৃষ্টায় খবরটির হেডিং ছিল এরকম "প্রত্যপর্ণযোগ্য অর্পিত সম্পত্তির গেজেট চলতি মাসেই" খবরটির সারাংশ হলো,

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তি সর্ম্পকীত সমস্যার স্থায়ী সমাধানের প্রক্রিয়া শুরম্ন হচ্ছে।

অর্পিত সম্পত্তির তালিকা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হবে। এরমধ্যে ৫৪টি জেলার তালিকা ইতিমধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে পৌছে গেছে। গেজেট প্রকাশের পর দাবীদাররা সম্পত্তি হস্ত্মান্ত্মরের জন্য ৯০ দিনের মধ্যে ট্রাইবুনালের কাছে উপযুক্ত প্রমাণ সহ আবেদন করতে পারবেন। সংশিস্নষ্ট আইন অনুযায়ী আবেদন পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে ট্রাইবুনাল কাগজ-পত্র পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত্ম দেবে।
দাবী গ্রহণযোগ্য হলে ট্রাইবুনাল সরকারকে নোটিশ দেবে। প্রয়োজনে উভয় পক্ষকে ডেকে শুনানী করে মোট ১৮০ দিনের মধ্যে রায় দেয়া হবে। রায় অনুযায়ী ৪৫ দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসন সম্পত্তি হস্ত্মান্ত্মর করবে। দাবীদার না পাওয়া গেলে সংশিস্নষ্ট সম্পত্তি সরকারের খাস তালিকায় চলে যাবে।

নির্ভরযোগ্য সুত্রে জানা গেছে দেশে মোট অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ ৬ লাখ ৪৩ হাজার ১৩৬ একর ৯০শতাংশ। এর মধ্যে ৪ লাখ ৪৫ হাজার ৯২২ একর ৭৬ শতাংশ প্রর্ত্যপনের (ফেরত হস্ত্মান্ত্মরের) যোগ্য নয়। ফেরতযোগ্য সম্পত্তির পরিমাণ মাত্র ১ লাখ ৯৭ হাজার ২১৪ একর। অর্পিত সম্পত্তির প্রর্ত্যপন আইনের ৩৩ ধারা অনুযায়ী অর্পিত সম্পত্তি লিজ দেয়ার বিষয়টি ও বাতিল করা হয়েছে। এই হলো খবরটির মোটামোটি সারাংশ। বর্তমান সরকারের এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। খবরটি পাঠ করার পর বহুবিধ প্রশ্ন মাথায় এসেছে। বিষয়টি ছাপার অক্ষরে দেখে আমরা যত সহজ মনে করছি, বিষয়টি তত সহজ নয়। এর মধ্যে অসংখ্য জটিলতার বীজ ঘুমিয়ে আছে।

এরপর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে "যে ৪ লাখ ৪৫ হাজার ৯২২ একর সম্পত্তি ফেরত যোগ্য নয়" এর প্রধান কারণ কি ? কি জন্য ফেরত যোগ্য হবে না তার কোনো ব্যাখ্যা জানা যায় নি। ট্রাইবুনাল গঠন এবং এসব ট্রাইবুনালের সদস্যরা কতটুকু নিরপেক্ষ ? তারা কি তাহলে 'ফেরত যোগ্য নয় সম্পত্তির' ভাগীদার বা দখলদার ?

এই যে ৯০ দিন, ৩০দিন, ১৪৫ দিনের প্রক্রিয়া এবং তৎসংলগ্ন শুনানী, প্রমাণপত্রের দলিল ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। রায় দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, বাস্ত্মবে এর জটিলতা এবং আনুসাঙ্গিক সমস্যা ও এর সমাধানের পথ বহু দীর্ঘ। দেশে দেওয়ানি ফৌজদারি মামলার লড়্গ লড়্গ ফাইল ঝুলে আছে বিচারকদের অভাবে, আইনের জটিলতায়, সাড়্গী সাবুদের অভাবে, সর্বোপরি প্রতিপড়্গের কৌশলী আইনের মারপ্যাঁচে শুধু সময় অতিবাহিত হওয়া বা কালড়্গেপন ছাড়া কিছুই হচ্ছে না। এটাতো রাষ্ট্রের জনগণের বাস্ত্মব অভিজ্ঞতা, আমার

মুখের কথা নয়। সুতরাং এই জটিলতা এবং সমাধান দেশের জনগণের জন্য একটি বিশাল বিষফোড়া।
ভূসম্পত্তি এমন এক জিনিস যার জন্য মানুষ বুকের রক্ত দিতে একটু ও দ্বিধাবোধ করে না। সরকার কি এসব জটিলতা ও রক্তের পথকে পরিহার করে শান্তিপূর্ণ ভাবে এর সমাধান দিতে পারবেন ? সেটি এখন দেখার পালা। তবুও সরকারকে ধন্যবাদ এজন্য যে, অন্তত পক্ষে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে একটা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে ।

১লা জুন ২০১০ তারিখে (ভলিয়ম ১০, ইস্যু ১৯) ক্যানাডার টরন্টো থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "বাংলা কাগজ" একটি বিশেষ খবর প্রচার করে। (খুব সম্ভব এটা 'প্রথম আলোতে' প্রকাশ হয়েছিল) "পাঁচ লাখ মানুষ দখল করে আছে ৫লাখ কোটি টাকার অর্পিত সম্পত্তি : ড: আবুল বারকাত" দেশের স্থাবর ও অস্থাবর অর্পিত সম্পত্তির মোট আর্থিক মূল্য প্রায় ৫ লাখ কোটি টাকা। যা লাখ পাঁচেক মানুষ দখল করে আছে। এ তথ্য জানিয়ে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড: আবুল বারাকাত বলেছেন, সব সময় ক্ষমতাসীন দলের লোকজনই অর্পিত সম্পত্তি দখল প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশিস্নষ্ট।

কোনো গরিব মানুষ অর্পিত সম্পত্তি দখল করে নি। তিনি অর্পিত সম্পত্তির আইন সংশোধনের দাবী জানান। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন সংশোধন আইন প্রসঙ্গে নাগরিক সমাজ ও ভুক্তভোগীদের বক্তব্য শীর্ষক সাংবাদিক সম্মেলনে ড: বারাকাত এসব কথা বলেন। 'এসোসিয়েশন ফর ল্যা- রিফর্ম এন্ড ডেভেলাপমেন্ট' (এ.এল.আর.ডি.) সম্মিলিতি সামাজিক আন্দোলন, অর্পিত (এনিমি/শত্রম্ন) সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ আন্দোলন, এইচ.ডি.আর.সি- 'বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট' (বস্নাস্ট) আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এবং 'নিজেরা করি সংগঠন' যৌথভাবে গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এই সম্মেলন বা কর্মশালার আয়োজন করে।

ডা: আবুল বারাকাত বলেন, দেশের ২৭লাখ হিন্দু পরিবারের মধ্যে ১২ লাখ সরাসরি অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা জমি হারিয়েছে ২৬ লাখ একর বা ৭৮ লাখ বিঘা। এরমধ্যে ৭০ লাখ বিঘা জমি বেদখল হয়ে গেছে। বাকি জমি সরকারের হাতে রয়েছে। লিখিত বক্তব্যে অর্পিত(এনিমি/শত্রম্ন) সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত চৌধুরী বলেন, **মন্ত্রী এমপি এবং আমলাদের কারণে অর্পিত সম্পত্তি আইনের সংশোধনী পাস হচ্ছে না।**
ফলে মন্ত্রী সভার বৈঠকে অনুমোদন পেলেও এখন পর্যন্ত তা সংসদে উত্থাপন করা হয় নি। সাংবাদিক সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন 'নিজেরা করি সংগঠনে'র সমন্বয়কারী খুশি কবির ও এল.আর.ডি'এর পরিচালক শামসুল হুদা।

৬ ♦ হৃদয় দিয়ে দেখো ♦

কী একটা তথ্যবহুল কাগজ খোঁজতে গিয়ে বাক্সের নিচে পেলাম সাদা মারগিন কাপড়ে পেঁচানো বাবার বিয়ের কাবিন-নামা। সে কাবিনে দেখতে পেলাম বাবার নামের আগে 'শ্রী' শব্দটি লিখা এবং আমার মায়ের নামের আগে 'শ্রীমতি' শব্দ লিখা। আমি তৎক্ষণাৎ বাবাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, আগে আগে এরকম লিখার প্রচলন ছিল। এমনকি ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের আগে অনেক পুরানো দলিল দস্তাবেজেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শব্দটি আমার মনে বেশ খট্‌কা লাগায়।

কারণ আমি মুসলিম পরিবারের ছেলে, সাধারণত ঐ শব্দ দু'টির সাথে আমাদের সম্বন্ধ তেমন ঘনিষ্ট হওয়ার কথা নয়। ধর্মের জিকির (জয়গান) তুলে যখন বাঙালি ভূখন্ডে পূর্ব-পাকিস্তান সৃষ্টি হলো, তখন পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় আমাদেরকে শুদ্ধ মুসলমান বানানোর প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হলো। ওদের যুক্তি ছিল আমরা বাঙালিরা মুসলমান হলেও আমাদের পূর্বপুরুষরা অধিকাংশ হিন্দু ছিলেন, তাই আমাদের নামে এখনও হিন্দুয়ানী গন্ধ রয়েছে। কাজেই সেটা ঘসে মেজে মুছে ফেলা দরকার।

সে জন্য 'জনাব' এবং 'জনাবা' শব্দ ছাড়াও শ্রী শব্দের বিপরীতে এলো 'মোহাম্মদ' আর শ্রীমতি শব্দকে ভেদ করে বেরিয়ে এলো 'মুছাম্মাত' শব্দ। এখন পাপী তাপী ধনী গরিব কেউই আর মোহাম্মদ ও মুছাম্মাত এর টাইটেল থেকে রেহাই পায় নি। নামাজি, আংশিক নামাজি, অত্যাচারী, চোর, ডাকাত, গুন্ডা, পীর, ফকির সবার নামের শুরুতে পবিত্র নাম 'মোহাম্মদ' শব্দটির মুকুট পরিয়ে দেয়া হলো। একটি পবিত্র নামের অপব্যবহার করে বাঙালি মুসলমানেরা পরম তৃপ্তি বোধ করতে লাগলো।

এ জাতীয় নামে পাসপোর্ট নিয়ে দেশ থেকে (গ্রেট বৃটেন ব্যতীত, কারণ ওরা শাসন করেছে বলে আমাদের নাম রাখার ব্যাপার কিছুটা জানে) যারা ভিন্ন দেশে গেছেন তারা ভালই জানেন ফেমেলি নাম ও ডাকনাম এবং সংক্ষিপ্ত এম,ডি এর জ্বালা কত যন্ত্রনাদায়ক। সারা দুনিয়া জুড়ে কোটি কোটি মুসলমান রয়েছেন কিন্তু বাঙালি ব্যতীত আর কোনো জাতি এ রকম ঢালাও ভাবে 'মোহাম্মদ' হয়ে যায় নি। ধর্মদেশ সৌদী আরবে তো নয়ই এমনকি খুদ পাকিস্তানেও তাই ঘটে নি।

এতে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে উর্দু ভাষী লোকগুলো আমাদেরকে কোন দৃষ্টিতে দেখতো। চান মিয়া, চান্দ আলী, কিংবা সুরুজ আলী, দয়াল এ সমস্ত নামের মধ্যে পাকিস্তানের

শাসকবর্গরা বিধর্মীর্য় গন্ধ পেতো। চান্দকে চন্দ্র, সূর্যকে সূর্য্য বুঝায়, কাজেই ঐগুলোতে চন্দ্রপূজা, সূর্য্য পূজার মতো আভাস মিলে।

অতএব তারও বিকল্প হিসেবে নামের শেষে আলী জুড়ে দেয়া ইসলামী নামের রেয়াজে পরিণত হলো। চন্দ্রের আরবী শব্দ 'হিলাল' কিঞ্চিত পরিবর্তন হয়ে হেলাল, সূর্যের বদলে শামছু বা শামছুল তদ্রুপ দয়াল বা দয়ালুর বদলে 'রহমান' নাম রাখার প্রচলন শুরম্ন হয়।

অবশ্য তা শুরম্ন হয় মুঘলদের যুগ থেকেই। রহমান, রহিম এসব হচ্ছে আলস্নাহর গুণের নাম, পারতপক্ষে আলস্নাহর নিজের নাম। ওই নামে আমরা কেবলমাত্র আলস্নাহকেই ডাকতে পারি, কোন মানব-সন্তানকে নয়। আল-কোরানে নিছা শব্দের অর্থ রমনী বা নারীগণ। তাই বাংলা মুলস্নুকে অধিকাংশেরও বেশি নারীগণ নামের শেষে নেছা বা নেসা শব্দ লাগিয়ে দিয়ে তারা পরিপক্ক নারীতে পরিণত হন।

এরপরও শব্দ আছে খানম, বেগম, খাতুন, বিবি এগুলো কোনো উপাধি নয়, ওগুলো স্ত্রী লিঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত আরবী, ফার্সী ও পশতু শব্দের আমদানি করা সম্পদ। এসব শব্দ ছাড়া বাংলা মুলস্নুকে নারীদের মুসলমান পরিচিতি থাকে না। পাকিস্তানি আমলে বাংলা রচনা ও গ্রামারগুলোতে আমরা বহু বিকল্প শব্দের সমাবেশ দেখতে পেয়েছি। এমনকি বহু কবি সাহিত্যিকদের ব্যবহৃত শব্দকেও বদলিয়ে উর্দু শব্দের ঢংয়ে আমাদেরকে মুসলমান বানানোর চেষ্টা হয়েছে।

কথাগুলো বেশীদিন আগের নয় (পাকিস্তানি আমলের পাঠ্য-তালিকার নির্ধারিত বই, এছাড়া পত্রিকা, গ্রামার, ইসলামী ম্যাগাজিন ইত্যাদি খুঁজলে পাওয়া যাবে।) তাই যুক্তি-প্রমাণের তর্কে যাচ্ছি না। এভাবে বাঙালি জাতিকে শুধু প্রকাশ্যে যে দমিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে তাই নয়, সুপরিকল্পিত ভাবে কৌশলেও দাবিয়ে রাখার চেষ্টা কম হয় নি।

অষ্টম থেকে দশম শতাব্দির মধ্যে বাংলা চর্যাপদের কবি কাহ্নুপাদ কে হারাতে হয়েছিল তাঁর দুটি হাত। কবি কাহ্নুপাদ অত্যাচারী ব্রাহ্মণ রাজার প্রশংসা কীর্তন কেন লিখবেন না এবং রাজদরবারে কেন তিনি বাঙলা চর্যাপদের কবিতা চর্চা করবেন ? এটাই ছিল তার অপরাধ। যুগে যুগে ব্রাহ্মণদের দাপটে নিরীহ বাঙালিরা বাঙালিত্বের দায়ে যে নির্মম অত্যাচার ভোগ করেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজীর খুব কম আছে।

কথা হচ্ছে বাঙালির ইতিহাস আমরা ক'জনেই বা জানি ? ক'জনেই বা পড়ি ? আমরা আমাদের ইতিহাস না পড়ে পড়েছি রোম, গ্রীক, ইংলিশদের ইতিহাস। পড়েছি গুপ্ত, মৌর্য,

ঘোরী বংশ, মামলুক সুলতানগণ, মুঘল সম্রাট ও নবাবদের ইতিহাস। এর ফাঁকে আমরা খুঁজে পাইনি এবং দেখিনি বাঙালি জাতির করুন্ন দুর্দশা ও নিষ্পেষিত হওয়ার ইতিহাস।

যারা ছিল এদেশের কৃষক, তাতী, জেলে, ছুতার, মুটে কামার কুমার ও সাধারণ মানুষ। তারাই ছিল এদেশের খাদ্য-শস্য এবং পণ্য উৎপাদনের যোগানদার, অর্থনীতির বুনিয়াদ। অথচ তারা চিরকাল হয়েছে শোষিত। জাতপ্রথা, ধর্ম আর বহুজাতিক কুসংস্কারের জিঞ্জির পরিয়ে চিরকাল শোষণ করেছে জাত-বিশ্বাসী শক্তিমান গোষ্ঠীগুলো। পুরুষ-জাতিকে প্রত্যক্ষ ও পরক্ষ ভাবে বানিয়ে রাখা হয়েছে দাস ও গোলামে। আর নারী-জাতি ব্যবহৃত হয়েছে লাঞ্চনা বিড়ম্বনা আর ভোগের বস্তু হিসাবে।

যারাই বিদ্রোহ করেছে তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে করা হয়েছে উচ্ছেদ, না হয় করা হয়েছে হত্যা। এসমস্ত করুণ ইতিহাস হুবহু জানা হলে বাঙালীর বুকে যে প্রতিশোধের আগুন জ্বলবে তাতে সন্দেহ নেই।

যে অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে কবি কাহ্নপাদ কামনা করেছিলেন একটি স্বাধীন বাঙালি ভূখ-। সেই মুক্ত ভুখন্ড আজো গড়ে উঠে নি। সে যুগের বাঙালিরা স্বাধীন ভূখ- তৈরি করতে পারে নি বলে বিকল্প মুক্তি হিসাবে অনেকে ধর্মান্তরিত হয়েছে। ব্রাহ্মণবাদের শোষণের হাতিয়ার 'জাতপ্রথা' থেকে সাময়িক মুক্তি পেলেও মন থেকে ঘৃণা পাওয়ার অভিশাপে এ জাতি আজো নিমজ্জিত। এখনও দেশের প্রচুর এলাকায় মুসলমানদের মধ্যে বহু কুলীন ও জাতপ্রথার বিদ্বেষ মিটে যায় নি।

হিন্দু সম্প্রদায়ের বেলায় তো এর তাজা শিকড় আজো রয়েছে সমাজের নানা স্তরে। তাই আজও বাঙালিরা ছিন্ন বিছিন্ন। মানবতাবাদী ও সমাজবাদী শিক্ষার বাইরে ধর্মান্ধতা ও বর্ণ বিদ্বেষের মধ্যে তারা হাবুডুবু খাচ্ছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হিন্দু, কেউ কেউ মুসলমান।

বাইরে তাদের পরিচয় যাই থাক ভিতরে ভিতরে তাঁরা বহুজাতি, বহুগোষ্ঠী, বহু বংশ ইত্যাদি বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। হিন্দুদের শুদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ ইত্যাদি জাত প্রথার কথা বাদ দিয়ে মুসলমানদের কথাই বলি। ভারতের মাটিতে যত প্রকার রাজা, বাদশাহ, কাজী, সম্রাট ও তাদের আজ্ঞাবহ তাবেদার গোষ্ঠী এবং পীর, ফকির, দরবেশ, আউলিয়া, ও জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব ও আগমন ঘটেছিল ওই সব শ্রেণী ও জাতগুলোর সুত্র ধরে মুসলমানরা নিজেদের বংশ গৌরব নিয়ে আজও বেশ বড়াই করেন।

ইতিহাসের বিচারে এসমস্ত আত্ন-গৌরব তাদেরকে বা আমাদেরকে কিছুই দেয় নি। দিয়েছে জাতীয় চরিত্রে পরশ্রীকাতরতা আর হিংসা-বিদ্বেষ আচরণের দুর্নাম। কিন্তু যে আত্ন-

গৌরবে কোনো কলুষতা নেই, কোনো মেকি কারবার নেই, সেটা হলো বাঙালি জাতীয়তা। কিন্তু ঐ জাতীয়তাকে বাঙালি মুল্য দিতে সংকোচ বোধ করে।

ধর্ম হচ্ছে অদৃশ্যে বিশ্বাসের ব্যাপার। ওটা আমার কাছে বায়ুর মতো। বায়ু অদৃশ্য কিন্তু বায়ুছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। কিন্তু পানি আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় ওটা ছাড়া জীবন চলে না। আমার কাছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ পানির মতই অপরিহার্য্য। জাগতিক প্রয়োজনে এ পানিকে, এ বাঙালিত্বকে ছাড়া আমি বাঁচার পথ দেখি না। বাঙালিরা নিজেদের মুক্তির জন্য বহুপথ বেছে নিয়ে দেখেছে কিন্তু কাজ হয় নি। বাঙালি হতে চেয়েছে ইংলিশ হয়েছে বাবু, হতে চেয়েছে আরবী হয়েছে মোলস্না, হতে চেয়েছে কমিউনিষ্টের কমরেড, হয়েছে সর্বহারা।

কাজেই বাঙালি নিজের জাতীয়তাবাদে লাথি দিয়ে কিছুই হতে পারে নি। সে সাজতে চেয়েছে শেঠ, নবাব, খাঁ, জমিদার, ওসবের মাঝে সে যুগে যুগে খুঁজেছে অহংকারের সুখ শান্তি। কিন্তু পায় নি, পেয়েছে মানুষের নিরব ঘৃণা। ওই সব কিছুই তাকে অমরত্ব কিংবা চিরস্মরণীয়তা দান করে নি। সে ঘুরে ফিরে বাঙালি জাতীয়তাবাদের মালায় জড়িয়ে পড়েছে। বিশ্ব-মানব তাদেরকে বাঙালি হিসেবেই গণ্য করেছে।

যে সমস্ত বাঙালিরা তাদের নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করে বিদেশে বসবাসের সুযোগ লাভ করেছে, তারা কালক্রমে নিজেদের আত্ন-পরিচয়কে বিলীন করে দেবে সন্দেহ নেই, এক প্রজন্মে তা না হলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রজন্মে তার কোন অস্তিত্বই থাকবে না।

সেজন্য বিদেশের মাটিতে অনেকে নিজের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। আফ্রিকার উগান্ডা থেকে ভারতীয় বিতাড়ন এবং বিগত শতাব্দিতে ইসরাইল রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে, নিজের মাতৃভূমি ছাড়া বিদেশে কখনও নিজ সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে পুরোপুরি আত্ন-প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সকল বিদেশী বাঙালিরা অত্যন্ত উদার মনে সকল প্রকার সাহায্য সমর্থন যুগিয়েছেন।

আজকের আসামে বাঙালি খেদাও আন্দোলন, পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা লুপ্ত করো মনোভাব, পাকিস্তান থেকে ধর্মীয় উসকানীর রাজনীতি করে আর অস্ত্র চালান দিয়ে বাঙালিকে সন্ত্রাসীতে পরিণত করে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঐক্যে যে ফাঁটল সৃষ্টি করে রাখা হচ্ছে এর চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা আর কী হতে পারে ? আজকের বাংলাদেশকে যারা লুটে পুটে খাচ্ছে, বৈদেশিক মুদ্রা পাচার করছে এবং বিদেশের মাটিতে সম্পত্তি খরিদ করে

সুখ অনুভব করছে, তারা জানে না এ সুখে শুধুই হবে জ্বালা। বাঙালিত্বহীন সুখে সে পারে শুধুই মর্মজ্বালা আর বিরহের দগ্ধতা।

শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে স্ফুলিঙ্গ কার্যকরী হয়েছিল তা কেমন ষড়যন্ত্রের মধ্যে উচ্ছেদ করা হলো সে বিষয়ে বিস্তর আলোচনা এখানে টেনে আনছি না। বাংলাদেশ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঘটনাগুলো বলতে গেলে চোখের সামনেই হয়েছে সংগঠিত। অতএব বিশেস্লষণের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু ঐক্যের এবং তা বুঝতে হবে বিবেক দিয়ে আর দেখতে হবে হৃদয়ের চক্ষু দিয়ে। তাই নিবন্ধটির নাম দিয়েছি হৃদয় দিয়ে দেখো।

৭ ♦ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং আমাদের রাজনীতি ♦

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিশ্বের যে কোনো সমাজে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সব সময়ই কোনো না কোনো ভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় সামাজিক এবং ধর্মীয় আইন বহাল তবিয়তে থাকা অবস্থায়ই তা হচ্ছে। এবং তা করছে সবলরা। বিশেষ করে অনুন্নত এবং শিক্ষা দীক্ষায় পিছিয়ে থাকা রাষ্ট্রগুলোতে এই অবস্থা চরম।

টিমুর, কুর্দিস্থান, বসনিয়া, চেচনিয়া, জায়ের, রুয়ান্ডা, উগান্ডা, কাশ্মীর, তিব্বত, চীন, আসাম, গুজরাট, পাকিস্থান প্রভৃতি স্থানে সংখ্যালঘু নির্যাতন অবস্থা চরমে উঠেছিল বলে আমরা বিভিন্ন গণহত্যা সহ নানা সামাজিক নির্যাতনের করুণ চিত্র জানতে ও দেখতে পেরেছি। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে এবং সমাজে নদীর চলমান স্রোতের মত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নানা ভাবে উৎপীড়ন লুট এবং হত্যা করা হচ্ছে, তার চুলচেরা হিসাব কেউ না রাখলেও প্রমাণ বিদ্যমান আছে। ভারত উপমহাদেশে এসবের ইতিহাস নতুন কিছু নয়।

বাংলাদেশেও সংখ্যালঘুদের (হিন্দু বৌদ্ধ চাকমা খাসিয়া গারো সাঁওতাল মনিপুরী টিপরা মারমা ইত্যাদি অনেক জাতি) উপর যে করুণ নির্যাতন হচ্ছে তার ভুরি ভুরি প্রমাণ সর্বত্রই বিরাজমান। রাষ্ট্রীয় নেতাদের ছত্রছায়াই হোক আর অস্ত্রের জোরে হোক কিংবা ধর্মীয় হিংসার কারণেই হোক তা কিন্তু হচ্ছে। মাঝে মাঝে এটা চরম আকার ধারণ করে জনমনে নানা আতঙ্ক ও প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। সুস্থ এবং বিবেকবান নাগরিকগণ মানুষ ও মানবতার প্রশ্নে নিজেরাই পীড়িত হচ্ছেন এবং সহানুভূতির দৃষ্টিতে তা নিয়ে লেখালেখি, সমালোচনা ও বিচার চাচ্ছেন।

যে কোন সমাজে বিশেষ করে অর্থনৈতিক অবস্থা যখন মারাত্মক বিপর্যয়ের সন্মুখীন হয় এবং আইন প্রয়োগ ও বিচার ব্যবস্থা শিথিল হয়ে যায়, তখনই নানা সামাজিক সমস্যার মধ্যে সম্প্রদায়িক সমস্যাটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। একে উস্কানী দিয়ে জিয়ে রাখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, না হয় বিভিন্ন স্বার্থান্বেসী মহল। পাকিস্তানি আমলে "শত্রম্ন সম্পত্তি" নামের কালো আইনটির কারণে গুপ্তহত্যার মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের বিতাড়ন করা হত। বিভিন্ন সময়ে নিজের ইচ্ছামত দলিল পত্র লিখিয়ে সেই দলিলে আদায় করা হত স্বাক্ষর না হয় টিপসহি। তারপর এটা খরিদ করা হয়েছে বলে সমাজে প্রচার করা হত। বিভিন্ন সময়ে মিথ্যা মামলা জুড়ে দিয়ে হয়রানি করা হত সংখ্যালঘুদের অর্থাৎ হিন্দু ও উপজাতিদের। এভাবে তাদের জমি-জমা সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে সংখ্যাগুরম্ন সম্প্রদায়ের সবল ও অত্যাচারী গোষ্ঠী ।

যারা একটু বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত হিন্দু, তারা তাদের সাত পুরম্নষের ভিটামাটি ত্যাগ করে বুকে হাহাকার নিয়ে যাবার পূর্বে একই জমিকে রাতের আধারে বিভিন্ন গোষ্ঠীপতিদের কাছে গোপনে কয়েক দফায় বিক্রি করে যেত। যেহেতু তাদের আর ফেরার পথ নেই এবং অত্যাচার ও সঠিক বিচারের পথ নেই, সেজন্য দেশ ত্যাগের পূর্বে যতটুকু অর্থ আদায় করা যায় তারা তত টুকুই করেছে।

কিছু কিছু খাঁটি ঈমানদার মুসলমানগণ বিভিন্ন যায়গায় ন্যায্য মূল্য পরিশোধ করে জমি জমা খরিদ করেছেন এবং তার ও ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। গরিব হিন্দু এবং উপজাতিদের অবস্থা ছিল সবচেয়ে করম্নণ। কারণ তারা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করলেও তাদের জাত নেই, তারা বিতাড়িত এই অপবাদে তারা সেখানে হয় জর্জরিত। এভাবে তারা একূল ওকূল দু'কূল হারিয়ে জগতে এক বিড়ম্বনার জীবন যাপন শুরম্ন করে। যে জীবনের কোন মুল্য নেই, ইজ্জত নেই। মানুষ হিসাবে যারা যে স্থানে জন্মগ্রহণ করে ও যে সমাজে বেড়ে উঠে সেই সমাজ ও মাটির প্রতি মানুষের একটা প্রাকৃতিক স্নেহের বন্ধন গড়ে উঠে । এ বন্ধন এতই প্রবল যে, এটাকে ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না, শুধুই স্বপ্নের অংকুর উদগম হয় এই জন্মস্থানে। তার ভবিষ্যত বংশধর, ভবিষ্যত পরিকল্পনা সবকিছুই বেঁচে থাকে এবং বেড়ে উঠে এই স্বদেশকে নিয়ে, সমাজকে নিয়ে।

কত হিন্দু কবি সাহিত্যিকগণ প্রাণভরে মাতৃ-ভাষায় লিখে গিয়েছেন বই পুস্তক গান কবিতা নিজেদের জন্য, সমাজের জন্য, জাতির জন্য। কত সমাজ হিতৈষীগণ ভবিষ্যত বংশধর তথা ভবিষ্যত প্রজন্মদের জন্য পাঠশালা, হাই স্কুল, বিভিন্ন ধরনের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন জাতিকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার জন্য। এসব প্রতিষ্ঠান না থাকলে শুধু ইসলামী শিক্ষায় আমরা বড়জোর হতে পারতাম কট্টরপন্থী মোলস্না। মসজিদ

মাদ্রাসায় ইমামতি ও শিক্ষকতা করে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষিত করার পাশাপাশি মনের আধারে সাম্প্রদায়িক বীজটিও লালিত হতো অজান্তে ও অলক্ষ্যে।

আজকে হাজার হাজার হাইস্কুলের উলেস্নখ না করে বাংলাদেশের পুর্ব প্রান্ত সিলেট জেলার মদন মোহন কলেজ, মুরারী চাঁদ (সংক্ষেপে এম, সি কলেজ) থেকে শুরম্ন করে কেন্দ্র অর্থাৎ ঢাকার জগন্নাথ কলেজ, তুলারাম কলেজ এবং পশ্চিম প্রান্তে যশোহরের সেই সাগরদাড়ির মাইকেল কলেজ পর্যন্ত যে দিকেই দৃষ্টি দেয়া যাক না কেন দেখা যাবে বাংলাদেশের শতকরা ৯০ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জমিদার, ধনবান ও সমাজপতিদেরই অবদান।

তাদের এ অবদান না থকলে আমরা এই বিজ্ঞানের যুগেও বসবাস করতে হতো আফ্রিকার আদিবাসী আদিম সমাজের মতো। নদী নালা ও খাল বিল থেকে মৎস্য শিকার আর লাঙল ঠেলে মান্দাতার যুগের চাষবাস ছাড়া আর কি শিখতাম ? তাজ্জবের বিষয় এই, যেসকল হিন্দু মহৎপ্রাণ ব্যক্তিগণ সাম্প্রদায়িকতার কোনো চিন্তা না করে ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, ওইসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার আলো পেয়ে আজ আমরা ছাত্র রাজনীতির জোরে, এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসাবে ওইসব স্বজাতি হিন্দু কিংবা আদিবাসি ভাইবোনদের নির্যাতন করছি, ধর্ষন করছি হত্যা করছি, উচ্ছেদ করছি এদেশ এবং এসমাজ থেকে, এর চেয়ে নিমকহারামী পৃথিবীতে বোধ হয় আর কিছুই নেই।

এই একবিংশ শতাব্দির দোরগোড়ায় বসে এই ক্যানাডার মাটিতে এক হিন্দু জ্ঞানী ভদ্রলোক মহাদেব চক্রবর্তী আমাদের প্রজন্মের জন্য কী না করে যাচ্ছেন। আমাদের সংস্কৃতির মুল শেকড় মাতৃভাষা বাংলাকে মুল্যায়ণ করে জীবনের সমস্ত সঞ্চয় উদার হস্তে বিলিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হন নি। অশীতিপর বৃদ্ধ হয়ে ও প্রাণচঞ্চল যুককের মতো দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন সভায়, সমাজে, কমিউনিটিতে। তিনি টরন্টো বিশ্ব বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষাকে চালু করেছেন অজস্র শ্রম দিয়ে। আমাদের কি উচিৎ নয় আরও উদার হস্তে দান করা ?

গত ২৭ নভেম্বর ২০০৪ সংখ্যার সাপ্তাহিক "বাংলা কাগজে" প্রকাশিত (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন লেখকের) 'সংখ্যাগুরম্ন ও সংখ্যালঘু' কলামের বিভিন্ন পর্যায়গুলোর বক্তব্য ও ব্যাখ্যার সাথে আমি মোটেও একমত হতে পারি নি। উনার ক্যামেরায় অবতল লেন্সটি কেমন যেন 'ডেপ্থ অফ ফিল্ডের' ছোয়া পায়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সংখ্যাগুরম্ন সম্প্রদায়ের পাশাপাশি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরা উচ্ছেদ, হত্যা, এবং নির্যাতীত হয়েছিল সবচেয়ে বেশি।

আওয়ামী রাজনীতির গোড়ার দিকে সংখ্যালঘু নির্যাতনের তেমন কোনো চিত্র দেখা যায় নি। ছিটে ফোটা হিসাবে অস্ত্রধারী কিছু মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা কিছু ঘটনার সুত্রপাত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের দক্ষিন-পশ্চিম জেলাগুলোতে সর্বহারা নামের কমিউনিষ্ট সমর্থনপুষ্ট সংগঠনের কিছু কিছু সংখ্যালঘু কর্মীরা রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে নির্যাতিত হয়েছিল বলে খবর পাওয়া গিয়েছিল।

১৯৭৫ সালে আওয়ামী রাজনীতির অবসান ঘটলে ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এবং বিএনপি আমলে পার্বত্য চট্রগ্রামে আদিবাসি উচ্ছেদ অভিযানটি নিরবে নিভৃতে চলতে থাকে । শেষ অবধি যখন আদিবাসি বা উপজাতিদের দেয়ালে পিঠ ঠেকলো এবং তারা ঘুরে দাড়ালো তখন সবার টনক নড়ে। সমস্ত্ম ঘটনাবলী থলের বেড়ালের মতো বেরিয়ে পড়ে। এর পর শুধু হিন্দু সম্প্রদায় নয়, চাকমা, খাসিয়া, সাওতাল, গারো, এবং আরও অন্যান্য আদিবাসিরা সংখ্যাগুরম্নদের মধ্য থেকে দুর্বৃত্তদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছে, উচ্ছেদ হয়েছে। তবে এখনকার মতো প্রকাশ্য দিবালোকে নয় এবং এতটা প্রকট ও ছিল না। এসব খবরের সত্যতা লোক মুখে শোনা যাবে যদি ওই সমস্ত্ম এলাকা ঘুরে আসা যায় অর্থাৎ ভ্রমন করা যায়।

এরশাদ সরকারের আমলে নির্যাতনের চিত্র আরও চরমে উঠে যা বাংলাদেশী মাত্রই জানেন। কথা হচ্ছে এসব নির্যাতন শুধু একা সরকারি কোনো উস্কানীতে হয়নি। হয়েছে দেশের আনাচে কানাচে গজে উঠা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ক্যাডার ও কর্মীদের দ্বারা। বিভিন্ন ছাত্র নেতা এবং ছিঁচকে ও পাতি নেতাদের দ্বারা। আবার কখনও কখনও আঞ্চলিক গু-াপা-া ও মাতব্বরদের দ্বারা। তারা রাজনীতি করে, মাতব্বরী করে বিনিময়ে কিছুই পায় না। তাই সন্ত্রাস, লুটপাট, ধর্ষণ, জমিদখল, বাড়ী দখল ঐসব হলো তাদের মুনাফা।

সরকার দুর্বল, পুলিশ প্রশাসন ঘুষের আখড়া, মানুষের মনে নেই নৈতিক চরিত্র তাই এসব নির্যাতনের জন্য প্রশাসন সহ সমাজের সকল পেশী বহুল সম্প্রদায় দায়ী। প্রতিদিনই কমবেশী খবরের কগজে সচিত্র প্রতিবেদন সহ নানা লোমহর্ষক খবর ছাপা হচ্ছে। **বর্তমানে শুধু সংখ্যালঘু নয় বরং মুসলামান তথা সংখ্যাগুরম্ন মানুষেরাও নির্যতিত হচ্ছে পাইকারী হারে।** সুতরাং এই নৈতিক অধঃপতনকে ঠেকানেরা জন্য কোনো ধর্মীয় নৈতিকতায় কাজ হচ্ছে না, এদের মধ্যে সঠিক ধর্মের চর্চা ও নেই।

দ্বিতীয় কথা এদের চরিত্রে কোন রাজনৈতিক আদর্শ নেই, মানবিক চরিত্রও নেই। এরা বর্ণচোরা প্রাণীর মত। নানা অজুহাতে রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে নিজেকে নিরাপদে টিকিয়ে রাখে। আমি বিশ্বাস করি এসবের সমাধান সম্ভব, বিশেষ করে নিম্ন লিখিত পাঁচটি বিষয়ের উপর গুরম্নত্ব আরোপ করে সেই অনুযায়ী বাস্ত্মব পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১) দেশে প্রশাসন বিকেন্দ্রী করণের মাধ্যমে মানুষের কর্মসংস্থান গড়ে তোলা।
২) মাদ্রাসা শিক্ষাকে আলাদা না রেখে তা আধুনিকায়নের মাধ্যমে স্কুল শিক্ষার মধ্যে অন্তর্ভুক্তি করা।
৩) জন্ম সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাস্তবমুখী পাঠ্য তালিকা ও বাধ্যতামুলক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থাকা।
৪) সমস্ত পুলিশ বাহিনীকে বিলুপ্ত করে আধুনিক পুলিশবাহিনী গঠন করা এবং তাদেরকে ন্যায্য বেতন দেয়ার জন্য এলাকা ভিত্তিক কর বা ট্যাক্স প্রথা চালু করা।
৫) হয় অস্ত্রধারীদের ফাঁসির ব্যবস্থা কার্যকরী করা, নয়তো ঘরে ঘরে অস্ত্র রাখার অনুমতি দেয়া।

৮ ♦ বাঙালির অতীত প্রেম ও দুরের মানুষ ♦

একটি কুসংস্কারাবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ যখন বেড়ে উঠে, আগামী জীবনের রূপরেখা ও বিকাশ ব্যাবস্থা তার কাছে তখন অপরিচিত এবং দুর্জ্ঞেয় বলে মনে হয়। সে নিজে বুঝতে পারে না তার জীবনের মুল্য কোথায় এবং তার গতি ও পরিণতি কি ? সমাজ যদি বাস্তবমুখী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকে এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়া কর্মের কোনো সুগম ব্যবস্থা ও না থাকে, তাহলে সমাজ এক রন্ধ্রন্ধ জটিলতার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে।

সমাজের মানুষগুলো হয়ে উঠে অতিমাত্রায় ভাগ্য-নির্ভরশীল। ওরা ঘুরে ফিরে নিজের অদৃষ্টকে কেন্দ্র করে জীবনবিমুখ হয়ে পড়ে। এভাবে একটি সমাজ মরচা পড়া (জংধরা) লোহার মতো অকেজো হয়ে যায়। ধর্মের প্রতি তাদের আগ্রহ বেড়ে যায় এবং অতীতকে বেশী ভালবাসতে শুরু করে।

শিক্ষার অভাবে মানব সমাজের উন্নয়নের বিকাশ ধারাকে জানতে না পেরে ভাগ্যের উপর নিজের সব সত্ত্বাকে বিসর্জন দিয়ে, নিজের শ্রম বুদ্ধি ও চিন্তা চেতনাকে নিজের অজান্তে অকেজো করে দেয়। আগামী দিনের কোনো সুখ শান্তির রূপরেখা তাদের হৃদয়ে ঢেউ খেলে না। তারা মনে করে জীবন এভাবেই চলবে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে কর্মহীনতায়। অথচ বিনা শ্রমে তারা সুখ-সমৃদ্ধির আশা করে।

ভবিষ্যতের চেয়ে অতীত তাদের কাছে সুখকর এবং মনের দিক থেকে উপাদেয়। মনের কল্পনায় অতীতে ফিরে যাওয়ার একটা সুপ্তবৃত্তি তাদের ভেতরে অতি মন্থরভাবে কাজ করে। অতীতের গালগল্প তাদের কাছে বেশি আনন্দের উদ্রেক করে এবং অতীত থেকে বহু

উদাহরণ টেনে এনে এমন রসগল্প করবে যার কোনো তুলনা নেই, উপমা নেই। এসমস্ত গালগল্প শ্রুতিমধুর হলেও গল্পকথক নিজে বুঝতে চান না পৃথিবীতে লোক বাড়ছে, খাদ্য কমছে কিংবা বর্তমান অর্থনীতির মারপ্যাচটা কি ? এসব সমস্যার মধ্যে মানুষের জীবন প্রতিষ্ঠার যে ভিত্তি থাকতে পারে তা তাদেরকে উৎসাহিত করে না। এটা তাদের চিন্তা চেতনায় অত্যাধিক জটিল বলে মনে হয়।

একারণে কুসংস্কারাবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ প্রগতিশীল না হয়ে পরমুখাপেক্ষী এক হীনমন্যতায় ভোগে। যা সে নিজেও উপলব্ধি করতে পারে না, তার উৎপাদনজাত সৃষ্টি-ক্ষমতা (আত্মপ্রতিষ্ঠা) যখন ব্যাহত হয় সে তখন অতীতের দিকে ধাবিত হয়। অতীতে তার বাপ-দাদা কি করেছিলেন; না করেছিলেন ঐ গাল-গল্পের আত্মগৌরব তার কাছে বেশী প্রিয় হয়ে উঠে। আজকের বাংলাদেশের চেয়ে পাকিস্তান ভালো। পাকিস্থানের চেয়ে বৃটিশ, বৃটিশের চেয়ে মুঘল যুগ, মুঘল যুগের চেয়ে বিভিন্ন রাজবংশীয় যুগ বা বুদ্ধ যুগ তাদের কাছে বেশী প্রিয়।

একই কারণে সংগ্রামী শেখ মুজিবের চেয়ে অতীতের কায়েদে আজমকে জাতির পিতা বলতে তারা বেশি আনন্দবোধ করে। যে জাতি শ্রমের উৎপাদনজাত সৃষ্টিতে কিংবা সুন্দর ও স্বচ্ছল জীবন ব্যবস্থায় তার বাপ-দাদার প্রাচুর্যকে ছাড়িয়ে যায়। তারা যখন তখন বাপ দাদার গালগল্প করবে না। কারণ নিজের কর্ম দক্ষতা ও কৃতিত্ব বাপ-দাদার চেয়ে বেশি গৌরবউজ্জ্বল হলে অতীত তাদের কাছে ম্লান হয়ে যায়। তারা তখন পাকিস্তানের চেয়ে বৃটিশ, বৃটিশের চেয়ে মুঘল ভাল একথাটিতে আনন্দবোধ করবে না।

পৃথিবীর সমৃদ্ধশালী জাতি ও শিক্ষিত জাতি অতীতের গালগল্পতে আত্মতৃপ্তি বোধ করে না, কারণ বর্তমানের ঐতিহ্য ও জাতীয় উন্নতি তাদের অতীতের চেয়ে উত্তম আর সেজন্য তারা আজো জীবনের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হয়ে আছে।

সংগ্রাম এবং উৎপাদনজাত সৃষ্টির যে আনন্দ তা তুলনাহীন। অধিকাংশ বাঙালি এই গুণাগুণ থেকে বঞ্চিত। বাঙালিরা অতীত এবং ধর্ম নিয়ে মাতাল। নতুন তাদের কাছে অজ্ঞাত এক ভয়ঙ্কর দানব। শেখ মুজিব ছিলেন বাঙালি জাতির কাছে এক নতুন সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব, এরকম ব্যক্তিত্বে এজাতি অভ্যস্থ নয়। তারা অভ্যস্থ অতীতে এবং পুরানত্বে। এজন্য শেখ মুজিব প্রচুর বাঙালির দৃষ্টিতে মেজাজী লোক। তাঁর বিভিন্ন দোষ ত্রুটিকে তারা বেশি করে দেখতে চায়, বাস্তব পরিস্থিতির সত্যতাকে বিবেকে স্থান না দিয়েই।

লর্ড ক্লাইভের কথা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। যিনি বৃটিশ জাতির এক ভাগ্য-বিধাতা হিসাবে পরিগণিত হন। তার চরিত্র ও দুষ্টামীর কথা যদি হুবহু আপনারা পড়ে দেখেন

তাহলে শেখ মুজিবকে তার তুলনায় একজন ঋষি বলবেন। অথচ এই লর্ড ক্লাইভ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্ণধার হয়ে কত যুদ্ধ, কত কৌশল ও কত রক্তপাত ঘটিয়ে বৃটিশ জাতিকে নিয়ে গিয়েছিলেন শৌর্য বীর্যের সর্বোচ্চ শিখরে। পৃথিবীর সমস্ত জাতি কিংবা যে কোনো ব্যক্তিত্বের বিপরীতে অর্থাৎ নেতিবাচক দিক হাতড়ালে দেখা যাবে কাহারো চরিত্রে খাঁটি বিশুদ্ধতা কোথাও নেই। এই সত্যতা উপলব্ধি করার নাম বাস্তবতা।

অধিকাংশ বাঙালি এ বাস্তবতাকে আজো গ্রহণ করে নি। বাঙালিরা নিকটাত্মীয় পাত্রের কাছে নিজের কন্যাদান (কিংবা কন্যা গ্রহণ) মোটেই মঙ্গলজনক মনে করে না। কিন্তু দুরের কুপাত্রের কাছে কন্যাদান বা সম্পর্ক স্থাপন তার কাছে বেশী প্রিয়। এর কারণ নিজ আত্মীয়-স্বজনের দোষ-ত্রুটিগুলো তার কাছে সহজেই অনুমেয়। একারণে তারা নিজ আত্মীয়ের প্রতি এতটুকু অনুরাগী হয় না। কিন্তু দুরের মানুষের ত্রুটি তার কাছে থাকে অজানা এবং অদৃশ্য।

কিছু লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করে তারা আত্ম-তৃপ্তিতে আত্মীয়তা বা সম্পর্ক স্থাপন করে। অথচ কিছু কাল অতিবাহিত হওয়ার পর তারা হাড়ে হাড়ে টের পায় এ সম্বন্ধও সুবিধাজনক হয় নি। তখন সামাজিক ইজ্জতের খাতিরে হোক, আর লজ্জার খাতিরে হোক, বাস্তবতাকে মেনে নেয়া ছাড়া তার উপায় থাকে না। তখন নানাবিধ মনকষ্ট নিয়ে তারা ধৈর্য্যশীল হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে। এভাবে দুর্যোগ মুহূর্তগুলো কেটে যাওয়ার জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ নিতে চেষ্টা করে।
কিন্তু ওই সমস্ত ব্যাপার যদি নিজ আত্মীয় কিংবা জোর খাটানোর মতো স্থানে হয় তাহলে বাঙালি সেখানে লাঠি নিয়ে হাজির হতে কোনো দ্বিধাবোধ করে না। বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিব যদি কোনো ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সংগ্রামী নেতা হতেন, সন্দেহ নেই বাঙালি তাকে বেশি করে শ্রদ্ধা করতো, কারণ তিনি তখন হতেন দুরের মানুষ।

বাঙালিরা দুরের মানুষদের শত দোষ থাকলেও বিস্তর প্রচারণার হুজুগে শ্রদ্ধা ভক্তি করতে কোনো কার্পণ্য করে না। উদাহরণ স্বরূপ হযরত শাহজালালের কথাই বলি, তিনি আমাদের জন্য কী এমন সোনার হরিণ রেখেছেন যার বিনিময়ে আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিখরে কিংবা অর্থনৈতিক মুক্তির সাগরে ভাসছি? বরং সুফীবাদের অতি-ভক্তির কারণে সৃষ্টি হয়েছে মাজার ব্যবসা ও ধর্মের নামে মানুষকে প্রতারণা করার কতকগুলো কৌশল।

লর্ড ক্লাইভ তার জাতির জন্য যা করেছেন শাহজালাল তো তার সিকি ভাগ ও আমাদের জন্য কিছু করতে পারেন নি। অথচ আজো আমরা তার কবর খানায় গিয়ে চুমু খাই, তার কবরে মসজিদে দান খয়রাত করি। কিছু সংখ্যক লোক সেই দান খয়রাতের পয়সা লুটপাট করে পরিশ্রম ছাড়াই সুখের স্বর্গে বসবাস করে। এই বহিরাগত লোকটির নামে জেলার নাম পাল্টাতে ও বাঙালিরা দ্বিধাবোধ করে না।

ইদানিং তিনির নামে আন্তর্যাতিক বিমান বন্দর ও হয়ে গেছে। অপর দিকে চট্টগ্রামের 'বায়েজীদ বোস্তামী' কিংবা 'শাহ আমানত' তাদের নামেও প্রতিষ্ঠিত আছে অনেক কিছু। বাঙালিরা এভাবেই বিদেশীদের পদলেহনে অসীম আনন্দ পায়। এই বহিরাগত লোকগুলো এদেশে এসে তৃণমুল বাঙালি মহিলাদের বিয়ে করে স্থায়ী হয়েছিল।

সুতরাং ঐ বিবাহিতা মহিলাদের নাম যদি বাঙালিরা ব্যবহার করতো তাহলে বুঝতাম বাঙালির মাথায় জাতীয়তাবাদের জ্ঞানবুদ্ধি আছে এবং তারা নারী জাতিকেও সম্মান দিতে জানে। কিন্তু না বাঙালিরা তা কখনও করে নি। সিলেটে বহিরাগতদেরকে আঞ্চলিক ভাষায় বলা হয় 'বাউটা' 'উঠরা' ইত্যাদি। সুতরাং বাস্তবের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় বাঙালিদের কাজ কারবার সব বাউটা ও উঠরা'দের নিয়েই। তারাও যখন আবার জাতের বড়াই করে তখন কেমন লাগে বলুন তো ? ইয়েমেন কী এমন আহামরি দেশ আমরা এখন ভালই জানি। অতীতে ও তারা ছিল এক দরিদ্র জনগোষ্ঠী। ক্ষুধা নিবৃত্তির ধান্ধায় তারা দেশে দেশে ঘুরেছে ধর্মের সওদাকে পুঁজি করে।
তা না হলে ধর্ম প্রচার শেষে কেনো তারা নিজ নিজ দেশে ফিরে যায় নি ? এই ইয়েমেন থেকে আগত মুসলিম সাম্রাজ্যবাদের সওদাকারি শাহজালাল সিলেটে মুলি বাঁশের (চালিতে) ভেলায় সুরমা নদী পাড়ি দিয়েছিলেন, সে সময়ে নামাজের ওয়াক্ত ছিল, তাই ভেলার উপরে গামছা বিছিয়ে নামাজ আদায় করেছিলেন। এই সাধারণ কর্মটিকে সিলেটের বাঙালিরা রূপ দিল 'জায়নামাজ বিছাইয়া তিনি অলৌকিক শক্তিতে সুরমা নদী পাড়ি দিয়েছেন'। যতসব মিথ্যাবাদী মাজারের গাঁজাখুরি দল।

গল্প এখানে শেষ নয়, তারা আরও বলে আজানের ধ্বনি দিয়ে নাকি রাজা 'গৌড় গবিন্দের' প্রাসাদ তারা ধ্বংস করেছিলেন। এই হুজুগ ও গাল-গল্প যদি সত্যি হয় তাহলে পৃথিবীর ৫১টি মুসলিম দেশের মধ্যে কি একজনও খাঁটি ইমানদার নেই যিনি আজান দিয়ে অত্যাচারী ইসরাইল রাষ্ট্রের বড় বড় প্রাসাদগুলি ধবংস করতে পারেন ? আজান তো আজো বদলায়নি বিকৃতও হয় নি। সিলেটের কবুতর পাখি, এবং গজার মাছ এগুলো শাহজালাল সাহেব ইয়েমেন কিংবা মধ্যপ্রাচ্য থেকে নিয়ে আসেন নি। এগুলো এখানেই ছিল, ওগুলোকে খানা পিনা দেয়ার বদলে এগুলো এখানেই লালিত পালিত হয়েছে। অথচ এসব নিয়ে বাঙালিদের বানানো গল্পের কোনো শেষ নেই।

বাঙালি মুসলমানেরা এভাবেই হুজুগ ও কুসংস্কারে বিশ্বাসী হয়ে জীবন কাটাতে চায়। গণমুখী (তথা বিজ্ঞান ও উৎপাদন ভিত্তিক) শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত বাঙালি-সমাজে, প্রথমে পাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশ নামে যে দুটি স্বাধীনতার ডিম প্রসব হয়েছিল, তা যেন ভিতরেই পঁচে গেছে। এ ডিম দু'টি থেকে আজো স্বাস্থ্যবান সন্তান গড়ে উঠেনি। বর্তমানে এ সমাজের জন্য প্রয়োজন নতুন সমাজ ব্যবস্থার একটি সংগ্রামী কাঠামো, একটি পূর্ব

পরিকল্পিত ডিজাইন বা চিত্র এবং বাস্তবে রূপদান করার মত একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল। তৎসঙ্গে স্বাধীন ও সার্বভৌম বিচার ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা অত্যন্ত অপরিহার্য। গণমুখী শিক্ষার সাথে সাথে প্রত্যেকটি ইউনিয়নে এবং পৌরসভায় পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপনের বিশাল সুযোগ থাকা অত্যন্ত জরুরি।

জরুরি জন্ম নিয়ন্ত্রণ তথা খাদ্য ও জনসংখ্যার তত্ত্বটি সম্পর্কে মানুষকে অবিরত জ্ঞান দান করা। বিদ্যুৎ ও পরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে আমূল পরিবর্তন এনে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তুলতে পারলে এই দেশটি অতি দ্রুত উন্নয়নের দিগে এগিয়ে যাবে, এটাই আমি দৃঢ় চিত্তে বিশ্বাস করি।

৯ ♦ সত্যের নুপুর ধ্বনি ♦

(জাতীয়তাবাদ ও সঙ্কটের উত্থান)

ভারত উপমহাদেশে বাঙালি জাতির মধ্যে যারা মুসলমান বলে দাবী করেন তাঁরা নিজেদেরকে বেশী করেই মুসলিম ভাবেন। আবার নিজেদের বাঙালিত্বকে কে তাঁরা অস্বীকার করেন না ঠিকই কিন্তু বাঙালিত্বকে প্রাধান্য দেন কম। কারণ দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যে লালিত ইসলামী চিন্তাধারা তাঁদের মজ্জাগত। তাই হঠাৎ করে ঝেড়ে মুছে পুরো বাঙালি সাজতে তাদের ভয় লাগে। ভয় লাগে এজন্য যে, যে ব্রাহ্মণবাদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে অতীতে তাদের পুর্ব-পুরুষরা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন- সেই ব্রাহ্মণবাদ যদি আবার বাঙালিবাদ রূপে আত্মপ্রকাশ করে তাহলে তো আর মুক্তি নেই।

বাঙালি স্বভাব হচ্ছে ভীরু হরিণ হৃদয়। এ হৃদয় দিয়ে তাঁরা এটাও চিন্তা করে এতে করে যদি ইসলামী iমানের কোন ক্ষতি হয়! যদি পাপ হয়! যদি উপাসনা, প্রার্থণা ব্যর্থ হয় তাহলে কি হবে ? কারণ বাঙালি মুসলমানরা আজও কোরানের অর্থ বুঝে না- হাদীছের গুঢ় রহস্য ও মতাদর্শ জানে না। স্বল্পজ্ঞানী মোলস্না মৌলভীদের বহুরূপী ব্যাখ্যা, বিবেকহীন ফতোয়া, নরকের শাস্তি ইত্যাদিকে কঠোর ভাবে বর্ণনা করে মানুষকে দ্বিধা ও দ্বন্ধের মধ্যে ফেলে রেখেছে।

আস্তে আস্তে যুগের পরিবর্তনের সাথে তাঁদেরও মনের পরিবর্তন হচ্ছে। তাঁরা বুঝতে পারে খুঁদ আরব দেশের লোকগুলোও নিজেদেরকে আরবি, ইরানি, ইরাকি ইত্যাদি জাতি হিসেবে পরিচয় দেয়, মুসলমান হিসাবে নয়। কারণ ধর্মের মতানুসারী লোক পৃথিবীর যে কোনো ভূখ- থাকতে পারে। এজন্য ওই ভূখ-র নাম মুসলমান কিংবা ইসলাম বলে অভিহিত হয় না। তাইতো অন্যান্য জাতির মতো নিজেকে বাঙালি বলার সাহস তাঁরা সঞ্চয়

করেছে। মুখের ভাষা, গায়ের রঙ্গ, স্বভাব, ভূখ- ও জলবায়ুর পরিবেশ, আহার বিহার পরিচ্ছেদ ইত্যাদি সে কিছুই বিসর্জন দিতে পারে না।

তাই সে যুগে যুগে বাঙালি। ঘুরে ফিরে বাঙালি, ভবিষ্যতেও বাঙালি। কিন্তু যুগে যুগে যখনই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঐক্য ও মিলনের ডাক এসেছে, তখনই এটাকে নস্যাৎ করা হয়েছে নানা শঠতা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। আমরা জানি বাঙালি বহু জাতির শাসনের যাতাকলে নিস্পেষিত হওয়ায় বাঙালি জাতির রক্তে ও মানসিকতায় এসেছে ভিন্নতা। কাল ও শতাব্দির নানা বির্বতনের সাথে বাঙালি মানসিকতায় জন্ম নিয়েছে বহুমুখি চারাগাছ। এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বাঙালি জাতীয়তা ল-ভ- হলেও তার মৌলিক মানসিকতা হারিয়ে যায় নি কিংবা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি।

তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদে যে মরিচা ও আগাছা বাঙালিকে চেপে রেখেছে সেটাকে বুঝে নিলেই তাঁর ব্যর্থতা সম্বন্ধে কিছু কথা বলা যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই জাতীয়তাবাদের বহু বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গাকে বাহবা দেয়া যায়। ব্রিটিশ সাম্রজ্যবাদের অপকৌশল, সুদুর প্রসারী চিন্ত্মাধারা, ভারত ভুখে- অন্যান্য জাতির বিদ্বেষ বাঙালি জাতিকে মাথা তুলে দাড়াবার সুযোগ দেয় নি। বৃটিশরা ভারত ত্যাগ করার পুর্বেই স্বদেশী হিংসুকদের প্ররোচনায় বাঙালি জাতিকে গেলানো হয়েছিল ধর্মের ট্যাবলেট। যে ট্যাবলেট এর নেশায় আজও বাঙালি আপন ঘরে ঘুরছে বেসামাল হয়ে।

বাংলাদেশের মুসলমানরা ঘৃণা শোষণ আর নিপীড়নে যখন দগ্ধ হচ্ছিল, ঠিক ওই সময় শ্রদ্ধেয় শেখ মুজিব এসবের বিরন্নদ্ধে আন্দোলনে নামলেন। মিথ্যা আগরতলা মামলা ষড়যন্ত্রের কারণে এদেশের মানুষ জনাব শেখ মুজিবকে আরও বেশি করে জানলো। বাঙালি জাতীয়তাবাদের দানা শক্ত হতে লাগলো। পাকিস্ত্মান ভেঙ্গে দু'টুকরা হয়ে যাক; এমন ধারনা বাঙালির হৃদয়ে তখনও স্থান নেয় নি।

কিন্তু পরিশেষে পরিস্থিতি এমন হলো যে- পুর্ব পাকিস্ত্মানের মানুষেরা নিজেদেরকে বাঙালি বলতে বাধ্য হল। এ ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী ও পুর্ব পাকিস্ত্মানে তাদের অনুগত (আমলা) অনুচর গোষ্ঠী এই ভাঙ্গান পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ষোল আনাই ছিল দায়ী।

সে সময় শ্রদ্ধেয় শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগে যারাই রাজনীতি করেছিলেন তাঁরা সকলে বাঙালি হলেও ভেতরে ভেতরে অনেকেই ছিলেন পাকিস্ত্মান বিশ্বাসী । জনগণ তাঁদেরকে সমর্থন দিয়েছে আওয়ামী লীগের রাজনীতিবিদ হিসাবে, বাঙালি হিসাবে। এখন পরিস্থিতির মোড় যেদিকে ধাবিত হতে লাগলো তাঁরাও সেদিগে ছুটতে বাধ্য। পাকিস্ত্মানি

ভাবটা তাদের ভিতরে চাপা খেয়ে গুম হয়ে থাকলো। কাজেই শেখ সাহেব নিজে খাঁটি বাঙালি হলেও তাঁর দলের অনেক সাঙ্গো পাঙ্গো ছিলেন পাকিস্তানের প্রতি অতিবিশ্বাসী।

তাই পাকিস্থান ভেঙ্গে যাওয়াতে তাঁরা ভেতরে ভেতরে মোটেই সুখী ছিল না। এরকম মনমানসিকতার সংখ্যা ছিল শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, স্বাধীনতা বিরোধি ছোট ছোট মশা মাছি গুলোকে মেরে হাত লাল করলো কিছু মুক্তি যোদ্ধা, কিছু উগ্রপন্থী মানুষ। স্বাধীনতা যুদ্ধের বহু আগ থেকেই জাগাজমি, লেনদেন ইত্যাদি নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে যে হিংসা বিদ্বেষ ছিল তার পাল্টাপাল্টি প্রতিশোধ চলতে থাকলো অনেক দিন ধরে। এর ফলে আরও কিছু মানুষ দেশ স্বাধীনতার উপর দোষ চাপালো।

স্বাধীনতা বিরম্নধি যে সমস্ত বড় বড় আমলাও রম্নই কাতলারা ছিল, তারা অনেকেই গোপনে আত্মরক্ষা করলো এবং নিজেদের অস্তিত্বকে ঠিকিয়ে রাখার জন্য মুজিব চক্রকে ধ্বংশের পরিকল্পনা আঁটতে লাগলো। যারা দেশের প্রশাসনে ছিল, তাঁরা যদিও বাঙালি কিন্তু তাদের মগজ থেকে পাকিস্তানি আমলের আমলা-মানসিকতা উবে যায় নি। যে দারোগা, যে ডিসি, যে রাজস্ব অফিসার, যে কমিশনার যে কায়দায়, যে নমুনায় অতীতে কাজ চালিয়েছিলেন- কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁরা ঠিক সেই নমুনায় নিজপদে বহাল থাকলেন।

আইনজীবি, বিচারক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, রেল ও পোষ্টাল বিভাগের প্রধান ও কর্মচারী, শিল্পপতি, বিনিয়োগকারী, ব্যাংক কর্মচারী, সচিব, সকলেই তাঁদের অফিসিয়েল কাগজপত্রে 'পূর্ব পাকিস্তান' লিখা জায়গাটির স্থানে শুধু 'বাংলাদেশ' শব্দটির পরিবর্তন ঘটালেন। কিন্তু কাজ চললো সেই পাকিস্তানি স্টাইলে। তাদের মনের ভেতর রয়ে গেল পূর্ব পাকিস্তানি অভ্যাস। এখানে বাঙালিত্বের কোন আমদানি ঘটে নি।

মন্ত্রী মিনিষ্টারগণ তো আর প্রত্যক্ষ কাজের সঙ্গে জড়িত নয়। তারা ওই সমস্ত পেশাজীবি ও প্রশাসনিক লোকদের উপর গলস্না ঘুরাতে গিয়ে কোনো প্রকার (গাইড) পথ নির্দেশ, পদ্ধতি বা উপদেশ কিছুই বাতলে দিতে পারেন নি। বরং ওখানে ঘটেছে স্বজন প্রীতির অনুপ্রবেশ। কর্মচারীদের ভিতর বেধেছে অসন্তুষ্ট। এতে বাঙালি জাতীয়তার জোয়ারে চলে আসে লবণতিক্ত ভাটার স্বাদ।

স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের দাবা খেলায় আওয়ামী লীগ নানা ভাবে দুর্বল হতে থাকে। বিশেষ করে দ্রব্য মুল্যের উর্ধ্ব গতি ও গোপন অস্ত্রের সাহায্যে ডাকাতি ও লুটতরাজের কারণে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা চরম হ্রাস পেতে থাকে। এসব অনেক কথাই আমি লিখেছি 'একটি অপুরণীয় ক্ষতি' নিবন্ধে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশে জাতীয় নির্বাচনে হয়েছে অনেক

ব্যয়। পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ ঘোষণাটি ছিল তৎসময়ের জন্য দেউলিয়া হওয়ার আরেক পদক্ষেপ। দেশের রাস্তা ঘাট ও যোগাযোগ তখনও অনেক বিচ্ছিন্ন। উৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্যে লেগেছে হোঁচট।

ব্যবসায়ীরা ভোগছেন সিদ্ধান্তহীনতায়, বাড়ছে অভাব। মুক্তিযোদ্ধা, আওয়ামী যুব লীগ, প্রাক্তন সামরিক বাহিনীর জোট এবং নতুন রক্ষীবাহিনী এ সমস্ত বিষফোড়া গুলোর উন্মেষ ও অবস্থান নিয়ে বাধলো ঝঞ্জাট। চুপসো হতে লাগলো বাঙালি জাতীয়তাবাদের ফানুস। ভারতের সাথে চলছে খোলাখুলি বন্ধুত্বের উঠা বসা। মৌলানা ভাষানীর পত্রিকা 'হক কথা' আর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়ানো 'জাসদ পার্টি' বিষোদাগার করতে লাগলো শেখ মুজিব ও তাঁর দলের বিরম্নদ্ধে। তারা তিলকে তাল করতে লাগলো সর্বত্র। স্বাধীনতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদকে রক্ষা করার দায়িত্ব আর কেউ নিতে চাইলো না।

সবাই বঙবন্ধু শেখ মুজিব ও তার দলকে 'আলাদীনের যাদুর প্রদীপ' হিসাবে দেখতে চাইলো। স্বাধীনতা বিরম্নধি চক্রগুলি সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তারাও যেমন করে হোক তলে তলে ইন্ধন যোগাচ্ছিল। এমতাবস্থায়, যখন দেশের শিল্প, কারখানা, ব্যাংক বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণ হলো তখন শিল্পপতিরা ভাবলো এত কাঠখড়ি পুড়িয়ে, এত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তিলে তিলে গঠিত কারখানা থেকে যদি নিজের স্বেচ্ছাধীন মালিকানা ও মুনাফা না পাওয়া যায় তাহলে আর লাভ কি ?

লাগাও আগুন। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো যারা পরিচালনা করতো যারা কর্মচারী ছিল তারাও পাকিস্তানি আদলে গড়া, তাদের করার মতো কিছু ছিল না। এ ছাড়া বড় বড় শিল্পের অধিকাংশই মালিকানাধীন ছিল পাকিস্তানিরা ; তাই গোপনে আর প্রকাশ্যে জ্বলতে লাগলো আগুন। এ আগুনের ঠেলা সামলানো হল বিষম দায়। চা বাগান হল জঙ্গালে পরিপূর্ণ, শ্রমিকদের পুর্নবাসন ও উৎপাদনে লাগলো গরমিল। অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়লো। শেখ সাহেব দাড়িয়ে রইলেন বাংলাদেশ নামক এক চোরাবলিতে।

জিনিসপত্র হল দুস্প্রাপ্য- বাড়লো দাম। লবণের সের চলে এলো ৪০ টাকায়। বিদেশী সাহায্য আর নায্য মুল্যের টিন, কাপড় দিয়ে এ ঠেলা সামলানো গেলনা। মানুষ মুক্তির কোনো রাস্তা না পেয়ে বলতে লাগলো 'আমাদের পাকিস্তানই' ভাল ছিল। ভিখারীর কাছে স্বাধীনতা আর পরাধীনতার কোনো মুল্য নেই। **'ধৈর্য্যহীন বাঙালি, অভিজ্ঞতাহীন বাঙালি, কারো ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারলেই প্রাণে বাঁচে এটাই তাদের জাতীয় স্বভাব'**।

এমনি অবস্থায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ জলে ডোবা শিশুর মতই টাপুর টুপুর করতে লাগলো। এখন মুক্তির উপায় কি ? বিরোধী চক্রগুলো ধোয়া তুললো ইসলামের অবমাননার জন্য এ

গজব এসেছে। বাংলাদেশ হিন্দু দাদাদের করতলগত হতে যাচ্ছে- মানুষের মনে ভয় আর আতঙ্কে একাকার হয়ে গেল। যে সমস্ত আওয়ামী লীগ রাজনীতিবিদ মনে মনে পাকিস্তান খা-ত হওয়ার জ্বালায় ভোগছিলেন, তারা এবং দলীয় বহু চেলা চামু-রা এই পরিস্থিতিকে মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন আমলা, সচিব, পেশাজীবি ও ব্যবসায়ীদের বুদ্ধিশুদ্ধি ও পরামর্শ নিতে শুরম্ন করেন।

রাশিয়ান ও পশ্চিমবঙ্গের এক কূটনীতিবিদের পরামর্শকেও গুরম্নত্ব দেয়া হলো। যার ফলে বিকল্প মুক্তি হিসাবে তাঁরা শেখ মুজিবকে ঘসে মেজে ঠেলে দিল (২৪-২-১৯৭৫ইং তারিখে) এক নায়কতন্ত্রের দিকে। সংবিধানে এলো পরিস্থিতির যন্ত্রণাকাতর শক্ত হাত। গঠিত হল বাকশাল। বিরোধিরা পেলো বিদ্রোহ এবং সমালোচনার মহাসুযোগ। জনমনে চলে এলো চরম অসন্তোষ। ওই সঙ্গে যোগ হল প্রশাসনিক দুর্নীতি ও ক্ষমতা অপব্যবহারে রিপোর্ট। এক ঘটনাকে পাঁচ ঘটনারূপে ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। এসবের বিরম্নদ্ধে জনতাকে সাথে নিয়ে কেউ হরতাল, ধর্মঘট করতে যায় নি।

কেবল মাত্র জাসদের হরতালে ছাত্র ব্যতীত আর কেউ সেটায় তেমন আমল দেয় নি। মৌলানা ভাসানীর ন্যাপ ছিল কিছুটা জাগ্রত, কিছুটা বিক্ষিপ্ত। যে জনতা লৌহমানব আয়ুব শাহীর বিরম্নদ্ধে কার্ফ্যু ভঙ্গ করে ঝাপিয়ে পড়েছিল। যে জনতা এরশাদের সামরিক আইনকে তোয়াক্কা করে নি। সেই জনতা সেদিন দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে পতিত হয়েছিল। জনতা হয়তো সেদিন নতুন নেতৃত্বের অপেক্ষায় ছিল- কিন্তু কেউ সুসংগঠিত করতে পারে নি। তারপর যা হবার হলো। একদল পাকিস্তানি আদলে গড়া ধর্মীয় গোঁড়ামীতে চরম বিশ্বাসী সামরিক বাহিনীর উগ্র অফিসার নানা ষড়যন্ত্রের জাল বেয়ে ১৫ই আগষ্ট শেষরাত্রে শ্রদ্ধেয় শেখ মুজিব ও তার পরিবারবর্গকে হত্যা করে। অনেক আগে থেকেই সামরিক বাহিনীর মধ্যে ছিল কোন্দল ও শ্রেণীস্বার্থের ব্যাপার।

যারা মুখে বলেছে 'বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ' অথচ মনের ভিতর পুষে রেখেছিল পাকিস্তান ও ইসলামাবাদ, তারাই স্বাধীনতা বিরোধি চক্রগুলোর সাথে গোপনে আঁতাত করে এ হত্যাকা-টি করে। এই বিশ্বাসঘাতকরাই দেশ স্বাধীনের পরে আল-বদর ও রাজাকারদের প্রাণ রক্ষার জন্য সকল চেষ্টা তদবির চালায় এবং শেষ অবধি তারা শেখ মুজিবের কাছ থেকে মাফ তথা ক্ষমা সার্টিফিকেটটি উদ্ধার করে। মুজিব ছিলেন অতি বিশ্বাসী, তাই কেউটে সাপ বুকে নিয়েই চলতে লাগলেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। এ হত্যাকা-টি ছিল অত্যন্ত টপ সিক্রেট ব্যাপার এবং পূর্ব পরিকল্পিত।

এ হত্যাকা-ের সাথে আমেরিকা এবং পাকিস্তানের গোয়েন্দারা জড়িত ছিল পরড়্রোভাবে। ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ইং সকাল বেলা যখন এ খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, সেদিন সাত

কোটি মানুষের বুকে শেল বিধেঁনি ঠিকই কিন্তু ছয় কোটি মানুষের বুকে শেল বিধেঁছিল একথা চরম সত্য। (সাত কোটির বদলে ছয় কোটি শব্দ দ্বারা অধিকাংশের অনুপাত বুঝানো হচ্ছে) তখন অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র মানুষের করার কিছুই ছিল না। যদি মানুষ ‘বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদকে’ ভালবাসতনা তাহলে মানুষ ওই দিন রাস্তায় বেরিয়ে উলস্নাস করতো। কিন্তু জনগণ উলস্নাস করে নি। শোকে ছিল মুহ্যমান।

উলস্নাস করেছে কেবল মাত্র কেউটে সাপের বাচ্চারা। আর এভাবেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্ফুলিঙ্গা নিভে গেল অস্ত্রের আঘাতে। এটাই শুধু শেষ নয়। ৩ রা নভেম্বর ১৯৭৫ইং তারিখে জেলের ভিতর বন্দী অবস্থায় স্বাধীনতার অকোতভয় নেতা জনাব তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরম্নল ইসলাম, কামরম্নজ্জামান ও মনসুর আলী এই চারজনকে নিমর্ম ভাবে হত্যা করে। মৃত্যুর কাতর যন্ত্রনায় তারা এক ফোটা পানি পর্যন্ত পায় নি। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচাইতে জঘন্য ও ঘৃণ্য হত্যাকান্ড বলে যদি কিছু থাকে, তবে এ হত্যা সেই কাতারের সামিল।

অথচ এই তাজউদ্দিন জনসমক্ষে প্রকাশ্যে বলেছিলেন তিনি যদি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কোনো অন্যায় করেছেন বলে দোষি প্রমাণিত হন তাহলে বিচারে মৃত্যুদ- শাস্তি হলেও তিনি তা মাথা পেতে মেনে নেবেন। একজন সৎ মানুষের দৃঢ়তা সম্বন্ধে এর চেয়ে বড় কথা আর কী হতে পারে ? ‘দৈনিক ইত্তেফাক আর বাংলার বাণী’ পত্রিকাগুলোর পুরানো কপি যোগাড় করলে তা আজও দেখতে পাওয়া যাবে। আর এভাবেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহকদের খতম করা হয়েছে নিষ্ঠুর ভাবে।

জেনারেল জিয়াউর রহমান ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। জনগণ আশা করেছিল হয়তো আবার বাঙালি জাতীয়তাবাদের পুনরম্নত্থান ঘটবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল তিনি একজন গোঁড়া সামরিক আমলা। যার মুখে ছিল বাংলাদেশ আর বুকে ছিল পাকিস্তান ও ক্ষমতার অদম্য মোহ। যার ফলে তিনি হত্যাকারীদের বিচার না হওয়ার জন্য ‘ ইনডেমনিটি বিল’ পাস করে হত্যাকারীদের পুরষ্কার স্বরূপ দুতাবাসে চাকুরীসহ অন্যান্য পদে ভূষিত করেন। আসলে বাংলাদেশের পুরো সামরিক বাহিনীর সত্তর ভাগ লোকেরাই বাঙালি জাতীয়তাবাদে অবিশ্বাসী। এরা ধর্মীয় গোঁড়ামিতে ও আমলাতান্ত্রিক মনোভাবে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। জিয়াউর রহমান একজন মুক্তিযোদ্ধা হওয়া সত্বে ও রাজাকার ও আলবদর গোষ্ঠীকে উষ্ণ স্বাগতম জানিয়ে তার মসনদের চারপাশে বসান।

তিনি তার গদিকে স্থায়ী করার জন্য শত শত গোপন হত্যাকা- ও বিরম্নদ্ধ দলগুলোর নেতা কর্মীদের উপর স্টীম রোলার চালান। সেনাবাহিনীতে গুপ্ত হত্যা, জেল হত্যা, ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মী মিলে তিন হাজার সাতশত দুই জনকে জনকে হত্যা করা হয়।

(বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকা-, আশরাফ কায়সার-পৃষ্ঠা ৭৮-১০৯) আরও অনেক হত্যার বিষয়ে হিসাব আছে বইটিতে, যা এখানে উলেস্নখ করা হলে প্রবন্ধটি দীর্ঘ হয়ে যাবে। জিয়াউর রহমান বাঙালি জাতীয়তাবাদের মুখে 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবাদের সীলমোহর স্থাপন করেন।

গণ সমাবেশে তিনি সাপ ও ককটেল ফাটানোর মদদ জোগান। শেখ মুজিবের আমলে যা বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল- জিয়াউর রহমানের আমলে তার শেষ চিহ্নটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। জিয়ার আমলেই ছাত্রাবাসে ব্যাপক অস্ত্র আমদানি হয় এবং তার আমলেই গোলাম আযম দেশে ফিরার পরিবেশ উন্মুক্ত হয়। শুধু তাই নয় দেশের সকল রাজনৈতিক দল থেকে নীতিহীন রাজনৈতিক নেতা নামের কেউটে সাপেরা তার দলে এসে যোগ দিতে শুরম্ন করে। তারই আমলে জামাত পার্টির পুনরম্নত্থান ঘটে।

পাপ চাপা থাকে না, যে জিয়াউর রহমান পেছনের দরজা দিয়ে বাংলাদেশের নেতৃত্বে এসেছিলেন, সেই জিয়াউর রহমান পেছনের দরজা দিয়েই বিদায় নিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শেখ মুজিবুর রহমান স্বপরিবারে নিহত হবেন সেটা জিয়াউর রহমান অবশ্যই জানতেন।

প্রকৃত বাঙালিরা শ্রদ্ধেয় শেখ মুজিবকে কিছুতেই ভুলতে পারেন না। এদেশের বুকে তাঁর স্মৃতি হিসেবে ফরিদপুর শহরের নাম পাল্টিয়ে 'মুজিব নগর' এবং জিয়া আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টের নাম 'তাজ আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট' রাখা গেলে জাতি অন্তত পক্ষে এ দুই মহান নেতাকে কিছুটা ইজ্জৎ দিয়েছে বলে বিবেচিত হবে। এর অর্থ এই নয় যে আমি জনাব শেখ মুজিবের মূল্যায়ন করছি সামান্য শহরের নাম করণ দিয়ে। তিনি অবশ্যই বাঙালি হৃদয়ে ও ইতিহাসের পাতায় এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। যে সিরাজ সিকদার হত্যার দুর্নাম আর রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারের বদনাম তাঁর সারা গায়ে লেপ্টে দেয়া হয়েছিল। তিনি সে অপবাদের প্রায়শ্চিত্ত করলেন নিজের বুকের রক্ত দিয়ে।

১০♦বিএনপি'র রাজনীতি♦

মানুষ জন্মগত ভাবে কথা বলার স্বাধীনতায় স্বাধীন। মানুষের ইচ্ছা, জাগতিক কৌতুহল, বিশ্বাস অবিশ্বাস এবং বিবেক বিবেচনার উপর তার মনের স্বাধীনতা কাজ করে। আজকের এই নিবন্ধটিতে আমি যা লিখতে যাচ্ছি তা জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লিখা। প্রত্যেক মানুষের জীবনে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকে , সেই অভিজ্ঞতা যদি মিথ্যে হয় তাহলে এর অর্থ এই দাড়ায় যে নিজের সাথে নিজে প্রতারণা করা।

একজন ঘনিষ্ট বাল্যবন্ধু, স্কুলের সহপাটী এবং পরিচিত কয়জন মিলে যখন তাস খেলা শেষে চায়ের আড্ডায় মেতে উঠছিলাম তখন সেই বাল্য বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম মুরাদ (ছদ্মনাম) তুই কেন বিএনপির রাজনীতি করছিস?

সে অত্যন্ত সরলতার ভেতর জবাব দিল : নিজের প্রাণটা বাজী রেখে যে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিলাম তখন মনের ভেতর কোনো পাওনা দেনার হিসাব ছিল না। হিসাব ছিল কবে সেই উর্দু ভাষীদের কর্তৃত্ব থেকে আমরা বাঙালিরা মুক্ত হবো, যারা আমাদের ঘৃণা করে, আমাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে। কিন্তু যুদ্ধের পর দেখলাম অন্যান্য মানুষের মতো আমিও একজন সাধারণ মানুষ। যুদ্ধ আমি একা করি নি আমার মতো আরও অনেকে করছে। কিন্তু যোদ্ধা হিসাবে আমি কি পেলাম এই একটা প্রশ্ন আমাকে যন্ত্রণা দেয়।

যদি কোনো চাকুরিতে নিযুক্ত থাকতাম হয়তো এরকম প্রশ্ন মনকে ক্ষত বিক্ষত করতো না। আমি তখন চারপাশে চেয়ে দেখি আমার মতো সবাই আওয়ামী লীগ করছে না হয় সমর্থন করছে। কিন্তু এত আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ভীড়ে আমি একেবারে নস্যি। এখানে কোনো রাজনৈতিক পদ, চাকুরি কিংবা ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা হাতিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। কারণ ওখানে প্রতিযোগিতা বেশি।

সুতরাং আওয়ামী লীগ ত্যাগকরে আমি বিএনপিতে এসে নিজের পরিচিতি এবং অবস্থানকে একটু দৃঢ় করেছি। আশা করছি এই পার্টির ছায়াতলে আমি কিছু একটা করতে পারবো। এখানে আওয়ামী লীগ কত ভালো আর বিএনপি কত খারাপ সেটা আমার কাছে মুখ্য বিষয় নয়। মুখ্য বিষয় হচ্ছে আমার খাওয়া বাচাঁর তাগিদ। আমি এখন দেশের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নই, আমি আমার পেটের রাজনীতিতে বিশ্বাসী।

উপরম্নক্ত কথাগুলো হয়তো অনেক পাঠকই তার জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন। এখানে স্পষ্টই আমরা বুঝতে পারছি একজন মানুষ চাকুরি পেলে সে রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতো না। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না বলেই সে নতুনের সন্ধানে ছুটে চলেছে। বিএনপির জাতীয় রাজনীতি দেশের জন্য ভাল না মন্দ সেটা তার কাছে বিবেচ্য নয়। সুতরাং সে দেশপ্রেমিক নয় এবং সমাজ প্রেমিক ও নয়। কিন্তু ব্যক্তিগত হিসাবে সে একজন ভাল এবং উদার মানুষ এই প্রাকৃতিক চরিত্রের জন্য সে যে কোনো মানুষকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

আরেক জন বয়স্ক মুরব্বীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনি যুদ্ধ দেখেছেন, যুদ্ধের ভয়াবহতার অভিজ্ঞতাও আছে। আপনি কেন বিএনপির রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন ? তিনি হেসে বলেছিলেন ভাতিজা আমি তোমার জন্মের আট দশ বৎসর পূর্ব থেকে এই পৃথিবীর অন্ন খাচ্ছি সুতরাং তুমি আমার নাড়ীর কথাটা জানতে চাচ্ছ বড় কায়দা করে।

আমি কাউকে পরোয়া করি না, যা বলি সরাসরি বলি। তুমি তো জানো আমার বাপ চাচারা সবাই মুসলিম লীগ করতো। দেশ স্বাধীনের পর সেই মুসলিম লীগের কোনো অস্থিত্ব রইলো না। কিন্তু যারা মুসলিম লীগ করতো তারা তো এদেশ থেকে হাওয়ার মতো উবে যায় নি। এরা আইয়ুব শাহী আমলের পোড় খাওয়া ঝানু লোক। তারা ভিলেইজ পলিটিক্স আর মোড়লগিরিতে ওস্থাদ।

সুতরাং সেই যায়গায় আওয়ামী লীগ এসেছে। সংসদে বসেছে, তাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তারা জানে না ভিলেইজ পলিটিক্স মানেই নেশন্যাল পলিটিক্স। পার্থক্য শুধু এই : একটির পরিসর ছোট্ট এবং অন্যটির পরিসর বড়। জিয়াউর রহমান সেই লোক যে আইয়ুব শাহীর রাজনীতিতে বিশ্বাসী। জিয়াউর রহমান বিএনপি গঠন করে সকল মুসলীম লীগ বিশ্বাসীদের একত্রিত করার পস্নাটফর্ম তৈরি করেছেন। এজন্য জিয়াউর রহমান আমাদের কাছে আর্শীবাদ স্বরম্নপ। বিএনপির মাধ্যমে আমরা আমাদের হারানো কতৃর্ত্ব ও প্রতাপকে ফিরিয়ে পেয়েছি। এটাই আমাদের স্বার্থ।

সুতরাং এখানে লুকালুকির কিচ্চু নেই। সোজাসোজি বলে দিলাম মনের কথা । জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক, যোদ্ধা এবং দেশ দরদী এসব বলার পেছনে আমাদের উদ্দেশ্য একটাই, যেহেতু তিনি আমাদের স্বার্থরক্ষাকারী লোক, সেজন্য তাঁহার স্থায়িত্ব এবং অস্থিত্ব মানুষের মনে সুদৃঢ় হোক এই কামনায় তাঁহার জয়গান গাওয়া। নতুবা ভেবে দেখো জেনারেল ওসমানীর অবদানের কাছে জিয়াউর রহমান সামান্য খড়কুঁটা।

এক জিয়াউর রহমান কালুর ঘাটে স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা দিয়েছে তো কি হয়েছে ? উনি ঘোষণা না দিলেও লোক যুদ্ধ করতো, না দিলেও করতো। উনি ঘোষণার কাজটি না দিলে আরো শত শত জিয়াউর সেই কাজটি করতো।

এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এটাই স্পষ্ট যে বিএনপির রাজনীতি দেশের জন্য কত ভালো বা মন্দ সেটা ওদের ব্যাপার নয়। নিজেদের লুপ্ত কর্তৃত্ব ও কায়েমী স্বার্থকে উদ্ধার করার জন্যই মানুষ বিএনপি করছে। বিএনপির যে জয়গান গাওয়া হচ্ছে তা শুধুই নিজেদের শ্রেণী স্বার্থের ব্যাপার । সুতরাং ওরা দেশপ্রেমিক কিংবা সমাজ প্রেমিক কোনটাই নন।

আমার দুর সম্পর্কীয় তালই শরীফ আহমদ (ছদ্মনাম) এক কালে তিনি হালকা কৃষি কাজ করতেন আর খালে বিলে মাছ ধরতেন। ভাইদের সাথে ঝগড়া করে একদিন মায়ের অলঙ্কার নিয়ে পালিয়ে গেলেন চট্টগ্রামে। উদ্দেশ্য জাহাজে চাকুরি নেয়া। জাহাজে তার চাকুরি হলো না বটে তবে চট্টগ্রামের রাস্তায় রাস্তায় তিনি অনেক ঘুরলেন। বহু ঘাটের জল খেলেন।
এখন শহরে তার তিন চারটি বাসা, ব্যাঙ্কে অঢেল পয়সা। তার পেশা কন্ট্রাকটর। ব্রীজ, কার্লভাট ও রাস্তার মেরামতের কাজ করান তিনি। মনে প্রাণে বিএনপি করেন। অথচ ৭০ / ৭২ সালে গ্রামের যুবকদের নিয়ে তিনি রাত্রিকালে মুখে টিনের চুঙ্গা লাগিয়ে শেস্নাগান দিতেন: ভোট দিবেন কাকে ? আওয়ামী লীগকে।

ভোট দিবেন কোন ছবিতে ? নৌকার ছবিতে। দিন যায় দিন আসে, জীবনে আসে পরিবর্তন। ২০০০ সালে এক রাত্রিকালীন নৈশভোজের পর পারিবারিক নানা আলাপের পর দেশের শোচনীয় অবস্থা নিয়েই আলাপ হচ্ছিল। কথা প্রসঙ্গে বলেই ফেল্‌লাম আপনি বিএনপি করার পেছনে কোনো যুক্তি দেখিনা তবু কেন বিএনপি করেন? তালই বললেন : তুমি তো বাবা বিদেশী হয়ে গেছ, তাই এই দেশের অনেক কিছুই তোমার পক্ষে বুঝা কঠিন হবে। আর সব যায়গায় সত্যকথা বলা ও যায় না। তুমি বিদেশী এবং সত্যবাদী ছেলে হিসাবে তোমাকে সত্য কথাটি বলছি।

তোমার আন্দাজ ঠিকই আছে আমি বিএনপি করার কোনো কারণ নেই। একটি কারণে করি। তুমি তো জানো আমার মেজো মেয়ের জামাই অমুক এলাকার অধিবাসী। তো মেয়ের শ্বাশুড় অর্থাৎ আমার বেহাই ওই এলাকায় অতি অল্পদামে শ্রী অরবিন্দ ঘোষের বাড়ি কিনেছিলেন ১৯৯২ সালে।

সেই বাড়ী দখল করতে গিয়ে বহু মামলা মকদ্দমায় আমার বেহাইর অবস্থা চরম নাজুক হয়। অথচ এই বাড়ীটা এর আগে অরবিন্দের বড় ভাই জ্যোতিরিন্দ্র ১৯৫৭ সালে গোপনে বিক্রি

করে চলে গিয়েছিল ইন্ডিয়াতে। আমি অবাক হয়ে তালই সাহেবের কথা কেটে বললাম, তাতে বিএনপির সম্পর্ক কি? তিনি বললেন আরো একটু পান খাও। কথা যখন তুলেছো তখন বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা না করলে বুঝবে না।

জ্যোতিরিন্দ্র যে লোকের কাছে বাড়ি বিক্রি করেছিল তিনি ছিলেন তখন সে এলাকার একজন ইউনিয়ন মেম্বার। কোর্ট রায় দিয়েছে যেহেতু এই সম্পত্তি দুই শরীকের সেই জন্য অরবিন্দের অংশ জ্যোতিরিন্দ্র বিক্রি করতে পারে না এটা ছিল ভূয়া। অতএব এই বাড়ীর চার একরের অর্ধেক অর্থাৎ দুই একর পাবেন আমার বেহাই। কিন্তু বাধ সাধলো অন্য পক্ষের কৌশলী উকিল। সে বলছে জ্যোতিরিন্দ্র তার নিজের অংশ তার ভাইয়ের কাছেই বিক্রি করে ইন্ডিয়া চলে গেছে এবং এ বিষয়ে তার কিছু দলিল দস্তাবেজ ও আছে।

আদালতের অনেক ঝামেলার পর আমার বেহাই ঠিকই অর্ধেক অংশের মালিক হয়েছেন এবং বাড়ীর চৌহদ্দি বরাবর ওয়াল ও দেয়া হয়েছে। এখন বাবা আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে আমার বিশ্বাস নেই। তারা বাঙালি বাঙালি বলে চিৎকার করে। ধর্ম নিরপেক্ষতার গান গায়। আমি পুণরায় কথা কেটে বললাম আপনি ওতো একদিন বাঙালি বাঙালি বলে রাস্তায় চুঙ্গা ফুকে চিৎকার দিতেন।

তিনি বললেন তখন কী আর অতসব বুঝতাম ? বয়েস তো কম ছিল। এখন আওয়ামী লীগের রাজনীতির কারণে যদি এইসব হিন্দু-বিন্দু বাংলাদেশে ফিরে আসে তাহলে কি অবস্থা হবে ? আমার মেয়ে ও মেয়ের জামাইকে যদি ঐ সম্পত্তি হাতছাড়া করতে হয়! তাই ভেবে চিন্তে দেখলাম বিএনপি করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আমি অবাক হয়ে বল্লাম তালই সাহেব আপনি এসব কী বলছেন ? কেউ তো জোর পূর্বক সম্পত্তি আইন প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না এবং সম্পত্তি যেহেতু আপনার বেহাই এর দখলে আছে সেহেতু কে এখানে আসবে মাথা ফাটাফাটি করতে ? এসব কি এতই সোজা যে বেদখল হয়ে যাবে ? দেশের আইন আদালত সবকিছু কি উচ্ছেদ হয়ে গেছে ? তিনি পুণরায় জোর দিয়ে বললেন এদেশে আইন আদালতের কোন ঠিক নেই।

আজকাল বিএনপির জোর তাই মামলায় বেহাইকে জিতিয়ে নিয়েছি। সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য এখন থেকেই সতর্ক থাকা দরকার। এ জন্য মুসলমান হিসাবে বিএনপি করার জরুরর আছে। আমি বললাম আইন আদালতে আপনার বিশ্বাস নেই কিন্তু আগামীকাল আপনি বাঁচবেন এই বিশ্বাস কি আছে ? আইন আদালত ছিল বলেই তো আপনার বেহাই সম্পত্তি পেয়েছেন। তিনি বললেন বাবা তুমি দেশে থাকো না। দেশের পলিটিক্স বুঝবায় না।

তালই রাগ করতে পারেন এজন্য আমি আর কথা বাড়াই নি। শুধু বলেছিলাম তাহলে তালই সাহেব আপনি মুসলমান হিসেবে জামাতের রাজনীতি কেন করেন না ? উত্তরে তিনি বলেছিলেন: মুলস্নারা মাদ্রাসায় পড়ে। ওরা কিছুই জানে না। দোয়ালস্নীন এর যায়গায় জ্বোয়ালস্নীন পড়লেই তোমার পায়ের রগ কেটে দিবে। ওরা তো মানুষই না।

উপরি উক্ত বক্তব্য থেকে এটাই স্পষ্ট যে মানুষ তার সহায় সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য বিকল্প হিসাবে বিএনপি করছে। দেশের আইন আদালতে তাদের বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস পার্টির প্রভাব প্রতিপত্তি ও শক্তির উপর। আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে তাদের ভয় এইযে, যদি কোনো কারণে আবার হিন্দুদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে হয়।

বুঝাই যাচ্ছে বিএনপির রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার অর্থ হচ্ছে কোনো না কোনো দিকে নিজের ও নিজ খান্দানদের স্বার্থরক্ষা। এখানে দেশের বা সমাজের মঙলের জন্য কেউ বিএনপির রাজনীতি করছে না। অথচ আজকে এই বিএনপির রাজনীতির আমলেই ভারতের রাজনীতিবিদরা সন্ত্রাসী হটানোর নামে বাংলাদেশকে সরাসরি আক্রমণ করার কথা প্রকাশ্যে বলছে।

১৯৯৯ সালে নিজ এলাকার এক ছেলে চলে এলো ক্যানাডায়। রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থী হিসাবে রিফিউজী স্টেটাসের জন্য আবেদন করলো ছেলেটি। আবেদনের পুর্বে কেইস কি লিখাবে ? কোন ভিত্তিতে লিখালে ভাল হবে ? ওই সব যুক্তি পরামর্শ করার জন্য তার বাপের রেফারেন্স নিয়ে এলো আমার কাছে।

নিজ এলাকার স্থানীয় কলেজে সে বিএনপি করতো। তাহাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে অনেক তথ্য দিলাম তারপর সে কেন বিএনপি করছে তাও জানতে চাইলাম। বল্লাম সত্যি সত্যি বলো তা হলে আমি তোমাকে সঠিক গাইড দেয়ার চেষ্টা করবো যাতে করে তুমি তোমার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে পার।

ছেলেটি বললো বিএনপির ক্যাডারদের প্রায় সকলেই কোনো না কোনো ভাবে অস্ত্রের বলে বলীয়ান, সুতরাং তাদের দাপট বেশি। তাদের ছত্রছায়ায় থাকলে পকেট খরচার কোনো অসুবিধা হয় না। থানার দারোগা পর্যন্ত কথা শুনে। বিএনপির মন্ত্রী মিনিষ্টারদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র না থাকতে পারে কিন্তু ক্যাডারদের কাছে তা থাকে। আর নিজের কাছে না থাকলেও যে কোনো কঠিন কাজ উদ্ধারের জন্য খবর পাঠালেই কাজ হয়।

সুতরাং বিএনপিতে নিরাপত্তাই বেশি। তা ছাড়া বিভিন্ন রকমের উপরি পয়সাও মিলে, তবে সব এলাকায় নয়। তার বক্তব্য শুনে আমি চরম হতাশ হই। তাকে বললাম ক্যানাডায় কখনও

কোন ইন্টারভিউ কিংবা শুনানীতে দেশের এই সব কদর্য্য ব্যাপার স্যাপার যদি তুমি উলেস্নখ করো তাহলে এদেশে তুমি জীবনেও রিফিউজী স্টেটাস পাবে না। তারপর যারা এদেশে রিফিউজী স্টেটাস পেয়েছে তাদের কাছ থেকে আরও তথ্য জানার জন্য তাকে উপদেশ দেই।
উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এটাই সুস্পষ্ট যে, বিএনপি রাজনীতি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের দাপট বজায় রাখা এবং কিছুটা আয়ের উৎস। দেশে চাকুরির সংস্থান হোক, কল কারখানা ও সার্ভিস সেক্টর উন্মোক্ত হোক, ছাত্ররা সৎভাবে পয়সা রম্নজগার করম্নক এসবের কোনো নাম গন্ধ ও নেই। সুতরাং জাতির উন্নয়ন আর সমাজ কল্যাণের কোনো পস্ন্যাটফর্ম তৈরির সামান্যতম উদ্যোগ যে রাজনৈতিক দলের নেই, সেই দেশে রাজনীতির নামে ভাওতাবাজী যে কত মারাত্মক ও কত বিভীষিকাময় তা বলাই বাহুল্য।

ঢাকায় অবস্থান করেন আমার ঘনিষ্ট বন্ধু। ঢাকার ইসলামিক ফাউন্ডেশনে দীর্ঘ সময় করেছেন চাকুরি। তিনি এবং ভাবী সাহেব উভয়েই বিএনপির ঘোর সমর্থক। বাসায় খাওয়া দাওয়ার পর ঢাকার জন-জীবন, উদ্বেগ, হতাশা আর নিরাপত্তাহীনতার আলোচনাই বারবার আসে। তারা বিএনপি সমর্থন করার পেছনে যুক্তি হলো বিএনপির একটি চমৎকার যোগাযোগ আছে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সুতরাং যে কোনো সমস্যায় সেনাবাহিনী দেশের শাসনভার কব্জা করে সব দুর্নীতির অবসান ঘটিয়ে ফেলবে এটাই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

দেশে দুর্নীতিটা হলো অপেন সিক্রেট এসব দীর্ঘদিন বজায় থাকলে মানুষ অভ্যস্ত্ম হয়ে যায়। সুতরাং বারবার পার্টি বদল হওয়া দেশের জন্য ক্ষতিকর। বিএনপি সংবিধানে বিছমিলাহ সংযোগ করেছে এটা ইমানের পরিচয়। তাছাড়া খালেদা জিয়ার চেহারা খুবই নিস্পাপ মনে হয়, দেখতেও খুব মায়া লাগে। আলস্নাহর একটা ছায়া তার উপরে আছে তা নাহলে বাংলাদেশে এত নামী দামী লোক থাকতে তিনি বারবার প্রধানমন্ত্রী হন কি ভাবে ? এসব হলো তাদের যুক্তি।

উপরের বক্তব্য থেকে বিএনপির রাজনীতি দেশের বা সমাজের কল্যাণ, শিক্ষা কিংবা পাবলিক সার্ভিসের মান উন্নয়ন ইত্যাদির ও কোনো হদিস পাওয়া গেল না। একটি দেশের মানুষের এই যদি হয় দেশ ও রাজনীতি সম্পর্কে মনোভাব তাহলে সে দেশের উন্নয়ন আর অর্থনৈতিক মুক্তি শুধুই স্বপ্ন ব্যতীত আর কি হতে পারে ?

১১♦ সম্মিলিত বৃহৎ বাঙলার স্বপ্ন ও বর্তমান বাঙালি♦

পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মত বাঙালি একটি জাতি। তাদের রয়েছে হাজার হাজার বৎসরের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস। সে ইতিহাস নিখুঁত ভাবে আমরা আজো জড় করতে পারি নি। তা সত্ত্বেও যা ইতিহাস আমরা পেয়েছি তাতে করে এই জাতির ভাষা, নৃতাত্বিক পরিচয় এবং ভৌগলিক অবস্থান ইত্যাদি অনেক গৌরবময়। বহু জাতির সংমিশ্রনের ফলে বাঙালি জাতি একটি শংকর জাতিতে পরিণত হয়েছে যুগ এবং শতাব্দির ধাপে ধাপে।

সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এইটি যে, অনেক জাতির সংমিশ্রন হলেও এই জাতি নিজেদের বাঙালি অস্তিত্বকে বিলুপ্ত হতে দেয় নি। তাদের স্বাধীনতা ও পরাধীনতার অনেক উত্থান পতনের মধ্যে কোনো অর্থনৈতিক মুক্তি ও আসে নি।

বাঙলাদেশ, ত্রিপুরা, আসামের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল তথা মেঘালয়, উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিম বঙ্গ সহ বাঙালির ভৌগলিক পরিচয় নিয়ে যে জাতির আদিকাল থেকেই বসবাস সেই জাতির ঐক্য ভিত্তিক বাঙালি রাষ্ট্র আজো গড়ে উঠে নি। তাই তারা নিঃসন্দেহে আজো পরাধীন। যেসমস্ত বাঙালি বিজ্ঞ রাজনীতিবিদরা ব্রিটিশ আমলে একটি স্বাধীন বৃহৎ বাংলা গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন তারা ব্রিটিশ এবং তৎকালীন দিলস্নী কেন্দ্রিক রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা আদায় করতে পারেন নি।এটা বাঙালির সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। তা না হলে এতদিনে হয়তো বৃহৎ বাঙলার বাঙালিরা বিশ্বের বুকে তাদের শিক্ষা দীক্ষা ঐতিহ্য ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধে অনেক দুর এগিয়ে যেতো।

আজকের পশ্চিম বঙ, ত্রিপুরা, উত্তর বঙ, মেঘালয় রাজ্য সমুহ নানা সমস্যায় জর্জরিত। মাথা পিছু আয় কিংবা বাংলা ভাষাভাষি এলাকার জাতীয় গড় আয়ের হিসাব কষলে যে সত্যটি বেরিয়ে আসে তা মোটেই সুখকর নহে। দারিদ্রের চরম কষাঘাত শতকরা ৮৩ টি পরিবারে। তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সকল সরকার যেভাবে মাথাপিছু আয়, জাতীয় উৎপাদন কিংবা অন্যান্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির হিসাব কিংবা পরিস্যংখ্যানাদি নথিভুক্ত করে তা অতিশয় লোক ভুলানো ব্যাপার। এ হিসাব তাদের আত্মরক্ষার হিসাব।

এসব হিসাব নিকাশে সত্যের সঙ্গে যে মিথ্যার মিশ্রণ হয় তা বড়ই আক্ষেপের। যে কোনো রাজ্যের কিংবা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার, মুদ্রার অবমুল্যায়ণ, বাজেট ঘাটতি, কর্পোরেশান ও বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান সমুহ যদি প্রতিনিয়ত লোকসানের দায়ে মুখ থুবড়ে

পড়ে তাহলে একজন কলেজের সাধারণ ছাত্র ও বুঝতে সক্ষম হয় দেশের অর্থনীতি কোন পর্যায়ে আছে।

মানুষের ক্রয় ক্ষমতা, চাকুরির সংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং যে কোনো শ্রমের মুল্যায়ন থেকে অতি সহজেই অনুমান করা যায় একটি জাতির দারিদ্রতার মাপ কতটুকু ? উপরে উলিস্নখিত বাঙলা ভাষাভাষী অঞ্চল সমুহের যে বাস্ত্মব চিত্র পাওয়া যায় তা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় বাঙালি জাতি যে অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, সেই অন্ধকারে আজো নিমজ্জিত। ওই সমস্ত্ম অঞ্চল সমুহের বাঙালিরা স্বদেশী বেনিয়াদের শোষণে জর্জরিত এবং পণ্যের ক্রেতা হিসাবেব তারা লুটেরা ও কালোবাজারীদের পুঁজির যোগান দাতা।

শুধু তাই নয় তারা নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে চরম ভাবে বিকৃত করে নিচ্ছে। আর ইংলিশ ও বিদেশী কালচারের উগ্র থাবায় নিজেরা হারিয়ে যাচ্ছে। ‘কিছু সংখ্যক লোকসমষ্টি কিংবা উন্নত পেশাজীবিদের উন্নয়ন, একটি জাতির উন্নয়নের কোনো মাপকাঠি নহে’। ঝলমলে বিপনী বিতান, পাশ্চাত্যের অনুকরণে লেফাফা দুরস্ত্ম টেলিভিশন প্রগাম আর নাটকে ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতে অভিজাতদের ঘর-দোয়ার এবং বিলাসবহুল আসবাবপত্র সমুহ বারবার দেখানো, উন্নয়নের কোন পরিচয় নয়। এটা সাজানো একটা লোক দেখানো প্রতারণা মাত্র।

আজ বিশ্বের বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো কাঁচামাল থেকে তৈরি পণ্যদ্রব্য, বৈদ্যুতিক, ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল কিংবা কুটির শিল্পের উন্নত পণ্য সামগ্রী, হালকা কিংবা ভারী যন্ত্র ও যান্ত্রিক শিল্পদ্রব্য কিছুই বাঙালি জাতির আয়ত্বাধীন নহে। কৃষি, সরকারি ও বেসরকারি চাকুরি এবং দৈহিক পরিশ্রম ব্যতীত বাঙালির কোনো জাতীয় পুঁজি নেই।
একটি রাষ্ট্রকে মজবুত অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরে দাড় করাবার কোনো উপকরণ কিংবা পুঁজি কিছুই বাঙালির আয়ত্বে নেই। খাদ্য এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে যে জাতি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না সে জাতি যতই বিত্ত বৈভবের বড়াই করম্নকনা কেন, তার সে বড়াই ঠুনকো এবং বালির বাঁধের মতো তুচ্ছ। আমরা অতি নিকটবর্তী ইতিহাস আওড়ালে স্পষ্টই দেখতে পাবো ভারত রাষ্ট্র চিরকাল বাঙালি অঞ্চল সমুহকে বাজার কলোনি হিসেবেই দেখছে।

সুজলা সুফলা নদনদী প্রবাহিত বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল সমুহের উজানে কৃত্রিম বাঁধ নির্মাণের কারণে বাঙালি জাতির অস্ত্মিত্বের সাথে জড়িত যে কৃষি ব্যবস্থা ; সেই ব্যবস্থা এখন দাড়িয়ে আছে ধ্বংসের শেষ পর্যায়ে ভগ্নস্ত্মুপের মত। অদুর ভবিষ্যতে রাজনৈতিক গোলযোগ ও দারিদ্রতার মধ্য দিয়ে যাতে বাঙালির অস্ত্মিত্বের বিলুপ্তি হয়ে যায় এটা তার একটা সুদুরপ্রসারী নীল নক্সা।

প্রতিটি নদী থেকে উৎপত্তি হয়েছে বহু উপনদী সমুহের। সেই উপনদী থেকে উৎপত্তি হয়েছে ছোট বড় অনেক ধরনের খাল এবং নালার। এভাবেই জালের মত দেশের আনাচে কানাচে বিস্তৃতি লাভ করেছে বাঙালির কৃষি ও সেচ ব্যবস্থার এক প্রাকৃতিক পদ্ধতি। সেই কৃত্রিম পদ্ধতিকে তছনছ করে দিচ্ছে ভারতীয় রাজনীতির জঘন্য কারসাজি। বিদ্যুত উৎপাদন আর সেচ ব্যবস্থার অজুহাতে ভারত সরকার যেভাবে একের পর এক আগ্রাসনী ভূমিকা নিচ্ছে তাকে সহজেই সাম্রাজ্যবাদীতার সাথে তুলনা করা যায়।

গণতন্ত্রের দাবীদার ভারতের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কর্মকা-ের পর্যালোচনা টেনে আনলে দেখা যাবে ভারতে গণতন্ত্রের ভিতরে ওত পেতে বসে আছে একদল শক্তিশালী পুঁজিপতি, বুদ্ধিদাতা আমলা, এবং উগ্র মৌলবাদীদের গ্যাং। তাদের বাহ্যিক বেশভূষা অতি সাধারণ। তারাই ভারত সরকারের গণতন্ত্রের হর্তা কর্তা। তারা কোটি কোটি ভারতীয় নাগরিকের শিক্ষা, চিকিৎসা ও চরম দরিদ্রতাকে উপেক্ষা করে **'সুপার পাওয়ার'** হওয়ার কামনায় দিনরাত রঙিন স্বপ্ন দেখছে।

জাতির উন্নয়নের নামে নদীর যেখানে সেখানে বাঁধ দিয়ে আরেকটি জাতিকে নিঃশেষ করে দেয়ার পরিকল্পনা কি ধরনের গণতন্ত্র ? ন্যায়সঙ্গত ভাবে প্রশ্ন দাড়ায় জাতির উন্নয়ন যদি কামনা হয় তাহলে উলেস্নখ করতে হবে কোন জাতির উন্নয়ন ? ভারতে তো আর দু'এক জাতির বসবাস নয়। ডজন ডজন জাতির বসবাস।

নদীতে বাঁধ মানেই আর একটি জাতির মু-পাত, একটি নিরব সর্বনাশী আগ্রাসন। বাঙালির জীবনে নদী নেই, পানি নেই এটা বিশ্বাস করতে চরম কষ্ট হয়। হাজার হাজার বৎসরের ইতিহাসকে ভেঙে চুর্ণ বিচূর্ণ করে দিলেও বাঙালি জীবনের সাথে নদীর সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না । এটা একটা প্রাকৃতিক বন্ধন। পলিবাহিত খরস্রোতা নদী দু'কুল ভেঙ্গে নিয়ে মানুষের জীবনকে তছনছ করে দিলেও বাঙালিরা এই নদীকে ভালবাসে সবচেয়ে বেশি । এক অবিশ্বাস্য মায়ার বন্ধনে এই নদনদী সকলের নাড়ীর সাথে মিশে আছে। সুতরাং নদীকে সচল ও উজ্জীবিত রাখার দায়দায়িত্ব সমস্ত বাঙালি জাতির। নদীবিহীন বাঙালি জীবন মানেই হচ্ছে বাঙালির অস্তিত্বের প্রশ্ন।

ওপর দিকে কাশ্মীরে চেনাব নদীর উৎসমুখে ভারত বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনায় পাকিস্তানের সাথে আবারো সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। ১৯৬০ সাল থেকে সিন্ধু নদীর পানি বন্টন নিয়ে ও পাকিস্তানের সাথে চলছে মনমালিন্যতা। এদিগে ফারাক্কা বাধেঁর নির্মমতায় বাংলাদেশের যে অপমৃত্যু হয়েছে তা সকলের জানা। আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে টিপাইমুখ সহ বিভিন্ন নদীর পানি ও বাঁধ নিয়ে ভারতের যে আগ্রাসনী মনোভাব রয়েছে এতে

করে বাঙালি জাতি চিরতরে খাদ্য এবং অর্থনৈতিক ভাবে পঙ্গু হয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রিয় অমর্ত্য সেন! আপনি কি আপনার জাতির ভবিষ্যতের কথা ভাববেন না? আজ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের প্রায় তিন শতাধিক উলেস্নখ যোগ্য নদী ও উপনদীর অস্তিত্ব শেষ হতে চলেছে। বর্ষা মৌসুমের কারণে নদীগুলো শুধু তাদের চিহ্ন বুকে ধারণ করে বেঁচে আছে।

প্রায় তিন যুগ ধরে নদীর তীরে তীরে ভারত বিভিন্ন কর্পোরেশনকে লাইসেন্স দিয়েছে কেমিক্যাল জাতীয় কারখানা তৈরির। সেই কারখানা সমুহ থেকে বিষাক্ত বর্জ ও তরল পদার্থ নদীর পানিতে মিশে গিয়ে এক চরম দুর্গতির সৃষ্টি হয়েছে বাঙালির জীবনে। নদীর পানি এখন আর সুপেয় নহে। নদীর মাছে আজ স্বাদ নেই, নেই মাছের বংশ বিস্তারের কোনো সুযোগ। সেই নদীর পানি যেসকল তৃণ শস্যাদি শুষে নেয় তাতে ও রয়েছে কেমিক্যালের প্রভাব। এভাবে এক নিরব নিঃশব্দ এবং লক্ষণহীন ক্ষয় রোগের শিকারে পরিণত হয়েছে বাঙালির জীবন এবং তার ক্ষেতকৃষি।

অপর দিকে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত কীটনাশক ঔষাধ এবং সার ইত্যাদি অপরিকল্পিত ভাবে ব্যবহারের ফলে তা মাটিতে মিশে গিয়ে বৃষ্টি জলের সাথে সামান্য অংশ পর্যায়ক্রমে ভূগর্ভের নীচে চলে যাওয়াতে ভূগর্ভের পানি কিছুটা দুষিত হচ্ছে। ভূগর্ভের নীচে, মাটির স্তরে স্তরে ভেজা ভেজা নমুনায় আটকে থাকে যে পানি, সেই পানির যোগানদার হচ্ছে নদীর প্রবাহ, আদ্র জলবায়ু এবং বৃষ্টি।

একটি এলাকায় যখন নদী, উপনদী, খাল, নালা ইত্যাদিতে জলের ধারণ ক্ষমতা কিংবা জলের প্রবাহ কমে যায় তখন ভূগর্ভের পানিও কমে যেতে বাধ্য। এমতাবস্তায় সহজেই পানির স্তরে ঘাটতি শুরম্ন হয়। যার ফলশ্রম্নতিতে পানি আরও অধিক নিচে নেমে যায়। ইদানিং (২৪ ডিসেম্বর ২০০৪, ঢাকা সিটি এনভায়রনমেন্ট রিপোর্ট) খবরে প্রকাশ ঢাকার ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ৪৬ মিটার নিচে নেমে গেছে ।

এটা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার যে, পানি নিচে নেমে যাবার প্রাক্কালে মাটির স্তরের বিভিন্ন কেমিক্যাল জাতীয় পদার্থ দ্রবীভূত হয়ে তা পানির সাথে থিতিয়ে পড়ে। সেই ভূগর্ভের পানি চাপকলের সাহায্যে উপরে উঠিয়ে পান করা হচ্ছে এবং দৈনন্দিন জীবনে এর বহুল ব্যবহার ও হচ্ছে। যার ফলশ্রম্নতিতে বাঙালি জাতি আজ 'আর্সেনিক' নামে এক ভয়াবহ বিষ ক্রিয়ায় আক্রান্ত।

নদীতে বাঁধ দিয়ে জলের প্রাকৃতিক গতিকে রোধ করার কারণে এভাবে বহু অদৃশ্য গজব বাঙালির ললাটে অঙ্কিত হয়েছে। অতএব বিভিন্ন নদীর উৎসমুখে ভারত সরকার বিবেকহীন ভাবে যে সমস্ত বাঁধ দিয়ে চলেছে তা বাঙালি জাতিকে গলাটিপে হত্যা করার মতো এক ভয়ঙ্কর অপরাধ। নদীর স্রোতের প্রবাহ ঠিক না থাকার কারণে নদীর তলদেশে পলিমাটি জমে তা ভরাট হয়ে গেছে।

এজন্য বর্ষা মৌসুমে এই পানি দ্রুত সাগরে পতিত হতে পারে না । যার ফলে প্রতি বৎসর বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা হচ্ছে। নদীর পানিতে লবন নেই, তাই সাগরের নোনা জল নদীর জলের স্থান দখল করে নিচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে সুন্দরবন সহ উপকুলীয় এলাকায় গাছ পালা, মাছ এবং পশু পাখিদের জীবন আজ অকাল মৃত্যুর দাপটে বিলীন। এভাবে চারিদিকে বাঙালি জাতির জন্য সৃষ্টি হয়েছে এক চরম বিপর্যয়।

এভাবে সময়ের ধাপে ধাপে মানবসৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগে, অভাব অনটনে, বাঙালিরা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যারা বেঁচে থাকবে তারা হবে মেধাহীন, শিক্ষাহীন, পঙ্গু, অলস, দুর্বল, জ্বরাজীর্ণ, শীর্ণ কায়া, অবহেলিত ও চির লাঞ্ছিত। বাঙালি জাতির ইতিহাসে অনেক জ্ঞানী গুণী খ্যাতিমান দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের জন্ম হয়েছে। সমাজ এবং বিশ্ব তাদের দ্বারা অনেক উপকৃত হয়েছে সন্দেহ নেই।

কিন্তু বাংলাদেশ ব্যতিত গোটা বাঙালি জাতির ভাগ্য উন্নয়নে আজো কেউ সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারে নি। জ্ঞান, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতায় এই জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার মতো কেউ কোন মানানসই ফর্মুলা আবিষ্কার করতে পারে নি। নিজেদের অস্তিত্বের জন্য ভারতের নিষ্ঠুরতার বিরম্নদ্ধে লড়বার মতো কোনো দুঃসাহসী বাঙালি বীরের জন্ম আজো হয় নি। কিছু মৌলবাদীদের আস্ফালনে আর মাড়ওয়ারী পুঁজিপতিদের ভুঁড়ি সর্বস্ব পেট দেখেই চুপসে আছে বাঙালি জাতি।

দিলস্নী, মোম্বাই, লখনৌ, পাটনা এলাহাবাদ ও কলকাতা প্রভৃতি স্থানে আজ তাদের শক্ত ঘাটি। প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জনশক্তি থাকা সত্ত্বেও বাঙালিরা আজ শুধুই অবহেলিত শ্রমিক। রাজনৈতিক ভাবে তারা দিলস্নীর ডা-ার ভয়ে অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছে অন্ধকারের দিকে। পশ্চিম বঙের সমর্থন পুষ্ট কমিউনিষ্ট বাঙালিরা চেঁচামেচি করেও কোনো সুনির্দিষ্ট লড়্যে পৌছাতে পারছে না বরং চরমপন্থী হিসাবে তারা জড়িয়ে পড়ছে সন্ত্রাস আর হত্যায়। এসব কার্যকলাপ দিয়ে কোনো জাতির মুক্তি কখনও সম্ভব নয়।

‘আমরা ভারতীয় এবং কমিউনিজমে বিশ্বাসী’ এমনতর দৃষ্টিভঙ্গীতে আন্দোলন কখনও কৃতকার্য হবে না। নিজেদের ভাষা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদকে অবহেলা করে, মুসলমানদের

অস্পৃশ্য ভেবে, ক্ষুধা চাপা রেখে, অর্থকে দাত চেপে কামড়ে ধরলে জীবন কখনও সুখের হবে না। এসব অভ্যাসের পরিবর্তন করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বোধ্ব হলে মুক্তির সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি।

সুতরাং বৃহৎ বাঙলার জন্য বাঙালির আন্দোলন হবে জাতীয়তা ভিত্তিক এবং তা হতে হবে কমিউনিজম আদর্শের বাইরে। গণতন্ত্রের মধ্যে "সমবায় ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা" এজাতীয় আন্দোলনকে কৃতকার্যতার দিকে নিয়ে যাবে বেশি। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা এবং কমিউনিজম এদুটো'কে পরিহার করতে হবে বুদ্ধি ও বাস্তবতার জ্ঞানে। দুর্নীতির বিরম্নদ্ধে থাকতে হবে ইস্পাত কঠিন বিচার-শক্তি। মালটিকালচারের স্বাধীনতা ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা এ দু'টো ব্যাপার শিখতে হবে ক্যানাডার সমাজ থেকে।

আজ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে বলতে হচ্ছে পশ্চিম বঙের বাঙালিরা অভাবের তাড়নায় কে কত কৃপণ হতে পারে এই যেন তাদের প্রতিযোগিতা। আর বাংলাদেশের বাঙালিরা অভাবের তাড়নায় কে কত দড়িবাজ, মিথ্যুক, ছিনতাইকারী হতে পারে এই তাদের প্রতিযোগিতা। আজকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঠান্ডা এবং স্থির মস্তিস্কে চলছে বুদ্ধিজীবী নিধন। চলছে অবাধ সম্পদ পাঁচার এবং নিজ সন্তানদের নিরাপদ স্থান হিসেবে বিদেশ পাঠিয়ে দেয়ার হিড়িক।

আজকে সারা বিশ্বে বাঙালি জাতির পরিচয় বন্যা খরা এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত একটি জাতি হিসাবে পরিচয়। খুনি, লুটেরা এবং দুর্নীতিতে বারবার অভিশপ্ত চ্যাম্পিয়ান হওয়ার পরিচয়। সুতরাং এই জাতিকে কে বাঁচাবে ? কে রক্ষা করবে সমস্যায় পস্নাবিত বাঙালি জাতির অস্তিত্ব ?

এই জাতিকে বাঁচতে হলে প্রথমেই ভাবতে হবে সে কোন জাতি ? তার ভাষা ও অতীত ইতিহাস কি ? তার ভৌগলিক সীমারেখা কতটুকু ? এই উদ্দেশ্যে সমস্ত বাঙালি জাতিকে একটি শক্তিশালী বাঙালি জাতি হিসাবে ইস্পাত কঠিন ঐক্যে পৌছতে হবে। গড়তে হবে একটি নতুন রাজনৈতিক দল। ঐক্যে এবং অস্ত্রে তাদেরকে হতে হবে বলীয়ান। বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে যদি আরেকটি রাষ্ট্রের উত্থান হয়ে যায় তাহলে সেটা হবে ভারতের জন্য আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ ।

সেজন্য ভারত এই ফন্দি খাটাচ্ছে যাতে করে বাংলা ভাষাভাষী বাঙালির মধ্যে সব সময় একটা হানাহানি ও শত্রম্নতা লেগে থাকে। আর একারণে বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন সীমান্তে দেয়া হয়েছে কাঁটা তারের বেড়া। গরম্ন, পান সুপারি ব্যবসায়ীদের মতো ক্ষুদে

চুনোপুটিদের গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে অথচ ফেনসিডিল ব্যবসায়ী, নারী পাচারকারি কিংবা বড় বড় ব্যবসায়ীদের একগুচ্ছ চুল ছুইতে পারে না, খুতরনাক বিএসএফ।
ইচ্ছাকৃত ভাবে বিভিন্ন নদীর মোহনা ও সীমান্তে সীমারেখার কোন সমাধান করা হয় নি। গরিব ও দিন মজুর বাংলা ভাষাভাষী শ্রমিকদের জড়ো করে জোর পূর্বক সীমান্তের ওপারে পাঠানোর নির্লজ্জ (পুশ ইন) প্রচেষ্টা চলছে অনেক দিন থেকে। বাংলাদেশের বাজারে মাঝে মধ্যে ছাড়া হয় নকল টাকার নোট। (টরন্টো থেকে ২০জানুয়ারী ২০০৫ তারিখে বাংলা নিউজ পত্রিকার ১৩ পৃষ্টায় প্রকাশিত হয়েছে এরকম একটি খবর সীমান্ত এলাকায় জাল নোটের কারবার) প্রায়ই তুচ্ছ কারণে সীমান্তের বাঙালিদের মধ্যে উস্কানি ও বিবাদ সৃষ্টি করে নিরীহ বাঙালিদের করা হচ্ছে হত্যা। হত্যার পর লাশ গুম করে কিডনী, হার্ট, হাড়, চক্ষু, লিভার ইত্যাদি বিক্রির ব্যবসা ও চলছে।

গণতন্ত্রের দাবিদার ভারতে এসবের কোনো বিচার হচ্ছে না। বারবার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও ভারত পানি বন্টনের চুক্তিকে অগ্রাহ্য করছে এবং আন্তর্যাতিক বিধান লঙ্ঘন করে বিভিন্ন নদীতে বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম সমস্যা বহাল রাখছে। শুধু বাংলাদেশের তরফ থেকে নয় খুদ ভারতের বাঙালিরা ও এসবের বিরম্নদ্ধে প্রতিবাদ করে কোনো কুল কিনারা পাচ্ছে না। হাবেভাবে মনে হচ্ছে বাঙালি জাতিকে ঠিক পাকিস্তানিরা যে ভাবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য এবং কমজাত হিসাবে অবহেলা করতো তেমনি হিন্দি ভাষী দিলস্নীর শাসক-গোষ্ঠী বাঙালি জাতিকে একই দৃষ্টিতে দেখছে।

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমরা ভারত সরকারের কাছে যতটুকু ঋণী তারচেয়ে শতগুণে বেশি ঋণী আমাদের প্রতিবেশী বাঙালিদের কাছে। বাঙালি হিসাবে আমরা বাঙালির কাছে আশ্রয় পেয়েছি এবং তাদের সাহায্য ও চেঁচামেচিতে দিলস্নীর টনক নড়েছে। বাঙালি হওয়ার কারণে দিলস্নী প্রশাসন আমাদেরকে সাহায্য করতে বাধ্য হয়েছে। সেদিন প্রশ্ন ছিল না আমরা মুসলিম না হিন্দু। আমরা ওই সময় অনুভব করেছি ব্রিটিশপূর্ব ভারতের বাঙালি। আমরা ছিলাম এক মাতৃভূমির সন্তান, এক ভাষার সন্তান। ব্রিটিশ আমাদের বিভক্ত করে দিয়ে গেছে বাঙালি জাতিকে চিরকাল দুর্বল ও পঙ্গু রাখার উদ্দেশ্যে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যদি প্রতিবেশীরা বাঙালি না হত তা হলে দেখা যেত কত ধানে কত চাল। প্রায় এক কোটি শরনার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে প্রতিবেশী বাঙালি। অস্ত্র, খাদ্য, ট্রেনিং তাদেরই বদৌলতে হয়েছে। যদিও পরবর্তীতে প্রচুর বৈদেশিক সাহায্য ভারতের হাত দিয়ে এসেছে। দিলস্নী তার নিজ স্বার্থসংশিস্নষ্ট রাজনৈতিক সুবিধার কারণে পাকিস্তানের বিরম্নদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তা নাহলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যখন ঢাকার মাটিতে আত্মসমর্পন করে সে সময় বাংলাদেশের বীর মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ওসমানীকে কেন সেখানে ডাকা হয় নি? কেন দিলস্নী প্রশাসন জেনারেল ওসমানীকে ইচ্ছা করে দুরে সরিয়ে

রেখেছিল? কি অপরাধ ছিল এই মুক্তিযুদ্ধাদের? কেন ভারত গণহত্যার বিচার না করে ৯৩ হাজার সৈন্যকে নিরাপদে পাকিস্তানে পাঠাবার চুক্তি করে? কেন এই সমস্ত বর্বর সৈন্যদের জাতীয় কিংবা আন্তর্যাতিক ভাবে কোনো বিচার হয় নি? যদি বিচার হতো তাহলে বাংলার নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের আংশিক দুঃখ লাঘব হতো। রাজনীতির মোড় ঘুরে যেত অন্যদিকে।

সুতরাং দিলস্নী প্রশাসন তাদের সৈন্য ও রসদ হারিয়ে যতটুকু ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল তার সেই ক্ষতি পূরণ হয়েছে আত্ম-সমর্পনকারী সৈন্যদের অত্যাধুনিক অস্ত্র ও গোলা বারুদ পেয়ে। এতদ্ব্যতীত পাকিস্তানের মত চিরশত্রুস্ন একটি রাষ্ট্রকে ভেঙে তার শক্তিকে খর্ব করা ছিল ভারতের বড় বিজয়।

বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাবলী থেকে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানের বিরুস্নদ্ধে ভারত যুদ্ধ করেছে নিজদের অতীত কালের ক্ষোভের বর্হিপ্রকাশ হিসাবে আর (বাঙালি শরনার্থীদের জন্য) মানবিক মুল্যবোধের কারণে। যুদ্ধের পটভূমি অতীত বর্তমান সবকিছু পর্যালোচনা শেষে এই সত্যটি অতি সহজেই অনুধাবন করা যায় ।

বাঙালির জন্য বাঙালির দরদ ছিল, স্নেহ এবং সহানুভুতি ছিল, যার ফলে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার সুযোগ হয়েছিল তাড়াতাড়ি। কিন্তু আজ বাঙালির সেই জাতীয়তাবোধ ও মমত্ববোধ কোথায় গেল ? আজ এই সত্য হারিয়ে গেছে কুচক্রী বাংলাদেশ ও ভারতের একটি বিশেষ গোষ্ঠীর হাতে। তারা ধর্মের নামে এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের নামে রাজনীতির মুখোশ পরে বাঙালি জাতিকে চিরতরে পঙ্গু ও নিঃস্ব করার পায়তারা করছে।

বাঙালিরা যাতে একত্রিত হয়ে একই জাতীয়তার ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র গঠন করতে না পারে এজন্য বাংলাদেশের কিছু ভারতীয় এজেন্টরা গভীর ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। একারনে তারা বাঙালিদের মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই জাতির ধর্মীয় পার্থক্য দেখিয়ে সব সময় ভারতের বিরুস্নদ্ধে নানাবিধ অপপ্রচার চালাচ্ছে ।

এতে ভারতের বাঙালিরা দুঃখ পেলেও দিলস্নী প্রশাসন খুব খুশি। কারণ দিলস্নী চায় না বাঙালিরা একতাবদ্ধ হোক। এই অপপ্রচারকারীরা তলে তলে ভারতের সাথে অবাধ গুপ্ত বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। বড় বড় ব্যবসা ছাড়াও চাল ডাল থেকে শুরুস্ন করে যন্ত্রপাতি কাপড় চিনি ইত্যাদির ব্যবসা গোপনে করে যাচ্ছে আর বাংলাদেশের তৈরি পণ্যদ্রব্য অবিক্রিত অবস্থায় নষ্ট হচ্ছে।
এই বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিরুস্নধি ধর্মীয় মুখোশ পরা মিথ্যুকরা ভারতের গরুস্ন দ্বারা ঈদের উৎসব পালন করে, আর হোটেল রেস্টুরেন্টে গোমাংশের চালান দেয়। তারা এভাবেই

জনগণকে ধোঁকা দিয়ে রাজনীতি করে। তাদের অনেকের বাপ দাদারা পাকিস্তানি আমলে মুসলীম লীগ নামে রাজনৈতিক দলের ছায়াতলে অবস্থান করে গরিব হিন্দুদের উচ্ছেদ করে সম্পত্তির মালিক হয়েছে।
অতএব এখন আবার যদি বাঙালি জাতীয়তাবাদ পুনরুত্থিত হয়ে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে একটি রাষ্ট্র হয়ে যায় তাহলে বাপ দাদার জবর দখলি ভূসম্পত্তি ফেরত দিতে হবে, এই আশঙ্কায় তারা আজীবন ভারত বিরোধিতাকে রাজনীতির প্রধান অংশ হিসেবে বেছে নিয়েছে।

বর্তমান সরকারের দুর্নীতির অন্ত নেই। এক কালে আওয়ামী লীগও বহু দুর্নীতির শিখরে উঠেছিল এবং তাদের পতন ও হয়েছে সন্দেহ নেই। আজ বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দলের উপর আমাদের আস্থা নেই। তাই বাঙলাদেশের বাঙালিরা চায় নতুন রাজনৈতিক দল, নতুন যুবশক্তি আর প্রবাসে দীর্ঘদিন থেকে যারা সততা, ন্যায় বিচার ও গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা দেখেছে তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা।

আজ বাঙলাদেশের রাষ্ট্র ও জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করে যারা এলিট শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়েছে। তারা যদি তাদের এলাকায় এক কোটি টাকা খরচ করে কিছুটা উন্নয়ন ঘটায় তবে সেই এলাকার জনগণ সেই লোকটিকে বার বার ভোট দেবে। সে টাকার বিনিময়ে সন্ত্রাসী লালন করতে পারবে এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য বোমাবাজ ও সন্ত্রাসী লেলিয়ে দিতে পারবে। অতএব দেখা যাচ্ছে সম্পদ এবং ক্ষমতা এ দুটোই সকল অপরাধের জন্য দায়ী।

অতএব বাঁচতে হলে সোজা রাস্তা হলো এই দুর্নীতি পরায়ন গডফাদারদের নির্মূল করা। আজ বাঙালি জনগণ শুধু চেয়ে চেয়ে এসব দেখছে। এসবের বিরুদ্ধে প্রতিকার ও সসস্ত্র প্রতিবাদ করার কোনো বিশ্বস্ত পস্ন্যাটফর্ম নেই। নেই আত্মরক্ষার কোনো হাতিয়ার। অস্ত্র সজ্জিত পুলিশ এবং সেনাবাহিনী ওই সবের বিরুদ্ধে কিছুই করছে না। তারাও লুটপাট সম্পদের ভাগীদার হচ্ছে। বখরা এবং চাঁদা আদায়ের জন্য প্রকাশ্য এবং নেপথ্য উভয় রাস্তাই তারা অনুসরণ করছে।

আজকের বাঙালি জাতিকে বাঁচতে হলে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি সত্য সুন্দর সমৃদ্ধশালী দেশ উপহার দিতে হলে বৃহৎ বাংলা গঠন ছাড়া কোনো বিকল্প রাজনীতি নেই। বাঙলাদেশের বাঙালিদের উচিত এই নেতৃত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবার। বাংলা ভাষাভাষী অন্য অঞ্চলগুলোকেও এই লক্ষ্যে পৌছবার জন্য উচিত সকল প্রকার সহায়তা দান।

বাঙালি জাতির অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে হলে এবং বহুমুখী শোষণের নাগপাশ থেকে বাঁচতে হলে বাঙালিকে অবশ্যই কৌশলগত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। ভারত সব সময় চাইবে বাঙলাদেশ থেকে বিভিন্ন সুবিধা আদায় করে নিতে। বাঙলাদেশের পুর্বাঞ্চলে রয়েছে ভারতের সমস্যা।

ভারত চায় সেখানকার রাজ্যগুলোতে স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীদের দমন করতে। সেই সমস্ত রাজ্যের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করতে। আর ওই সমস্ত এলাকার প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ সমুহ রাজনীতির নামে লুটপাট করে পশ্চিমের রাজ্যগুলোকে কসমোপলিতান নগর হিসাবে গড়ে তুলতে।

তাই তারা জল স্থল ও বিমান পথে ট্র্যানজিট চায়। চায় আরও বহু সুবিধাদি। কিন্তু বাঙলাদেশ কিছু চাইলেই ভারত এমন ধরনের ভাব দেখায় ঠিক যেন চাকর মনিব সম্পর্ক। ইউরোপীয় দেশগুলোতে কিংবা আমেরিকা-ক্যানাডায় যেভাবে দেয়া নেয়া (গিভ এন্ড টেইক) সম্পর্ক রয়েছে সেরকম উদার সম্পর্ক ও মনোভাব তৈরি হতে হলে ভারত ও বাঙলাদেশের রাজনীতিবিদদের সময় নেবে কমপক্ষে তিনশত বৎসর।

অতএব বাঙালি জাতিকে সঠিক ভাবে কিছু করতে হলে ধর্মীয় দ্বিজাতি তত্ত্বকে ভুলতে হবে। ভুলতে হবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে। অগ্রসর হতে হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উপর ভিত্তি করে। রাজনীতির নেতৃত্বে যাবার আগে ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ও পরিকল্পনাকে একটি সাংবিধানিক কাঠামোতে আনতে হবে। থাকতে হবে একটি দিক নির্দেশনা ও লক্ষ্য পুরণের পূর্ণাঙ্গ এবং প্রকাশ্য পুস্তক দলিল। এই দলিল ভিত্তিক সবকিছুই হবে সুসংগঠিত।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি যার যেটা বর্তমান আছে সেভাবেই থাকবে। ভবিষ্যতে কি হবে সেটা রাষ্ট্র নির্ধারণ করবে। অতীতের জবর দখল এজাতীয় অজুহাত তুলে কেহ কাহারো সম্পত্তি জোর দখল করতে চাইলে তার শাস্তি বিধান যাবজ্জীবন কারাদ- রাখা জরম্নরি, কেননা ঢিলে ঢালা আইনে বাঙালির দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। অতএব (১) বাঙালি জাতীয়তা (২) বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা (৩) নিজ নিজ ধর্মীয় স্বাধীনতা (৪) গডফাদারহীন গণতন্ত্র (৫) এবং প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ এই পাঁচটি স্তম্ভকে রাষ্ট্রের আদর্শ হিসেবে মুল্যায়ন করতে হবে সর্বাগ্রে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাঙালি রাজনীতিবিদরা যদি অগ্রসর হতে পারেন তবে বাঙালির ভবিষ্যৎ মুক্তির আশা করা যায়।

১২ ♦ একটি অপুরণীয় ক্ষতি ♦

বাংলাদেশের স্থপতি শ্রদ্ধেয় শেখ মুজিবুর রহমানের মুল্যায়ন ক্ষুদ্র পটভূমিতে লিখা একটি দুঃসাধ্য কাজ। তাঁর জীবনের কর্মকা-কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিচার বিশেস্নষণ করে লিখতে গেলে যেসমস্ত টুলস বা উপকরণের প্রয়োজন তার অনেকটা আমার নাগালের বাইরে। বিদেশের মাটিতে বসে তা সংগ্রহ করা এমনিতেই কঠিন। এমনকি স্বদেশের মাটিতে ও তন্ন তন্ন করে তা সংগ্রহ করা সহজ নয়। শেখ মুজিব যদি স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে ২৫ মার্চের রাতে পালিয়ে যেতে পারতেন তাহলে স্বাধীনতা সংগ্রমের পরিণতি কি হতো আমরা আন্দাজ অনুমান করে যা-ই বলিনা কেন, চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি তার কোনো নিশ্চয়তা পাওয়া যেত না।

তদ্রুপ তিনি ওই রাতে মারা গেলে জাতির ভবিষ্যৎ এবং জাতীয়তাবাদের কি হতো তা ও আমরা কেউ জানতাম না। কারণ "যুদ্ধ এবং রাজনীতি" অনেকটা দাবা খেলার মতো। কেউ নিশ্চয়তা দিয়ে সঠিক ভবিষ্যৎ বলতে পারে না। শেখ মুজিব বন্দী হয়ে পাকিস্ত্মানের কারাগারে চলে যাওয়াতে বাঙালির পরিণতি যা হবার, আমরা তা প্রত্যক্ষ ভাবে ভোগ করেছি। তিনি যদি পালাতেন এবং সঙ্কট অন্যদিকে মোড় নিত, তাহলে বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী নয় এমন জনগোষ্ঠী বা রাজনীতিবিদরা বলতো, 'শেখ মুজিবের উচিৎ ছিল পাক সেনাদের কাছে আত্মসমর্পন করা, তাহলে এত মানুষ মারা যেত না'।

তিনি জাতিকে যুদ্ধের ময়দানে ঠেলে দিয়ে ভীরম্ন পুরম্নষদের মতো নিজের প্রাণ রক্ষা করেছেন। আর আত্মরক্ষার তাগিদে দেশে দেশে সাহায্য চেয়ে জনগণের চোখে ধুলো দিচ্ছেন। না হয় বলা হতো 'তিনি প্রতারণা করে জাতিকে ভারতের সাথে যুক্ত করে একটি পুতুল সরকার হতে চেয়েছেন, এটাই তার কাম্য ছিল'।

যদি মারা যেতেন তাহলে বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী জনগণ তাকে চিরস্মরনীয় নেতা হিসেবে বরণ করতো। কিন্তু বিরোধি পাকিস্ত্মানি সমর্থকরা নিশ্চয়ই বলতো দেশ ও জাতি গণহত্যা ও রক্তপাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। আমরা যেভাবে ছিলাম সেভাবে পাকিস্ত্মানি হয়ে থাকবো সেটাই ভাল। অতএব ঐ দিনটি জাতীয় মুক্তি দিবস হিসেবে তারা পালন করতো।

মোট কথা ফুটবলের দর্শকের মতো বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্মব্য করা হতো। এভাবে পৃথিবীর কোন মহৎকামী লোকই সমালোচনার উর্ধে থাকেন না। তাঁর ভালমন্দ দিয়ে তাকে যাচাই করা হয়। যদি দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি ভাল পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং

অনেক ভুল ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মোটামুটি জনগণের আস্থাভাজন হয়েছেন। তাহলে তিনি চিরকাল সে জাতির শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে পরিগণিত হন।

বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আমরা প্রাধান্য যা-ই দিয়ে থাকি না কেন আমাদের অতীত ইতিহাস ও জাতীয় চরিত্র মুসলমান হিসাবে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বিশ্বের চোখে বিবেচিত ছিল। ইহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, আমরা কারো বন্ধু নই। সত্যিকথা বলতে গেলে আমরা অন্যান্য কোনো জাতিকেই উদার মনে দেখি না। তাদের হাতের রান্না খেতে পারি না। তাদের কালচারকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে গ্রহণ করি না, বন্ধুত্ব ও করি না।

মধ্যপ্রাচ্যের মতো আমাদের তেল নেই, এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো সোনার খনিও আমাদের নেই। নেই জাপান কিংবা জার্মানের মত কারিগরী মেধা কিংবা শিক্ষা। সুতরাং বিপদে আপদে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ানোর মতো ভারত এবং একই ভাষাভাষী বাঙালি ব্যতীত প্রকৃত বন্ধু কেউ ছিল না।

এছাড়া যারা বন্ধু হয়ে আসবে তারা আমাদের কৃতজ্ঞতার দায়বদ্ধতায় আবদ্ধ করে নিজেদের স্বার্থকে ভবিষ্যতের পুঁজি হিসাবে বিনিয়োগ করে আসতে চাইবে। যেমন করে একজন ধনী লোক কোনো এলাকায় অনাবাদী পতিত জমি খরিদ করে, ভবিষ্যতে তা থেকে মুনাফা পাওয়ার আশায়। সুতরাং শেখ মুজিব ২৫শে মার্চের রাতে পালিয়ে বাইরে গিয়ে সাহায্য চাইলেই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো কিংবা মুসলিম দেশগুলো আমাদেরকে সকল গণহত্যা, রক্তপাত বা বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করে স্বর্গীয় শান্তি দান করতো, এমন আশা বা কল্পনা অবাস্তব।

কি অবস্থা হয়েছে বসনিয়ার? কি অবস্থা হচ্ছে কাশ্মীর, চেচনিয়া, টিমুর, কুর্দিস্থান, শ্রীলঙ্কার তামিল কিংবা এমনি বহু স্বাধীনতাকামী জাতির ? একটি দেশের সাহায্য সমর্থন ইত্যাদির জন্য দেশের রাজনীতিবিদদের বৈঠক, মিটিং মিছিল, যোগাযোগ, মতামত, ইত্যাদির সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসতে যে সময় ক্ষেপণ হয় এর মধ্যে বিপদমান দেশটির পুরো বারোটা বেজে যায়। সেই সাহায্য এবং সমর্থন সময় উপযোগী কোনো কাজে লাগেনা বরং নির্যাতিত জাতিটি শক্তিমান রাষ্ট্রের প্রস্তাবে মাথা নত করে জ্বী হুজুর বলা ছাড়া আর কিছু করতে পারে না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন চরিত্রকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম চরিত্রে তিনি বলিষ্ট সংগ্রামী রাজনৈতিক নেতা, দ্বিতীয় চরিত্রে প্রশাসনিক নেতা। প্রথম দিকটির বিচারে তিনি বাংলাদেশের বাঙালি জাতির আকাশে এক উজ্জল নক্ষত্র। হাজার বৎসরের মধ্যে বাঙালির এক জাতীয় বীর এবং অবিসংবাদিত নেতা। বাঙলা ও বাঙালি যতদিন বেঁচে

থাকবে ইতিহাসের পাতায় ও সারা বিশ্বে তাঁর নাম ততদিন লিখা থাকবে। দ্বিতীয় দিকটির বিচারে শ্রদ্ধেয় শেখ মুজিব ছিলেন একজন সংকটের বেড়াজালে পতিত শাসক।

স্বাধীনতার সোনার সূর্যকে হাতে পাওয়ার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল, তিনি তার জীবনের রাজনৈতিক মাল মসলস্না থেকে জাতিকে সেই নেতৃত্ব দিয়েছেন। এজন্য রাজনৈতিক জীবনে তার সকল দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ তিতীক্ষাকে বাঙালিরা হৃদয় দিয়ে বুঝতে পেরেছে ও তাঁকে জাতির মুক্তি নায়ক হিসাবে বেছে নিয়েছে। বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনকে স্বাধীনতার আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে তিনি যেমন সফল হয়েছেন তেমনি ত্রিশ লক্ষ (মতান্তরে তেরো লক্ষ) শহীদের রক্তস্নাত স্বাধীন দেশকে তার হাতে তুলে দেয়ার পর তার প্রতিশ্রুত সোনার বাঙলা গড়তে যেয়ে তিনি ভুল পথে পরিচালিত হয়েছেন।

এর পেছনে অনেক অনুদঘাটিত কারণ রয়েছে। যা আজকাল অনেক সাংবাদিক ও লেখকদের বই পুস্তক থেকে গ্রহণযোগ্য তথ্য ও ধারালো যুক্তি সহ বেরিয়ে এসেছে। ("মুক্তিযুদ্ধের আগে ও পরে" "তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা" "বাংলাদেশের গণতন্ত্র" "বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকা- " ইত্যাদি বইগুলো দ্রষ্টব্য)।

সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে ব্যাঙ্ক বীমা ইন্ড্রাষ্ট্রি ইত্যাদি জাতীয়করণ করার ফলে প্রতিদিন পাটের গুদামে আগুন কারা ধরিয়ে দিয়েছিল ? কারা ইন্ড্রাষ্ট্রির কলকব্জা ধ্বংস করে লুটপাট করেছিল ? কারা অবৈধ ভাবে পাকিস্তানি আমলের খাস সম্পত্তি ও শত্রম্ন সম্পত্তি দখল করে তার মালিক হয়েছিল ? কারা অর্থনীতিকে ধবংস করার জন্য বারে বারে জাল মুদ্রা ছাপিয়ে ব্যাংক ও অর্থনীতির বারোটা বাজিয়েছিল?

স্বাধীনতার পরপর যেসমস্ত রাস্তাঘাট তথা যোগাযোগের সমস্যা হয়েছিল তা কি রাতারাতি ঠিকটাক করা সম্ভব হয়েছিল ? শ্রদ্ধেয় শেখ মুজিব কি ভাষণ দিয়ে জনগণকে ওই সব সর্বনাশ করার জন্য আহ্বান করেছিলেন ? আমরা স্বীকার করি আওয়ামী লীগ যেহেতু ক্ষমতায় ছিল এজন্য সকল দোষ তাদের ঘাড়ে পড়বে সন্দেহ নেই।

কিন্তু তাই বলে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রত্যেকটি মানুষ ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ এজন্য ১০০ ভাগ দায়ী হিসাবে যারা মন্তব্য করেন তাদের মগজে নিশ্চয়ই সাধারণ বিবেকের প্রচ- অভাব ছিল এবং আজো আছে । ১৯৭৩ এর মুদ্রাস্ফীতি ও ১৯৭৪ এর দুর্ভিক্ষ শুধু যুদ্ধ বিধ্বস্ত বা দুর্নীতির কারণ নয়। ১৯৭৩ সালের ৬ অক্টোবরে সংগঠিত হয় আরব ইসরাইলের যুদ্ধ। (ইয়ম কিপুর যুদ্ধ) একদিকে ইসরাইল অপরদিকে মিশর ও সিরিয়া। মিশর ও সিরিয়াকে সৈন্য এবং অর্থ দিয়ে সহায়তা করে ইরাক,ইরান, জর্ডান, প্রভৃতি দেশ।

উপায়ান্তর না দেখে আমেরিকা এবং গ্রেটবৃটেন অর্থ এবং তৎকালীন সময়ের অতি আধুনিক অস্ত্রের যোগান দিয়ে ইসরাইলকে রক্ষা করে।

ইসরাইল এই যুদ্ধে সিনাই ও গোলান এলাকা দখল করে। এই যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আরব দেশগুলো তাদের তৈল উৎপাদন ও বিক্রির উপর আমেরিকা সহ সমর্থনকারী দেশগুলোর উপর এম্বারগো বা জরুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এর ফলে হঠাৎ তেলের মুল্য বর্ধিত হয়। যার ফলে বিশ্বের অনেক অনুন্নত রাষ্ট্র তার পরিকল্পিত অর্থনীতি ও বিশ্ব বাণিজ্যে মার খায়। নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের পঙ্গু অর্থনীতিতে এর প্রভাব ছিল আরও কয়েকগুণ মারাত্মক। ১৯৭৪ এর দুর্ভিক্ষের জন্য আমরা সহজেই একটি সরকারকে দায়ী করতে পারি খুব সহজে কিন্তু প্রতি বৎসর বঙ্গোপোসাগরের উপকুলে ঘুর্ণিঝড়ে যে হাজার হাজার মানুষ মারা যায় তার জন্য আমরা কিছুই করতে পারি না।

আলস্নহার কাছে কেবল কান্নাকাটি করি ও ছবর করে বসে থাকি। এমনকি উত্তর বঙ্গে যখন মঙ্গায় হাজার হাজার মানুষ মারা যায় তখন মন্ত্রী, মিনিস্টার, ভূমি দস্যু, জলদস্যু ও বনখেকো দানবগুলো সম্পদের পাহাড় গড়তে থাকে দেশে বিদেশে। এদেরকে তো কেউ হত্যা করতে দেখি নি। অথচ যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ও অতীত অভিজ্ঞতাহীন আওয়ামী প্রশাসনের কর্ণধার শেখ মুজিবের বংশ উজাড় করার জন্য নির্লজ্জ এবং অকৃতজ্ঞ বাঙালিরা যে কলঙ্কের ইতিহাস তৈরি করেছে সেই ইতিহাস কোনদিন মুছবে না।

ঠিক একই ভাবে ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসাবে মেনে নিলে নিশ্চয় কোনো অপরাধ হতো না এবং এ দুর্ভিক্ষ দেশের কয়েকটি জেলায় হয়েছিল সর্বত্র হয় নি। যাইহোক অপরদিকে আভ্যন্তরীন দুর্নীতিতে গাজী গোলাম মোস্তফা তৎকালীন টিসিবির আওতায় সমুদয় মালামালের একচ্ছত্র নায়ক হয়ে বসেন অথচ রাজধানীতে তখন কাফন ছাড়াই গরিব মানুষদের লাশ দাফন হচ্ছিল। এতে ধর্মের প্রতি সংবেদনশীল মানুষেরা অত্যাধিক হতাশ হয়ে পড়ে।

অপর দিকে শেখ সাহেবের আপন পুত্র শেখ জামাল, শেখ কামালও ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনির বিরম্নদ্ধে প্রতারণা, দুর্নীতি, নারী কেলেঙ্কারী ও ব্যাংক ডাকাতির গুজব ছড়িয়ে পড়ে। এর সবটা সত্য না হলেও কিছুটা যে মিথ্যা নয় তা শেখ মুজিব বুঝে উঠতে পারেন নি। তার চারপাশে যে চাটুকারদের দল ছিল, তারা শেখ মুজিবকে বলেছে "কী যে বলেন স্যার ! আপনি এত বড় নেতা, আপনার কথায় যে দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ রক্ত দিয়েছে অথচ আপনার ছেলে ভাগ্নেরা আপনার ইজ্জত মারবে এটা আপনি কোন যুক্তিতে বিশ্বাস করেন ? তারা অবুঝ ও নয় পাগল ও নয়।

তাদের বিরম্নদ্ধে যারা বলছে ওরা হচ্ছে স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার, আলবদর, নিজেদের গা বাঁচাবার জন্য পায়তারা করছে বুঝেন না ? এহেন যুক্তিবাদী কথায় শেখ মুজিব বিশ্বাস স্থাপন করেন। বিশ্বাস স্থাপান করাটাই স্বাভাবিক। কথাগুলোর মধ্যে যথেষ্ট ধারালো যুক্তি ছিল। যদি বাঙালী জাতির দেশ চালানোর পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতো তা হলে হয়তো এমন যুক্তির পরও শেখ সাহেব আরও গভীর তদন্ত করতেন। এরপর নায্য মুল্যের অনেক দ্রব্যাদির সুষ্টু বন্টন হয় নি, একই ব্যক্তি বহু নামে কার্ড বের করে নিজেদের স্বার্থ আদায়ে ব্যস্ত থাকে।

অপর দিকে ডিলারগণ নায্যমুল্যে তা বিতরণ না করে তা কালোবাজারে বিক্রি করে পয়সা লুটতে থাকে। অনেক সন্ত্রাস ও দুর্নীতিবাজরা ধরা পড়া সত্ত্বেও মন্ত্রী মিনিষ্টারদের টেলিফোনে তারা মুক্ত বিহঙ্গের মত সামাজিক জীবন যাপন করে। এটা শেখ মুজিবের একক কোনো দোষ নয়, দোষ মন্ত্রীদের, যাদের ভিতর আজও দেশপ্রেম নেই। (আজকে দীর্ঘ ৩৮ বৎসর পরও বাঙালির এমন চরিত্র বদলায় নি তা কাগজে কলমে প্রমাণিত হয়ে গেছে) যাইহোক তৎকালে ওই সমস্ত খবরা খবর শ্রদ্ধেয় শেখ মুজিবের কানে সরাসরি পৌছায় নি।

পৌচেছে নানা রঙে নানা মোড়কে এবং এর প্রতিকার হচ্ছে বলে বিভিন্ন তৈরি করা কাগজ পত্র ও তাকে দেখানো হয়েছে। সুতরাং শেখ মুজিব নিজেই প্রতারিত হয়েছিলেন তার প্রশাসনের লোক দ্বারা। যেমন করে আজকাল একজন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা ফাষ্টক্লাস ম্যাজিষ্ট্রেট নিজ অফিসের চাপরাসীর দ্বারা প্রতারিত হন।

ম্যাটিষ্ট্রেটগণ অনেক সময় বলতে পারেন না তাদের সীল চাপ্পড় কোথায় ব্যবহার হচ্ছে এবং তাদের স্বাক্ষর কিভাবে কে নকল করছে ? এভাবে বিভিন্ন কারণে আওয়ামী প্রশাসনের প্রতি মানুষের অবজ্ঞা ও ঘৃণা উত্তর উত্তর বাড়তে থাকে। কিন্তু সবাই আশা করছিল তিনি এসবের বিরম্নদ্ধে জেহাদ করবেন। কিন্তু **মানুষতো জানে না তার ভেতরে জেহাদের হুঙ্কার থাকলেও জেহাদের তরবারি তার হাতে ছিল না।** একদিকে যেমন ভেতরে ভেতরে সেনাবাহিনীরা ছিল দ্বিধা বিভক্ত। তেমনি অপর দিকে বিভিন্ন উপবাহিনীর সৃষ্টিতে তিনি হয়েছিলেন চোখের বালি।
দেশে ছিল বেআইনী অস্ত্র (১৬ ডিসেম্বর ৭১এর পর, দেশের সমস্ত থানা থেকে উধাও হয়ে যাওয়া পাকিস্তানি অস্ত্র এবং মুক্তিযোদ্ধাদের একাধিক অস্ত্র যা ব্যবহার হয়েছিল ডাকাতিতে সন্ত্রাসে, ছাত্র রাজনীতিতে) অপরদিকে জাসদের জঙ্গীয় উত্থান, সিরাজ শিকদারের মতো ব্যক্তি বিশেষের রাষ্ট্রদ্রোহী বক্তব্য এবং দলের নামে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ছিল মারাত্মক হুমকি। মৌলানা ভাসানীর মতো মানুষের সহযোগিতার বদলে প্রকাশ্য বিরোধিতা এবং হুশিয়ারি সব মিলে শেখ মুজিব ছিলেন চরম সংকটে। এ সংকট ভাষা দিয়ে বুঝাবার মতো নয়। অনেক বুদ্ধিজীবি তাকে নিয়ে চটুল মন্তব্য করেছেন। শেখ মুজিব খল নায়ক, নটরাজ ইত্যাদি।

বিরম্নদ্ধবাদীরা শেখ মুজিবের এমন অসহায় অবস্থাকে মোটেই জ্ঞান-গভীরতার দৃষ্টিতে যাচাই করে দেখেন নি। কিংবা সত্যিকারের দরদ ও ইমান নিয়ে দেশ গড়ার কাজে কেউ সহয়তা করে নি। যুদ্ধাপরাধিদের বাঁচাবার জন্য তারা নিজ থেকেই নানা সতর্কতার সাথে আত্মরক্ষা করে চলেছে আর গোপনে ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছে। শত্রম্নকে কখনও দুর্বল ভাবতে নেই, এই নীতিতেই তারা কালো পথে হেঁটেছে আর সহায়তা পেয়েছে পাকিস্ত্মান রাষ্ট্রের।

অথচ সহজ সরল শেখ মুজিব তাদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা দিয়ে যে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন (একবিংশ শতাব্দিতে) এমন উদারতার পরিচয় নবী মুহম্মদের উদারতার চেয়ে ও উজ্জল। তিনি আশা করেছিলেন সবার সহযোগিতায় দেশটা গড়তে পারবেন। কিন্তু শত্রম্নরা শেখ মুজিবের এহেন সাধারণ ক্ষমাকে রাজনীতির দাবার চাল মনে করে তারা তাদের সিদ্ধান্তে অটল থেকেছিল।

শাসক হিসেবে শ্রদ্ধেয় শেখ মুজিব ছিলেন অতিশয় সরল এবং আত্মভোলা ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর শাসনামলে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছিল। তিনি স্বাধীনতা বিরোধিদের দমন করেন নি কিংবা মুচলেখায় দায়বদ্ধ করেন নি। আওয়ামী লীগের **প্রচুর নেতা কর্মীরা** দু'টি দোষে দোষি ছিল। এক: তাদের মুখের ভাষা ও বাইরের মোড়ক ছিল আওয়ামী লীগের মোহরে সীলবদ্ধ।

কিন্তু তাদের অন্তর ছিল ধর্ম ও পাকিস্ত্মানি অনুরাগে রঞ্জিত। এই দু'য়ের মধ্যে লালিত ছিল দেশপ্রেমহীন সম্পদ গড়ার দুর্বার বাসনা। অপর দিকে বাংলাদেশের **অভিজাত বা এলিট শ্রেণীর** এক বিশেষ অংশের **স্বার্থ ক্ষমতা ও দ্বন্দ্বের দিকটা** বঙ্গবন্ধু বা তার দলের কেহই উন্মোচন করতে পারেন নি।

আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, উর্ধ্বতন আমলা ও কর্মচারীদের কোনো আধুনিক ব্যবস্থাপনার ট্রেনিং বা নতুন দিক নির্দেশনার ব্যবস্থা করেন নি বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের স্থায়ীপদ ও স্বার্থের বিপরীতে কাজ করেছেন। যার ফলে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। পররাষ্ট্র নীতি এবং বিশ্ব বণিক গোষ্ঠীর ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যবাদীতা সম্বন্ধে মুজিব প্রশাসনের ধারণা সুস্পষ্ট ছিল না।

যার ফলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর পলিসিতে শ্রদ্ধেয় শেখ মুজিব সুবিধা করতে পারেন নি। এরকম হওয়াটা স্বাভাবিক, বিশ্বের অনেক গরিব দেশ সেভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কিন্তু

বংলাদেশের মানুষের তা বুঝে উঠার শক্তি ছিল না বা মেনে নেওয়ার মত ধৈর্যও ছিল না, আজো নেই, ভবিষ্যতে ও হবে কি না সন্দেহ আছে।

এটাই বাঙালির জাতীয় মিশ্র চরিত্র। ১৯৭৩ সালে আমেরিকার চক্ষুশূল রাষ্ট্র 'কিউবা'তে' যখন সাহায্য ও বন্ধুত্বের প্রতীক হিসাবে কয়েক টন চা পাঠানো হয়েছিল তখনই আমেরিকার নিক্সন প্রশাসন মনের তীর্যক দৃষ্টিতে শেখ মুজিবের প্রতি বিরাগ-ভাজন হয়ে পড়েছিল।

যাইহোক যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশের অর্থনীতি, উৎপাদন, বন্টন, বাজার ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে ব্যাংকের ভূমিকা সমন্ধে দেশের ব্যবসাজীবি ও প্রচলিত প্রশাসনের বিশেস্নষণ মুলক ধারণা ছিল কম। যে কারণে দেশের সর্বত্রই অবাধ দুর্নীতি ও চোরাচালানিতে ভরপুর হয়ে যায়। **দেশের মানুষ দেশপ্রেমিক ও সমাজসেবী না হলে একজন রাষ্ট্রপ্রধান একা কিছুই করতে পারেন না,** আওয়ামী প্রশাসন তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

অবশ্য বাঙালি হিসাবে বিশ্বের বুকে এটাই ছিল প্রথম একটি দেশ, যেখানে ঔপনিবেশিক আদলে গড়া একটি জাতি কোন অভিজ্ঞতা ছাড়াই রাষ্ট্র পরিচালনার মতো একটি কঠিন কাজে নেমে পড়ে এবং কোথাও কোনো সুবিধা করতে না পেরে নিজের জাতিকে অত্যাচার, লুট ও শোষণ করতে থাকে। এই নিঃস্ব অবস্থা থেকে আওয়ামী প্রশাসন আরও অন্ধকারে ডুবে যায়।

এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা, জনগণের বাক-স্বাধীনতায় ছুরি চালানো এবং শাসনতন্ত্রে সংশোধনী এনে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এতে তাঁর অতীত রাজনৈতিক জীবনের চরিত্রকে তিনি নিজ হাতে মসীলিপ্ত করেছেন বাধ্য হয়ে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। এসবের পেছনে আমরা একটি কারণ স্পষ্টই দেখতে পাই, আর তা হলো বিরোধি দল এবং পাকিস্তানি প্রেমিকদের অতিমাত্রায় মিথ্যাচারিতা, তিলকে তাল করার নাটক, পরম মিথ্যা দিয়ে জাতিকে ক্ষেপিয়ে তুলা ও বিভ্রান্তির ঘোলাজলে নিজেদের হিংসাকে চরিতার্থ করা।

যার ফলশ্রুতিতে আওয়ামী সরকার এই হঠকারি পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়। এভাবে দেশপ্রেম হয় না হিংসা প্রেম হয়, একারণে এসমস্ত ভুলের জন্য বিরম্নধি দল সহ সমস্ত পাকিস্তান-প্রেমী দলগুলো ও নিঃসন্দেহে দায়ী। অপর দিকে আরেকটি ব্যাপার আলোচনা করলে যে ভুল বা অসংলগ্নতা ধরা পড়ে তা হচ্ছে **অতি অল্প সময়ে বাংলাদেশের জন্য যে সংবিধান রচনা করা হয়েছিল, বহুমুখী অগ্রগতির জন্য তা স্বয়ংসম্পুর্ণ ছিল না।**

যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের চারিদিকে যখন সঙ্কট তখন শ্রদ্ধেয় শেখ মুজিব নিজে পদত্যাগ করে অন্যত্র ক্ষমতা হস্তান্তর করার মতো যোগ্য কোন রাজনৈতিক দল ও ছিল না। শেখ

মুজিবের আত্মবিশ্বাস ছিল তার দল যেহেতু নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্টতা অর্জন করেছ সেজন্য তিনি যা করতে ইচেছ করবেন সব বাঙ্গালী এতে সম্মতি দেবে। যে দুর্নীতি ও দুর্ভিক্ষ চলছে তা যুদ্ধ-বিধ্বস্ত একটি দেশের জন্য স্বাভাবিক এবং এই সঙ্কট উত্তরণে বেশ কিছু সময় লাগবে, এ ব্যাপারটি তারা জনগণকে ভালভাবে বুঝাতে সক্ষম হয় নি।

সুতরাং রাজনৈতিক দল জাসদ ও মৌলানা ভাসানী এই শিশু রাষ্ট্রটিকে গড়ার কাজে সাহায্য না করে চরম বিরোধিতা করতে থাকেন। আওয়ামী প্রশাসন তা পাত্তা দেয় নি এবং এই সঙ্কট উত্তরণের চেষ্টা করেও তারা সামাল দিতে পারে নি। ব্যাপারটি সবাই বুঝতে ছিলেন কিন্তু প্রকৃত সমাধান কারো জানা ছিল না। না ছিল জাসদের না ছিল মৌলানা ভাসানীর। চিরাচরিত নিয়মের মতো তারা কেবল বিরোধিতাই করেছেন।

অপরদিকে জাতীয়করণের ঠেলায় বিরোধিরা শিল্প কারখানায় আগুন ধরিয়ে দেশকে আরও বিরান করতে থাকে। অর্থনীতি আরও ভেঙ্গে পড়ে। এই সঙ্কটময় সত্যকে অনুধাবন করে আওয়ামী লীগের এক দলীয় ব্যবস্থাকে অনেকে মনে মনে সমর্থন দিয়েছে। কিন্তু প্রকাশ্যে সমর্থন দিতে এগিয়ে আসে নি। ভাবখানা ছিল এই, দেখা যাক কি হয়। আর এসব দুর্বলতাকে সম্বল করে রাজনৈতিক বিরোধিরা গান্দারের মতো গুটি গুটি পায়ে সেনাবাহিনীর দ্বারস্থ হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ষড়যন্ত্রটি ক্যান্টনমেন্টে ঘুরপাক খেতে থাকে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে; দেশের এহেন অবস্থার জন্য শুধু একটি দলই দায়ী নয়, দায়ী বিরোধি দল সহ সেনাবাহিনী এবং আংশিক ভাবে অভিজাত ও শিল্পপতি মার্কা ব্যবসায়ী শ্রেণী।

শেখ মুজিব যদি করমচাঁদ গান্ধীর মতো আততায়ীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যেতেন সেটা হতো জাতির কাছে অন্য এক ধরনের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু পরিবারের সবাইকে এক সাথে হত্যা করে আনন্দে উলস্লাস করা পৃথিবীর কোনো সাধারণ বিবেকবান ও মেনে নিতে পারে না। এরকম হত্যাকা-ের ফলশ্রম্নতিতে জাতিকে বিচারহীনতা ও অপরাধের উস্কানি দেয়া হয়। জাতির মধ্যে হত্যা রাহাজানির সাহস বেড়ে যায়।

এরকম হত্যা পরম বেদনাদায়ক এবং অসহনীয়। এমন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয় তাহলে কি এটা ধরে নিতে হবে যারা রাজনীতিতে এসে ভুল করবে তাদের প্রত্যেককে স্বপরিবারে নিহত হতে হবে ? কোনো জন সমর্থন দ্বারা এহত্যা সংঘটিত হয় নি। সংগঠিত হয়েছে নিজ দেশের দুধে কলায় পোষা কিছু সৈন্য ও অফিসারদের পদলোভ আর হিংসার কারণে।
এ ঘটনায় অত্যাচারীকে উৎখাত করার কোনো গণপদ্ধতিও প্রয়োগ করা হয় নি। জেলের মধ্যে বন্দী অসহায় মানুষদের হত্যা করে যে কাপুরম্নষতার প্রমাণ দিয়েছে গুটি কয়েক সৈন্য তাদের বংশ এদেশে বিস্মার লাভ করলে এদেশ এবং সমাজ চিরকালই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

আজকের যুগের ডিএনএ পরীক্ষা নিরীক্ষা তারই ইঙ্গিত দেয়। শ্রদ্ধেয় শেখ মুজিবের বাস ভবনে নিস্পাপ মহিলা ও শিশু ছিল, সেই হিসাবে শেখ মুজিব ও তার পরিবারবর্গের মৃত্যু একটি ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডী। আর ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শহীদ।

পৃথিবীর যে কোনো গণতান্ত্রিক দেশে কথা কাটাকাটি হতে পারে, কেউ খারাপ শব্দ ব্যবহার করলে প্রত্যুত্তরে খারাপ শব্দ ব্যবহার করে তার প্রতিবাদ করা যায়। কিন্তু এর জের ধরে যে ব্যক্তি আগে হাত তোলে সে আদালতের বিচারে অন্যায় সাইব্যস্ত্ম হয়। মেজর ডালিম সে ভাবেই গাজীর ছেলেকে জনসমক্ষে চপেটাঘাত করে ঘটনার সুত্রপাত করেন। এরপরে ঘটে যায় গাজীর ছেলে কর্তৃক ছিনতাই ঘটনা।

এঘটনার মুল দায়িত্ব পালন করবে পুলিশ। কিন্তু তা না করে সরাসরি সেনাবাহিনীর লোক সেখানে হস্ত্মক্ষেপ করার কোনো আইন নেই। সেনাবাহিনীর অফিসাররা (যাদেরকে আমরা সুশিক্ষিত হিসেবে বিবেচনা করি) সৈন্য এবং অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে গাজী গোলাম মোস্ত্মাফার বাড়ী ঘেরাও করে আরেকটা পাল্টা গুন্ডামীর পরিচয় দিল।

গাজীর ছেলে, মেজর ডালিমকে ছিনতাই করে তার বাপের বাসায় নিশ্চয় নিয়ে যায়নি, নিয়ে গেছে অন্য কোথাও। **এথেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা, ডিসিপিস্নন, ধৈর্য্য, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো বা আনুষাঙ্গিক ট্রেইনিং ইত্যাদির কোনো বালাই ছিলনা।** তারপর ও কথা থাকে, এঘটনার জন্য আইনগত ভাবে আদালতে কোনো মামলা দায়ের না করে সেখানে বঙ্গ-বন্ধুর কাছে বিচার চাওয়ার কি অর্থ হতে পারে ? বঙ্গবন্ধু কোনো আদালত নয় জজ ও ছিলেন না।

তবু যদি ঘটনার নায়ক একটি শিশু হতো, তাহলে অভিভাবক হিসাবে সে দায়িত্ব শ্রদ্ধেয় শেখ মুজিবের উপর বর্তাতো। কিংবা এটা যদি কোনো রাজতন্ত্রের দেশ হতো তাহলে ও বিষয়টি ভেবে দেখার বিষয় ছিল। ব্যাপারটি আদালতের নজরে আনার পর তা যদি কার্যকরী না হতো এবং সেনাবাহিনী লোক এরকম বল প্রয়োগ করতো তাহলে তারা কোনদিনই দোষি সাইব্যস্ত্ম হত না।

মেজর জলিল ছিলেন আরেক মিথ্যার ঘটি। তার পদোন্নতি হয়নি বলে তিনি জ্বলে পুড়ে ছাই হচ্ছিলেন। (তার কয়েকটি ভাষণ শুনে আমি হতবাক হয়েছি) ভারতীয় সৈন্যরা বাংলাদেশ থেকে যাবার কালে অস্ত্র সস্ত্র এবং কিছু মালামাল নামের খড়কুটা লুট করে নিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি চিৎকার চেচামেচি করে রাজনৈতিক নেতা হতে চাইলেন। তার জানা উচিৎ ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ভারতের কত সেনাবাহিনীর নওজোয়ান তাদের বুকের তাজা

রক্ত দিয়েছে। অথচ সামান্য খড়কুটার জন্য তিনি দু'টি সরকার এবং জনমনে অসন্তোষের মারাত্মক বীজ বুনতে কম চেষ্টা করেন নি।

এটা অবশ্যই রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপন্থী। যাইহোক সব অবস্থা বিশেস্নষণ করে বুঝা যায় শ্রদ্ধেয় শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয় শুধু মাত্র হিংসা ও ক্ষমতার মোহে। সামরিক অফিসার ও সেনাবাহিনীর প্রধানরা কেবল ভাবতো তাদের পদ মর্যাদা ক্ষুন্ন হচ্ছে, মুক্তিযোদ্ধারা সব সুবিধে ভাগিয়ে নিচ্ছে এটা তাদের সহ্য হয় নি। সেনাবাহিনীর এসব নওজোয়ানরা মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে। অনেকে পাকিস্তান থেকে ফেরত এসেছে কোনো মুক্তিযুদ্ধ ও করে নি।

এমনকি ধনী বা খান্দানী পরিবার থেকে এলেও এদের মন মানসিকতা ছিল গাদ্দারিতে ভরপুর। যে কারণে অপরের সামান্যতম সুখ তারা সইতে পারে নি। তারা ইয়াহিয়া খানকে অথবা ভুট্টকে হত্যা করেনি ? কারণ তারাও কলিজার টুকরা পাকিস্তানকে ভাঙ্গার জন্য এক নম্বরে দায়ী।
আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং উন্নত সমাজে যেকোনো নতুন ফর্মুলা, নতুন আবিস্কার, নতুন আইডিয়া কার্যকারী হয়। সমাজে নতুনত্বের জন্য উপকার, আনন্দ, জয়ের নেশা প্রভৃতি মানুষকে আরও ভাল অবস্থার দিকে ধাবিত করে। কিন্তু যে সমাজের মানুষ শিক্ষিত নয়, সে সমাজের মানুষের কাছে একটি নতুন খাদ্যদ্রব্য তৈরি করে দিলেও তা সে খেতে চায় না। সে ভীষন ভয় পায়। যেন দৈ দেখলে মুখ ঘা হওয়ার মতো (মনের) অবস্থা। ওরা সংস্কার সাধনে বিশ্বাসী নয়, পুরানে এবং অতীতে বিশ্বাসী। তাই তাদের কাছে সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি ছিল অজ্ঞাত এক দানব।

এ থেকে সহজে বুঝা যায় বাঙালিরা দায়ে পড়ে পাকিস্তানের শোষণে দেশকে স্বাধীন করতে যুদ্ধ করেছে ঠিকই। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা আর সমাজতন্ত্রের জন্য নয়। এসব শব্দ (উচ্চশিক্ষিত ব্যতীত) বাঙালির বাপ-দাদা চৌদ্দগোষ্ঠীর কেউ শুনে নি। যে ফারুক-রশিদ শ্রদ্ধেয় শেখ সাহেবকে হিংসার বশবর্তী হয়ে হত্যা করেছে তারাও ছোট কালে মাথায় টুপি পরে সুরা মুখস্ত করেছে। সেই স্মৃতি এবং পরিবেশ তাদের কাছে ছিল চির উজ্জ্বল। বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে গাল গল্প শুনতে শুনতে তাদেরও বদহজমীর দোষ ধরেছিল।

যখন তারা বুঝতে পারলো বাংলাদেশের বুক থেকে একদিন সৈন্যবাহিনী ও বিলোপ হয়ে যাবে তখন থেকে শ্রদ্ধেয় শেখ সাহেবের উপরে হিংসা আর ক্রোধে তাদের পেট ফুলতে ফুলতে একেবারে গলদেশের কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়েছিল। আর তাদের কে ইন্ধন যুগিয়েছিল আড়ালে ওৎ পেতে থাকা কিছু সামরিক অফিসার এবং তৎকালীন মন্ত্রী মিনিষ্টার

এর মধ্যে খন্দকার মুশতাকের নাম উলেস্নখ যোগ্য। অনেকে তাকে তপস্বী বিড়াল বলে উপমা দিত।

১৯৭৫ সালে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে (যদিও শুরম্নতেই বলেছি রাজনীতি দাবা খেলার মতো) শেখ মুজিব নিশ্চয়ই রাজতন্ত্র কায়েম করতে চেয়েছিলেন। এর চেয়ে বেশী আর কি হতে পারে ? শুধুই যদি গণতন্ত্র মানুষকে সুখ শান্তি দিয়ে থাকে তাহলে আজো গ্রেটবৃটেনে রাজতন্ত্র কেন টিকে আছে ? সেখানেতো রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের সুফল পাওয়া যাচ্চে। কেন নরওয়ে, সুইডেন, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ভুটান, থাইল্যান্ড, লেসথো, ও বিশ্বের বহু মুসলিম দেশ যেমন সৌদি আরব, ওমান, বাহারাইন, আরব আমীরাত, জর্ডান, সিরিয়া, মরক্কো, মরিশাস ও বহু দ্বীপ দেশ রাজতন্ত্র মেনে নিচ্ছে?

এই উপমহাদেশে যুগ যুগ ধরেইতো বহু রাজতন্ত্র কায়েম ছিল। রাজতন্ত্র কায়েমের গোড়ার দিকে এরকম কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেয়া হয় এবং পরবর্তীতে তা ক্রমান্বয়ে শিথিল করা হয়। কোথাকার জল কোথায় গড়ায় এটুকু ধৈর্য ধরে দেখার সহ্য ক্ষমতা বাঙালির ছিল না। বঙ্গবন্ধুর ডাকে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে এই জাতি কুণ্ঠাবোধ করে নি কিন্তু নিরম্নপায় হয়ে এক নায়কতন্ত্রী সরকার ব্যবস্থা কায়েমের ডাকে তাঁকে হারাতে হলো জনপ্রিয়তা।

এর জের ধরে কিছু সংখ্যক সেনাবাহিনীর লোক ও কুচক্রী রাজনীতিবিদরা পরিবার সহ তাকে হত্যা করে ফেলে। বাঙালির এমনতর স্বভাব চিরকালের জন্য একটি কলঙ্ক হিসাবে অঙ্কিত হল। এর পরিবর্তে যদি শেখ সাহেবের পরিবারকে নির্বাসনের কোনো ব্যবস্থা এই কা-জ্ঞানহীন সৈন্যরা করতে পারতো তাহলে ইতিহাসে আমরা কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা পেতাম।

একটি দরিদ্র ও শিক্ষা বঞ্চিত গোঁড়া ধর্মান্ধ সমাজে গণতন্ত্রের চর্চা মানেই নানা মুনির নানা মত নিয়ে ঝগড়া বিবাদ করা। গণতন্ত্রের জন্য উত্তম উপকরণ হচ্ছে দেশের শতকরা ৬০ ভাগ জনগোষ্ঠী দেশ ও বিশ্বের বাস্ত্মবমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত থাকা। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে সহজ শর্তে ও পরিবর্তনীয় আইনে পুঁজিবাদের বিকাশকে তরান্বিত করা। যে দেশে ৬৮ হাজার গ্রামের জনগোষ্ঠীতে শতকরা ৩০ ভাগ মানুষ এখনও প্রকৃত শিক্ষার আলো পায় নি। (এমনকি নিয়মিত পত্র পত্রিকা পড়েনি, উন্নত মানের বই পুস্ত্মক পড়ারও উৎসাহ দেখায়নি) যে দেশে নারী শিক্ষাকে সুনজরে দেখা হয় নি। যে দেশে পরিবারের কর্তা কর্তৃক সকলের ভোট নির্ধারিত হয়। যে দেশে টাকার বিনিময়ে ভোট বেচা কেনা হয়, সে দেশে লাগামহীন গণতন্ত্র বাস্ত্মবায়ন কখনও সম্ভব নয়। তবে সীমিত গণতন্ত্র সম্ভব। একই জাতীয়তাবাদের ছায়াতলে জড়ো করে জাতিকে শিক্ষা ও শৃঙ্খলার পথে আনয়ন করে অবাধ গণতন্ত্রের ছাড়পত্র দিলে জাতির উন্নয়ন সম্ভব। এই আত্মবিশ্বাসে হয়তো শেখ মুজিব ব্যতিক্রমধর্মী পদক্ষেপটি নিয়েছিলেন।

কারণ সারা জীবন যে ব্যক্তি মানুষের মুক্তির জন্য অকোতভয় সংগ্রাম করেছেন, তিনি সেরকম স্বৈরাচারী হতে পারেন না। বিরম্নদ্ধবাদী ও সেনাবাহিনীর জওয়ানরা দাবা খেলার মতো তাঁকে ভুল বুঝেছিল। সব মিলিয়ে শেখ মুজিব ও তার পরিবারবর্গকে এবং জেলের মধ্যে নিরম্নপায় নেতাদের হত্যা করে দেশ ও জনগণের যে অপুরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এ ক্ষতির পুরণ কিংবা সংশোধন আর কোন কালে সম্ভব নয়।

১৩ ♦ বদরাগী বউ ♦

শাশুরীকে তেড়ে মেরে বউ যায় রাগে
ঘর-গোষ্ঠী মিনত করে বউকে খাওয়ান আগে।

এটি একটি আঞ্চলিক শেস্নাক। শেস্নাকটি দেশের বর্তমান অবস্থার উপর বিবেচনা করে প্রয়োগ করা হলো। শেস্নাকটির অর্থ হলো একজন ঘরের বউ নানাবিধ অপকর্ম করেও শেষ অবধি শাশুরীকেও অপমান করে তার রাগ কমে নি। বউয়ের এই রাগ ও গোমড়া মুখ দেখে পাড়া প্রতিবেশী ও ঘরের অন্যান্য সদস্যরা শাশুরীকে কোনো শান্ত্বনা দেবার প্রয়োজন বোধ করে নি বরং তারা সবাই ব্যস্ত্ব হয়ে পড়ছে বউকে খাইয়ে দাইয়ে কি ভাবে শান্ত্বি করা যায়, সেই প্রচেষ্টায়।

আজকাল পত্রিকার পাতা খুললেই বেরিয়ে আসে আমাদের রাজনীতিবিদগণের কর্মকা- এবং সরকারি ও বেসরকারি দুর্নীতিবাজ চাকুরিজীবীদের সীমাহীন দুর্নীতি, অন্যায় ও শোষণের বিভীষিকাময় চরিত্রের কাহিনি। এসমস্ত্ব লোকগুলো আখের গুছিয়ে নেবার জন্য সব ধরনের সতর্কতা অবলম্ভন করেছে। পালন করেছে গু-া ও সন্ত্রাস বাহিনী, চালান দিয়েছে অস্ত্রের। আর লুটপাটের টাকায় খরিদ করেছে প্রশাসনের সব দুর্বল চাকুরিজীবীদের। এদেরকে দেয়া হয়েছে তাদের হারাম উপার্জনের কিয়দংশ, না হয় শাসিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের চাকুরি যে কোনো মুহূর্তে খতম।

সুতরাং সাধারণ চাকুরিজীবীরাও যে যেদিকে সুযোগ পেয়েছে গোলক ধাঁধাঁর আবর্তে নিজেদের সুবিধা আদায় করেছে। সুতরাং আজকে ছোটখাটো দুর্নীতিবাজ অপেক্ষা বৃহৎ পরিসরে যারা এই গরিব দেশটার বারোটা বাজিয়েছে তাদের দিকে সকলের ক্ষুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ হচ্ছে। জনগণ এখনও বুঝতে পারছে না তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসব কালনাগ ও দস্যুদের কতটুকু শায়েস্ত্মা করতে পারবে।

হারিছ চৌধুরী ও মামুনের তিন বৎসরের কারাদ-, শুনে মনে হচ্ছে এ যেন নাটকের এক ক্ষুদ্র অংশ জনগণ দেখছে। পরবর্তী অংক কি হবে তা নিয়ে সকল মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। জনমনে স্বভাবতই প্রশ্ন আসছে আহাঃ আমি ও যদি কোটি কোটি টাকা লুটপাট করে আমার চৌদ্দ পুরুষ পর্যন্ত অভাব মিটিয়ে ফেলতে পারি। তা হলে তিন চার বৎসরের জেল জরিমানায় কী বা যায় আসে?

কত লোক তো সন্তানদের সামান্য ভরণপোষনের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজে যায়। কেউ কেউ এতে মারা ও যায়। অথচ আত্মীয়-স্বজন সব মিলে যদি চৌদ্দপুরুষদের ভাগ্য পরিবর্তন করা যায় তাহলে একজন লোক মারাই গেলে কী এমন ক্ষতি ? বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাটে মৃত্যুর কোনো আশঙ্কা নেই, কেবল জেল খানায় হয়তো কিছু কিল থাপ্পড়। তারপর ৩ বৎসরের জেল।

হিসেব মিলালে দেখা যাবে মুনাফা হিসাবে এই শাস্তি কিছুই না। জেলখানার রিমান্ডে গোয়েন্দাদের কাছে গোপন তথ্যাদি সুবোধ বালকের মতো বলে দিলে কিল থাপ্পড় থেকে ও যথেষ্ট রেহাই পাওয়া যায়। সুতরাং এখানে ক্ষতির তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। সাময়িক ভাবে এসব রাষ্ট্রীয় ডাকাত ও কালনাগেরা অসুবিধায় পড়ে গেছে। তারা জানে একদিন নিশ্চয়ই তারা হাসিমুখে জেল থেকে বেরিয়ে আসবে।

ফুলের তোড়া নিয়ে পদলেহী কুকুরগুলো গেটের সামনে দাড়িয়ে থাকবে। এটাই বাঙালির জঘন্য এক চরিত্র। এ চরিত্রকে রপ্ত করেই এসব ডাকাত ও কালনাগেরা রাজনীতির মাঠে বিচরণ করে বীরদর্পে। তারা জানে সেনাবাহিনীর মধ্যেও তাদের প্রচুর সমর্থনকারি আছে ।

অপরদিকে যাদেরকে অস্ত্র দিয়ে গুপ্ত বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছিল তারা ও সুযোগের অপেক্ষায় আছে। এতদ্ব্যতীত বৃহৎ শক্তির দেশগুলো থেকে যাতে বর্তমান সরকারের উপর চাপ আসে সেই ব্যবস্থাও হচ্ছে। দাবা খেলার মতো বর্তমান সময়ে একটু আত্মরক্ষা মুলক অবস্থান নিয়ে কোনোরকমে টিকে থাকতে হবে। এখন ধৈর্য্যের পরিচয় দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। আর গর্জন করা বোকামির সামিল। সুতরাং বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও সেনাবাহিনীর প্রধানগণ যদি কালক্ষেপণ করে বিষাক্ত কালোনাগদের ঘাড়টি না মটকিয়ে তা শলাকায় বেধে লেজুড় ধরে নাচানাচি করেন তবে তাদের কপালে লিখা আছে ‘জাহান্নামের আজাব’।
বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার, বিভিন্ন বিচারপতি ও তিন বাহিনী প্রধানদের আত্মীয়-স্বজন এবং পরিবারের অবুঝ সদস্যগণ যে কোনো মুহূর্তে কিডন্যাপ বা ছিনতাই হলে তা অবাক হওয়ার মতো কোনো বিষয় হবে না। কারণ ডাকাত ও সন্ত্রাসীদের কাছে যে কোনো অপকৌশল এবং নিষ্ঠুরতা তাদের বিজয়ের মোক্ষম হাতিয়ার।

রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে ও রাজনীতির নামে যারা দেশ ও জনগণের সর্বস্ব হরণ করেছে তারা এখন লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে বলে যাচ্ছে "দুর্নীতি দমন, রাজনৈতিক সংস্কার, এসব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো দায়িত্ব নয়। জনগণ কিংবা সংবিধান তাদেরকে এ কার্যকলাপের বৈধতা বা ম্যান্ডেট দেয় নি। এসব দায়িত্ব হচ্ছে নির্বাচিত সরকারের ।

সুতরাং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকা তৈরি করা এবং নির্বাচনে যাতে কারচুপি না হয় তার ব্যবস্থা করা। অতএব আজকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যা করে যাচ্ছেন, নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় এসে ওই সব যে বাতিল করবে না তার গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা কোথায়? পরিস্থিতি যে দিকেই পাল্টাক না কেন আজকের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগীদের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যাবে যদি তারা সম্মিলিত ভাবে ওই সব দুর্নীতিপরায়নদের প্রত্যেককে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেন, আর তাদের সহযোগী প্রত্যেককে কমপক্ষে পাঁচ থেকে সাত বৎসরের কারাদে- দি-ত করেন। বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে আজ যারা সর্বস্বান্ত করেছে তাদের নিজের ঘরে পাঁচশত টাকা খোয়া গেলে, ঘরের ঝি চাকরদের তারা পিটিয়ে চেপ্টা করে ।

চুলের মুঠি ধরে জবাই করা মোরগের মত হেনস্থা করে। গরম তাওয়া ও লোহার শলাকা লাল করে শরীরের বিভিন্ন যায়গায় ছেঁকা দেয়। সুতরাং আজ এই সব কোটিপতিদের পরিবারের প্রত্যেকের কি শাস্তি হওয়া উচিত তা বিবেকবান নাগরিক ও আইনজীবিরাই বলুন। কেননা পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্য এই চুরি বিদ্যার সাথে হয় জড়িত নয় ঘোর সমর্থক। সুতরাং তারা প্রত্যেকেই দায়ী এবং দোষি।

পবিত্র গ্রন্থ কোরানের কোথাও কি লিখা আছে দুর্নীতির দুর্গ ও জনগণের রক্ত-শোষকদের তোয়াজ করতে হবে ? অথচ মুসলমান হিসাবে আমাদের কত না স্বর্গ ছুয়ার বড়াই। কথায় গেল চোরদের শাস্তি হওয়ার অমৃত বাণী ? ৫নং সুরা মায়েদার ৩৮নং সুস্পষ্ট বাণীকে আজ কার্যকরী করার জন্য কয়জন কিংবা কয়টি ইসলামিক রাজনৈতিক দল ফতোয়া দিয়েছে ?

নেতা নেতৃ রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা সীমাহীন লোভ লালসায় শুধু নিজেদেরকে নিমজ্জিত করে নি, তারা প্রশাসনের সকল স্তরকে ধ্বংস করেছে অবলীলায়। জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছোয়া হবার জন্য তাদের অপকৌশলের বিদঘুটে চরিত্র আজ ধরা পড়েছে। মানুষের শেষ রক্তবিন্দুটুকু শোষে নেওয়ার জন্য তারা কি না করেছে ? নারীর মুখে এসিড নিক্ষেপ। পিতা মাতার সামনে কন্যা ধর্ষন, নারী হত্যা।

ঘরের সব মানুষ এবং নিরীহ প্রাণী পুড়িয়ে দেওয়া । প্রকাশ্যে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন করে ঘরবাড়ি ও ভূমি দখল। ভূমি জরিপের কাজে একজনের সম্পত্তি আরেক জনের নামে

রেকর্ড করে দেওয়া । খাস-জমি, শত্রম্ন-সম্পত্তি, উপজাতি সম্পত্তি যাকে ইচ্ছে তাকে দান করা । এক জনের ফোন বিল কিংবা বিদ্যুত বিল আরেক জনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া । এভাবে দেশের এমন কোনো স্থান বাকি ছিল না, এমন কোনো মাটি খালি ছিল না যেখানে গেলে শোষণ, হয়রানি ও হেনস্থা থেকে রেহাই পাওয়া গিয়েছে।

কত সহ্য করবে মানুষ? আজ ওই সব নির্লজ্জ নেতা-নেত্রী ও তাদের পদলেহী চাটুকারদের ন্যায্য বিচারের মাধ্যমে শাস্ত্মি দিয়ে, বুঝিয়ে দেয়া উচিত এই দেশটি তাদের বাপ দাদার কেনা সম্পত্তি নয়যে যা ইচ্চে তাই করবে। এই তো গেল বৎসরের দিনগুলিতে সাধারণ মিছিল ও গণদাবীর অপরাধে তারাই পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে রাস্ত্মায় প্রকাশ্যে নারীর সম্ভ্রম হরণ করেছে, করেছে নিরীহ মানুষদের গণগ্রেফতার। এসব বিভীষিকাময় মনোকষ্টের কথা কোন ভুক্তভোগী নাগরিক মৃত্যুর আগ পর্যন্ত্ম ভুলবে না।

ইদানিং পত্র-পত্রিকায় বেশ জোরালো ভাবেই দেখতে পাচ্ছি মায়নাস টু সংস্কারের নানা কথাবার্তা। এর আগেও আমরা দুই রাজনৈতিক দলের নেত্রীদের বিদেশ পাঠানো এবং বিদেশ থেকে ফেরত না আসার জন্য দেখেছি অনেক কুটিল তথ্যের লেখালেখি। দুই নেত্রী ও তাদের সাঙোপাঙোদের কার্যকলাপের ব্যাপারে সবাই কেমন যেন দিশেহারা।

নেতৃদ্বয়কে কেউ কিছু বলতে চান না, মনে হচ্ছে কিছু বললেই চাকুরি চলে যাবে এমনি ভাবখানা। যাদের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে একটি দেশের সর্বনাশ হয়েছে তাদেরকে সবাই বড়ই তোয়াজ করে তেল মালিশ করছেন। আপনারা যদি রাজনীতি থেকে দয়া করে বিদায় কিংবা অবসর গ্রহণ করেন তাহলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

হাত কাঁচুমাচু করে সেই বৃটিশ ষ্টাইলের দারোয়ানী ভঙ্গীর মতো অভিনয় করে চলছে এদেশের রাজনীতি। দেশ ও সমাজের সর্বনাশ ঘটিয়ে আজো যারা ক্ষমতায় আকড়ে থাকতে চায় তাদেরকে খুশ রাখার জন্য তলে তলে সেনাবাহিনী থেকে শুরম্ন করে রাজনৈতিক দলের অনেক নেতা কর্মী এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অনেকেই নানাবিধ কৌশল করে যাচ্ছেন। যাতে করে নেতৃদ্ধয় কোন ভাবে বেজার না হন।

কেন এই তেল মালিশ ? এই নেতৃদ্ধয় নিজেরাই চরম অন্যায় করে আজ মনে মনে অগ্নিশর্মা, অভিমানী, যেন সুযোগ পেলেই আবার গর্জে উঠবেন। গোমড়ামুখি হয়ে বসে আছেন তারা, ঠিক যেন সেই উপরের প্রথম বাক্যে উলিস্নখিত শেস্নাকটির মতো। অথচ তাদেরকে তোয়াজ করার জন্য চলছে ঘর-গোষ্ঠী সকলের কত না আপ্রাণ প্রচেষ্টা।

১৪ ♦ হামছে বড়া কৌন হ্যায় ♦

টিপাইমুখ বাধ নিয়ে বাংলাদেশীদের যে উৎকণ্ঠা শুরম্ন হয়েছে তা লিখে শেষ করা যাবে না। বিশেষ করে সিলেট থেকে ভৈরব পর্যন্ত বাংলাদেশের এক চতুর্থাংশ যে বিশাল ক্ষতিগ্রস্থ হবে সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পানির অপর নাম জীবন আর বাংলাদেশের নদ নদীই হচ্ছে ওই পানি সরবরাহের মূল উৎস। আমরা এখন টিপাইমুখ নিয়ে অত্যন্ত সোচ্চার কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আমাদের পদক্ষেপ বড় দেরিতে। সব কাজ শেষ বাকি কেবল মুলম্না মুলভী ডেকে মিলাদ মেহফিল শেষে নতুন ঘরে ঢুকার পালা।

এই মুহূর্তে মিলাদ করা যাবে না কিংবা নতুন ঘরে উঠা যাবে না তা কি কখনও হয় ? আজকে আমাদের টিপাইমুখ আন্দোলন সেই অবস্থায় এসে দাড়িয়েছে। এই বাক্যের দ্বারা আমি সচেতন দেশবাসীদের নিরম্নৎসাহিত করছি না কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে তাই বলতে হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি বাংলাদেশে যদি একটি স্থিতিশীল সরকার দীর্ঘকাল দেশ শাসনের সুযোগ পেতো তাহলে হয়তো অদুর ভবিষ্যতে প্রজাতন্ত্রের আসন্ন বিপদ সমুহ উপলব্দি করার মতো একটি রাজনৈতিক দুরদর্শিতা অর্জন করতে পারতো। কিন্তু এই দেশটা সব সময়ই অংকুরে বিনষ্ট হওয়ার মতো পায়তারা ও ষড়যন্ত্র দ্বারা হয়েছে ক্ষত বিক্ষত।

কোনো সরকারই ভালভাবে স্থায়িত্ব পায় নি। যারাই দেশটার সংসদে বসার সুযোগ পেয়েছে তারাই আমলাতন্ত্রের ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত হতে পারে নি। সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের তহবিল তছরম্নফ, আর মিছিল হরতালের আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে লক্ষ্যচ্যুত হয়েছে বার বার। কমিনাদের হাতে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের এমন বিভৎস ও নির্লজ্জ রম্নপ দেখে সচেতন নাগরিকরা হয়েছেন বাকরম্নদ্ধ। আর আন্তর্জাতিক ভাবে আমরা স্বীকৃতি পেয়েছি খাঁটি চোর ও প্রতারক হিসাবে।

শিক্ষা ও বিবেক বঞ্চিত নাগরিকরা (বেওয়াক্কুফের মতো) মাসে তিন লক্ষ শিশুর জন্ম দিয়ে এদেশকে বানিয়েছে মাটি কাড়াকাড়ির দাঙ্গাভুমি। শিশু শ্রমিক, টুকাই, ভিক্ষুক, হাইস্কুল উত্তীর্ণ বেকার যুবক ও মাদ্রাসা উত্তীর্ণ কিছু শিক্ষক । এই হলো আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিক গোষ্ঠির এক বিশাল অংশ। যারা আরেকটু অগ্রগামী হয়ে শিক্ষা অর্জন করেছে তাদের উপর আমাদের কিছুটা ভরসা। বাদবাকি অভিজাত শ্রেণী গুলোর চরিত্র নিয়ে কথা নাইবা বললাম, তার সাক্ষী তো দেশের পত্র পত্রিকা।

ইন্টারনেট ঘাটাঘাটি করে জানা গেলো টিপাই মুখ বাঁধের পরিকল্পনা হয় ১৯৮৬ সালে। টিপাইমুখ এলাকার একজন রাজনৈতিক প্রভাবশালী বাঙালি নেতা এর প্রধান উদ্যোক্তা। এরপর নানা কারণে বিষয়টি অপ্রকাশিত থাকে। ২০০৩ সালের ১৮ জানুয়ারি ভারতীয় বিদ্যুত আইনের ২৯ ধারার অধীনে এই প্রকল্পটির অনুমোদিত হয়। ঐ বছর ২ জুলাই তারিখে প্রজেক্টের কাজ শুরম্ন করার জন্য মন্ত্রণালয় অর্থনৈতিক ও কারিগরি অনুমোদন দেয়। এতে বলা হয় প্রকল্পটি বাস্ত্মবায়ন করতে সর্বসাকুল্যে প্রায় ৬ বৎসর সময় নেবে।

তারপর ২০০৬ সালের ৩ ফেব্রয়ারিতে বিষয়টি প্রকাশ পায়। ‘এশিয়ান ট্রিবিউন’ পত্রিকাটি এই খবর দেয়। ভারতের রাষ্ট্রীয় বিদ্যুত সংস্থা “নর্থ ইষ্টার্ন ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন” ১৫০০শত মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুত উৎপাদনের প্রকল্প হাতে নিচ্ছে। ইতিমধ্যে আন্ত্মর্জাতিক টেন্ডার আহ্বানের খবরটিও প্রত্রিকাটি উলেস্নখ করে। দরপত্র দাখিলের শেষ দিন ছিল ৩ এপ্রিল ২০০৬।

তারপর উত্তর ও উত্তরপূর্ব রাজ্যগুলোতে এই নিয়ে হৈ চৈ শুরম্ন হয়। বিশেষ করে মনিপুর ও মিজোরাম ছিল এব্যাপারে অগ্রগামী, যাইহোক ২০০৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত্ম ভারত সরকার এ ব্যাপারে চুপ থাকে। চুপ থাকাটাই তাদের স্বভাব, কথায় বলে ‘টিপুনিতে মহিষ মারে’ এই সরকার তর্জন গর্জন করে না কিন্তু টিপে টিপে উকুন কিংবা ছাইপোকা না মেরে নিঃশব্দে মহিষ হত্যা করে।

মহিষ হত্যার অনেক তথ্য পাঠকদের খুব একটা অজানা থাকার কথা নয়। কলিকাতার মুক্ত চিন্ত্মার লেখক প্রবীর ঘোষ ‘স্বাধীনতার পর ভারতের জ্বলন্ত্ম সমস্যা’ বইটিতে অনেক মহিষ হত্যার কথাই উলেস্নখ করেছেন। কাশ্মীরের ঘটনাবলী, শ্রীলঙ্কার তামিলদের উস্কানি ও অস্ত্র সহায়তা, নেপাল, ভুটান ও সিকিমকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে কাবু করে রাখার অমানবিক ও অগণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্ভন সচেতন মানুষ মাত্রই জানেন।

বাবরি মসজিদ নিয়ে অন্যায় ভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ানো, গুজরাটের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বাংলা ভাষাভাষি অধ্যুষিত আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয় রাজ্য থেকে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ লুট করে পশ্চিম ভারতকে ‘কসমোপলিতান’ শহর তৈরির অদম্য বাসনাকে ঢাকা দেয়ার জন্য ওই সব রাজ্যগুলোতে ‘বাঙালি খেদাও আন্দোলন’কে বাস্ত্মবায়িত করা ছিল টিপে টিপে মহিষ হত্যার মতো চরিত্র।

পশ্চিম বাংলার জ্যোতিবসু ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্বেও বামপন্থী ও বাঙালি হওয়ার দায়ে নয়া দিলস্নীর দরবারে তাঁর কদর নেই। কদর আছে কেবল মুখের ভাষ্যে । বাংলাদেশের চারপাশে বাংলা ভাষাভাষি বাঙালি না থাকলে

একাত্তরের যুদ্ধে ভারতে শরনার্থী হওয়া তো দুরের কথা আমরা ভারতীদের দ্বারা নির্যাতিত হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল বেশি। বাংলাদেশের সাথে ভারতের আচরণ সবর্দাই অবজ্ঞার আবর্তে ভরপুর।

ভারত সরকার সব সময়ই দুই পারের বাঙালিদের গোয়েন্দার নজরদারিতে রাখে। তাই হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা ভারত সরকারের কাছে 'তেমন খারাপ কিছু না'। বাংলাদেশের সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া, সমুদ্র সীমার কোনো সুরাহা না করে যত্রতত্র অনুপ্রবেশ ও আন্তর্যাতিক সীমারেখার প্রতি তোয়াক্কা না করা ভারতের "হামছে বড়া কৌন হ্যায়" চরিত্র। সীমান্তে নিরীহ বাংলাদেশীদেরকে পশু পাখির মতো হত্যা করা, পানি চুক্তির ওয়াদার বরখেলাপ এসমস্ত সবই হচ্ছে ভারতের এক তরফা অবজ্ঞা অলসতা আর নীরব আগ্রাসনের বর্হিপ্রকাশ।

বাংলাদেশ থেকে নারী পাচারকারিদের বিরম্নদ্ধে সঠিক কোনো পদড়্গেপ নিচ্ছে না ভারত । ভারতে বিভিন্ন কর্ম সংস্থানে নিযুক্ত রয়েছেন বাংলাদেশের প্রায় চারলড়্গ নারী। এর মধ্যে এক তৃতীয়াংশই যৌনদাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। (ঢাকা: বুধবার, ১৫ই জুলাই, ২০০৯ দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদকীয়) খবরের সারমর্মটির অনেক অংশ দেশের আরও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দেখা গেছে।

এছাড়াও পার্বত্য চট্রগ্রামে বিদ্রম্নহীদের সহযোগিতা দান, (যা পাকিস্তানী গোয়েন্দাদের সহযোগিতায় হচ্ছে বলে দাবী ও যুক্তি করা হয়) পুশ ব্যাক পলিসি, লোক দেখানো ঢাকা কলকাতা বাস সার্ভিস চালু করে ইমিগ্রেশনের নামে যাত্রীদেরকে ঘন্টার পর ঘন্টা হয়রানি দিয়ে দুই বাংলার মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বকে ছিন্ন করাই হলো ভারতের পস্ন্যান বা পলিসি। সবচেয়ে নিষ্ঠুর পদড়্গেপ হলো ফারাক্কা বাধ। যা কার্যকরী করা হয়েছিল ১৯৭৪-৭৫ সালে। ফারাক্কা বাংলাদেশের সীমানা থেকে উত্তর পশ্চিম দিকে ১৮ কিলোমিটার দুরে গঙ্গা নদীর উপরে এক বিশাল বাঁধ।

বাঁধটি ২২৪৫ মিটার লম্বা এবং উহাতে সর্বমোট ১০১টি ফোকর বা পানি নিয়ন্ত্রণের গেট রয়েছে। হুগলী, ভাগীরথি নদীতে অতিরিক্ত পলিমাটি জমে যাওয়ার কারণে কলকাতা সমুদ্রবন্দর সহ বিভিন্ন কৃষি প্রকল্প এলাকায় সমস্যা দেখা দেয়। তাই শুষ্ক মৌসুমে (জানুয়ারী থেকে জুন) পানির সরবরাহ আর পানি প্রবাহ সচ্চল করার জন্য নদীর তলদেশ খনন পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করা হয় এই ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে। এই বাঁধের পরিকল্পনা করা হয় ১৯৬০ সালে।

১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের পর এই পরিকল্পনার কথা পাকিস্তান সরকার জানতে পারে। কিন্তু কোন পদক্ষেপ নেয়া হয় নি। এই বাঁধের সব কাজ শেষ হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ তা জানতে পারে। তাও মৌলানা ভাসানীর নেতৃত্বে লংমার্চ করার কারণেই তা সর্বত্রই জানাজানি হয়। এই ফারাক্কা বাধের প্রয়োজনীয়তা যতই গভীর হোক না কেন এর পেছনে যে ষড়যন্ত্র কাজ করেছে তা হলো (এক) তৎকালিন পুর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক ভাবে পঙ্গু করে দেয়া।

(দুই) বাংলাদেশী জনগণের মধ্যে ভারত বিদ্বেষ সৃষ্টি করা। যার ফলে দুই বাঙালি জাতির মধ্যে ঐক্য কিংবা বন্ধুত্বের মধ্যে একটা ফাঁটল সৃষ্টি করে রাখা। কারণ ভারত সরকার ভালই জানে বাঙালি জাতিগুলোর মধ্যে ঐক্য ও জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি হলে একদিন 'বৃহৎ বাংলার' আন্দোলন জেগে উঠতে পারে। ভারতের খালিস্থান আন্দোলন, কাশ্মীর আন্দোলন, পশ্চিম বঙ্গের কমিউনিষ্ট আন্দোলন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, আসামীদের উলফা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, ভারত সরকারকে সব সময়েই নতজানু করে রেখেছে। সুতরাং বাঙালিদের উপর তাদের কোনো বিশ্বাস নেই। ভারত সরকার চায় না পশ্চিম বঙ্গের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্টতা হোক।

তাই পশ্চিম বঙ্গের দুই তৃতীয়াংশ মানুষ কমিউনিষ্টপন্থী মনোভাবাপন্ন হওয়া সত্বেও কোটি কোটি ডলার তথা রম্নপিয়া খরচ করে পৃথিবীর অন্যতম এক নদীর উপর ফারাক্কা বাঁদ দিয়ে সরকার এটাই বুঝালো যে তোমরা তবুও পুর্বমুখী হয়ো না। অপর দিকে ভারত, কাঁচা মশলস্নাপাতি; কাপড়; স্বল্প মুল্যে মটর যান; চাউল ও গৃহপালিত পশু বিক্রির বিপুল ব্যবসা দিয়ে বাংলাদেশীদের পরনির্ভরশীল করার পলিসি গ্রহণ করেছে । এতে করে পশ্চিম বঙ্গের বাঙালিদের অর্থনীতি জোরদার হচ্ছে ।

সুতরাং এই পলিসি দ্বারা দুই বাংলার মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক সৃষ্টি হচ্ছে, বন্ধত্বের কিংবা ভ্রাতৃত্বের নয়; আর জাতীয়তাবাদের তো নাম গন্ধ'ই থাকছে না। সুতরাং টিপাইমুখের বাঁধ এবারে আরও একটি বড় সম্পর্ক ছেদনের কার্যকরী বোমা। এই বোমার ফলে ভেতো বাঙালি ভাত পানির অভাবেই মরবে। সুতরাং এতকিছু জানা শুনার পরও যদি বাংলাদেশের কোনো সরকার বাংলাদেশের উপর দিয়ে আন্তর্জাতিক সড়ক যোগাযোগের সুযোগ দেয়ার কথা বলে, তবে উচিত হবে আমাদের স্বার্থ ও ক্ষতিকর বিষয়টি খতিয়ে দেখা। আমার বিশ্বাস পীচঢালা সড়ক পথ অপেক্ষা কেবলমাত্র রেলপথের যোগাযোগ বহুলাংশে দেশের জন্য নিরাপদ।

এতে যে কোন প্রকারের যানবাহন বাংলাদেশে ঢুকতে পারবে না। আর সম্পর্ক প্রতিকুল হলে রেল-লাইনের কিছু অংশ উপড়ে ফেললে অনুপ্রবেশ ঠেকানো যাবে। কথায় বলে রাখে

আলস্নাহ মারে কে ? নিশ্চয়ই এই বিপদ থেকে আমরা বাঁচার জন্য বিকল্প কোনো উপায় উদ্ভাবন করবো। আমরা জানি বাংলাদেশের নদ নদীগুলো যে ভাবে পলি ভরাট হয়েছে এতে পানির প্রবাহ বাড়লে অতিরিক্ত পানি বন্ধতার বন্যাই আমাদের বেশী ড়্গতি করবে। নদীগুলো খনন করার বিশাল অর্থ ও টেকনোলজি আমাদের নেই।

সুতরাং পানির বদলে ও প্রাকৃতিক জলবায়ুর পরিবর্তনে আমরা অতিরিক্ত কৃষি জমি পাবো। তা নিশ্চয়ই একদিন হয়তো কাজে লাগবে। আমরা ঋতু পবির্তনের সঙ্গে পালস্না দিয়ে এমন এক ধরনের শস্য কিংবা ফসল উৎপাদনের জন্য উপায় খুঁজবো যা আমাদেরকে বিকল্প খাদ্যের কিংবা অর্থের নিশ্চয়তা দেবে।

এমনকি বিকল্প পদ্ধতিতে মাছ চাষের চিন্ত্মা ভাবনা করতে পারি। প্রাকৃতিক বৃষ্টির জন্য অতিরিক্ত বনায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারি। আর যদি কখনও আমাদের সামর্থ্যে কুলোয় তাহলে ভারতের বাঁধ থেকে ছেড়ে দেয়া অতিরিক্ত পানি যাতে ছোট্ট ছোট্ট খাল খননের মাধ্যমে কাজে লাগাতে পারি সেরকম চিন্ত্মা ভাবনাও আমাদের পরিকল্পনায় থাকবে।

ভারত সরকার যেমন আমাদেরকে প্রাকৃতিক ভাবে পঙ্গু করার চেষ্টা চালাচ্ছে এতে বৃহৎ শক্তিগুলোর হস্ত্মড়্গেপ হয়তো কাজে লাগতে পারে। কিন্তু তা কতদিন ঠেকান যাবে তা'ই দুশ্চিন্ত্মার বিষয়। কথা আরও আছে; এই ঠেকান দিতে গিয়ে যদি আবার শর্তের চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হয় ? সুতরাং এখানে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দুরদর্শিতার প্রয়োজন। প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখাই জ্ঞানী গুণীদের পরিচয়।

সেই সুসম্পর্ক রাখতে গিয়ে উভয় পড়্গকেই কোনো আংশিক ক্ষতি বা ছাড় দিতেই হয়। অন্যতায় কোনো সমস্যার সমাধান হয় না। ঐ দিকটায় খেয়াল রেখে আমাদের সরকারকে অবশ্যই এগুতে হবে। কায়েমী স্বার্থবাদী ও ধর্মীয় জঙিবাদ ও মৌলবাদীরা যাতে এই বাঁধকে উপলড়্গ্য করে বন্ধুত্বের বদলে জনমনে শত্রম্নতার সৃষ্টি করতে না পারে সেদিগে উভয় সরকারের তীড়্গ্ন দৃষ্টি রাখা অবশ্যই জরম্নরি। ভারত সরকারের শুভ বুদ্ধির উদয় হোক এই প্রত্যাশা করি।

১৫ ♦ কালের চক্রে দুর্ভিক্ষের বিশাল দৈত্য ♦

ভূতত্ত্ববিদদের প্রচুর রিপোর্ট থেকে জানা যায় নদীমাতৃক বাংলাদেশ হাজার হাজার বৎসরে নদী কর্তৃক পলিবহনের কারণে ভরাট হয়ে এর ভূভাগ গঠিত হয়েছে। আজ থেকে মাত্র চলিস্নশ বৎসর আগে পৃথিবীর কড়্গপথ থেকে সেটেলাইটের মাধ্যমে ধারণ করা ছবিগুলো পর্যবেড়্গণ করা হলে দেখা যাবে বাংলাদেশ যেন 'অনেকগুলো পানির জাল দ্বারা আবৃত'। কিন্তু মাত্র চলিস্নশ বৎসরের ব্যবধানে এখন আর সে রকম ছবি দেখা যাবে না।

কারণ জলবায়ু ও প্রাকৃতিক বৈচিত্রময় প্রবাহের পরিবর্তনের জন্য এই ভূভাগের মানচিত্র অনেক পাল্টে গেছে। অসংখ্য নদ নদীর মোহনায় পরিপুর্ণ ছিল এই দেশ। সব নদীগুলোর গন্তব্য স্থান ছিল বঙ্গোপসাগর।

আজো এই ধারা অব্যাহত আছে কিন্তু সেই যৌবন আর উত্তাল গতিবেগ নেই। বাংলাদেশের নদ-নদী খাল বিল মৎস্য শস্য বান বৃষ্টি আর ষড়ঋতুর সাথে প্রত্যেকটি বাঙালি মানুষের জীবন রক্তের মতো ওতোপ্রত ভাবে জড়িত। বাঙালির জীবনে নদী নেই এমনটি ভাবতেও বুকটা হাহাকার করে উঠে। প্রত্যেকটি খাল কিংবা নদীর পার্শদেশ ও তলদেশ চুইয়ে চুইয়ে পানির প্রবাহ সর্বদাই বিরাজমান থাকতো মাটির নানা স্তরে।

তাই পুকুর কাটলে যেমন পানির অভাব হতো না তেমনি নলকুপ বসালেও সমস্যা হতো না। আমার আশঙ্কা এই একবিংশ শতাব্দির শেষদিকেই বাঙালির জীবন থেকে নদী বিলীন হয়ে যাবে। যা থাকবে তা এখানে সেখানে শুধু বদ্ধ পানির কিছু হাওর।

আর মরে যাওয়া নদীগুলোর গভীর স্থানগুলোতে সৃষ্টি হবে পাড়বিহীন দিঘী। এই ধারণার পেছনে যে কারণ, তা হচ্ছে ভারত কর্তৃক সমস্ত নদীগুলোর পানি ছিনিয়ে নেয়ার মতো বিবেকহীন পদড়্গেপ। শুধু টিপাইমুখ ও ফারাক্কার কথা নয়। আজ আমি বর্ণনা করবো ভারত কি ভাবে বিশাল দৈত্যের মতো ধেয়ে আসছে আমাদেরকে তিলে তিলে নিঃশ্বেষ করে দিতে।

বাংলাদেশের দৈনিক, সাপ্তাহিক, ইন্টারনেট ও সরদার আব্দুর রহমানের লিখা থেকে আজকের এসব তথ্য উপাত্ত আমি সংগ্রহ করেছি। বিশেষ করে 'সরদার আব্দুর রহমানের' কাছে আমি এজন্য কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেসের জনাব নাজির আহমেদ এবং সম্পাদক আবুল আসাদের কাছে।

বিভিন্ন তথ্যাদি থেকে জানা যায় বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত ছোট বড় প্রায় ৫৪ টি নদীর উৎস হচ্ছে নেপাল ভুটান ও ভারতের হিমালয় পর্বতশ্রেণী এলাকা। এসব নদীগুলোর উপর ভারত বিভিন্ন আকারের বাঁধ নির্মাণ করার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। অধিকাংশ নদীতে বাঁধ ব্যারেজের কাজ শেষ করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সেচ পরিকল্পনার আওতায় একক ভাবে সব নিয়ন্ত্রণ করছে। যার ফলে বাংলাদেশের নদীগুলোতে পানির প্রবাহ অসম্ভব রকমের হ্রাস পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে নদীর তলদেশে পড়েছে অধিক মাত্রায় পলিভরাট, নদী হারিয়েছে এর নাব্যতা, মৎস্যকুল হয়েছে বিলীন।

যে সব নদীর উৎসমুখ হচ্ছে ভারত নেপাল এলাকায় সে গুলো হচ্ছে (১) গঙ্গা (২) ব্রম্মপুত্র (৩) মহানন্দা (৪) তিস্ত্মা (৫) রায়মঙ্গল (৬) ইছামতি (৭) কালিন্দি (৮) বেতনা-কোদালিয়া (৯) ভৈরব (১০) কপোতাক্ষ (১১) মাথাভাঙ্গা (১২) আত্রাই (১৩) পাগলা (১৪) পুর্ণভবা (১৫) তেঁতুলিয়া (১৬) ইউসিয়াম (১৭) কুলিক (১৮) নাগর (১৯) ডাহুক (২০) করতোয়া (২১) তালমা (২২) ঘোড়ামারা (২৩) চিলাখালি (২৪) সোমেশ্বরী (২৫) বুড়ি তিস্ত্মা (২৬) ভোগাই (২৭) নিতাই (২৮) জিনজিরাম (২৯) দেওনাই-যমুশ্বেরী (৩০) ধরলা (৩১) দুধকুমার (৩২) যদুকাটা (৩৩) সারিগোয়াইন (৩৪) ধামালিয়া (৩৫) নোয়াগঞ্জ (৩৬) পিয়ান (৩৭) ধলা (৩৮) সুরমা (৩৯) কুশিয়ারা (৪০) সোনাই বড়দাল (৪১) জুরি (৪২) মনু (৪৩) ধলাই (৪৪) খোয়াই (৪৫) লংলা (৪৬) সুতাং (৪৭) সুনাই (৪৮) হাওড়া (৪৯) বিজলী (৫০) সালদা (৫১) গোমতি (৫২) ফেনী-ডাকাতিয়া (৫৩) সেলুনিয়া (৫৪) মুহুরি।

এসব নদীগুলোর মধ্যে বৃহদাকার প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে গঙ্গায় ফারাক্কা বাঁধ, মহানন্দায় মহানন্দা বাঁধ, গোমতি নদীতে মহারাণী বাঁধ, তিস্ত্মা নদীতে তিস্ত্মা বাঁধ, খোয়াই নদীতে খোয়াই বাঁধ, মনু নদীতে মনুবাঁধ, মুহুরি নদীতে নির্মাণাধীন কালনি বাঁধ এবং বরাক নদীতে টিপাইমুখ বাঁধ। বৃহৎ নদী পদ্মা-যমুনার গাঙেয় এলাকায় এবং ব্রম্মপুত্র-যমুনা ধারায় যে বিশাল প্রকল্প তা অদুর ভবিষ্যতে পুর্ণ মাত্রায় বাস্ত্মবায়িত হলে বাংলাদেশ যে দুর্ভিক্ষের ছোবলে ধীরে ধীরে নিঃশ্বেষ হয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

পদ্মা-যমুনার আওতায় যে অর্ধশতাধিক সেচ ও বিদ্যুত অবকাঠামো ভারত নির্মাণ করেছে এবং করতে যাচ্ছে এতে বাংলাদেশের সমস্ত্ম শাখা এবং উপশাখার নদীগুলোর অনেকটাই লুপ্ত হয়ে যাবে। কিছু কিছু উপনদী বৃষ্টি জলের জন্য মরে মরে বেঁচে থাকবে। এরফলে বৃহত্তর রাজশাহী, খুলনা,ঢাকা, সিলেট অঞ্চলের প্রায় ত্রিশটি জেলার সত্তর হাজার (৭০,০০০) বর্গ কিলোমিটার এলাকার প্রায় সাতকোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত্ম হবে। খরা, আর্সেনিক, সেচ সমস্যা, শস্য উৎপাদন, মৎস্য ও পশুপাখির খাদ্য উৎপাদন অবিশ্বাস্য রকমে হ্রাস পেয়ে যাবে।

লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমি কৃষি আবাদের যোগ্যতা হারাবে, নৌ পরিবহন হবে ব্যাহত। প্রাকৃতিক পরিবেশ ধীরে ধীরে বদলে গিয়ে মানুষের জীবন ধারা ও চিন্তা চেতনায় আসবে হতাশা এবং কর্মহীনতার প্রকোপ। খাদ্য ও পুষ্টির অভাবে স্বাস্থ্যহীনতা, জ্বরাজীর্ণতা, পেট অসুখ সহ নানাবিদ সমস্যায় ভুগতে থাকবে বাঙালি জাতি।

ভারত ফারাক্কা বাঁধ ছাড়াও ফারাক্কার কাছাকাছি ভাগীরথি নদীর উপর জঙ্গিপুরের কাছে ৩৯ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য ফিডার ক্যানেল তৈরি করেছে। যার ফলে ফারাক্কা পয়েন্টের চলিস্নশ (৪০) হাজার কিউসেক পানি হুগলী ও ভাগীরথি নদীতে সহজেই সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। এছাড়াও ফারাক্কার উজানে উত্তর প্রদেশের কানপুরে গঙ্গার উপর আরেকটি বাঁধ নির্মাণ করেছে ভারত। এতে ব্যয় হচ্ছে প্রায় সাড়ে নয়শো কোটি ইন্ডিয়ান রম্নপি।

প্রায় চারশত পয়েন্ট থেকে উত্তর প্রদেশ ও বিহার রাজ্যের সেচ সুবিধার জন্য হাজার হাজার কিউসেক পানি ওখান থেকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। সুতরাং ফারাক্কা থেকে বাংলাদেশের জন্য আর কতই বা পানি পাওয়া যাবে ? হোক না যতই পানিচুক্তি। বাংলাদেশ তিস্ত্মা বাঁধ এলাকা থেকে একশত কিলোমিটার উজানে জলপাইগুড়ি জেলায় রয়েছে গজলডোবা বাঁধ। এই বাঁধের ফলে শুকনো মৌসুমে মহানন্দায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ‘একহাজার পাঁচশত’ কিউসেক পানি। যার ফলে তিস্ত্মা অববাহিকা এলাকায় বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুষের জীবনে নেমে এসেছে হাহাকার। তদ্রম্নপ তেতুলিয়ার উজানে মহানন্দা বাঁধ, ৪২ কিলোমিটার তিস্ত্মা-মহানন্দা চ্যানেল, জলপাইগুড়িতে করতোয়া ব্যারেইজ উত্তরাঞ্চলের মানুষের জন্য বয়ে এনেছে দুর্যোগ আর দরিদ্রতার মহা অভিশাপ।

অপর দিকে উৎপত্তি স্থল থেকে ব্রম্মপুত্র-যমুনার মোট দৈর্ঘ্য হচ্ছে প্রায় ২ হাজার ৭শত ৩৭ কিলোমিটার। বঙ্গোপো সাগরে পতিত হওয়ার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশ এলাকায় এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে প্রায় ২শত ৭৭ কিলোমিটার। ব্রম্মপুত্র প্রতি বছর পানি প্রবাহের সাথে গড়ে ৫২৭ মিলিয়ন টন পলিমাটি বহন করে। এই নদীর আওতায় বাংলাদেশ প্রায় ৬৭ শতাংশ প্রবাহ পেয়ে থাকে। বাংলাদেশে এই নদীর শাখা উপশাখা হিসেবে ১৩টি নদী উলেস্নখ যোগ্য। যার মধ্যে রয়েছে তিস্ত্মা, করতোয়া, আত্রাই, সুবর্ণ সিড়ি, হুরসাগর, পুরাতন ব্রম্মপুত্র, ধলেশ্বরী, কংস, সুতলা ইত্যাদি।

এসমস্ত নদীর অববাহিকা হলো বাংলাদেশের সবচেয়ে বিস্তৃত অববাহিকা। বিভিন্ন প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় ভারত তার পরিকল্পনা মোতাবেক গঙ্গা-ব্রম্মপুত্র অববাহিকায় পানির তেত্রিশটি (৩৩) সঞ্চয়াগার নির্মাণ করবে। প্রতিটি সঞ্চয়াগারের ধারণ ক্ষমতা হবে ‘একলাখ পঞ্চাশ হাজার কিউসেক’। যার অর্থ হচ্ছে তেত্রিশটি সঞ্চায়াগারে সর্বমোট পানি ধারণ

ক্ষমতা হবে পঞ্চাশ (৫০) লাখ কিউসেক পানি। এ পানি ভারতের পুব, মধ্য ও উত্তরাঞ্চলে সেচ কাজে ব্যবহৃত হবে। এর আওতায় থাকবে তিন কোটি পঞ্চাশ লাখ হেক্টর জমি।

পাশাপাশি উৎপাদন করা হবে ত্রিশ (৩০) হাজার মেগাওয়াট জলবিদ্যুত। সব মিলে খরচা হবে প্রায় একশত থেকে দেড় শত আমেরিকান বিলিয়ন ডলার। এলাহি কান্ডই বটে। বর্তমানে বহুল আলোচিত টিপাইমুখ বাঁধটি ভারতের মনিপুর রাজ্যের চুরাচাঁদ জেলায় অবস্থিত। যা বাংলাদেশের সিলেট সীমান্ত থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার উত্তর পুর্ব দিকে অবস্থিত। বরাক ও চুইভাই নদীদ্বয়ের মিলনস্থল থেকে পাঁচশো মিটার দুরে কঠিন পাথরের পাহাড়ি সংকীর্ণ গিরিখাতে ভারত এই বাঁধ নির্মাণ করে।

বরাক-সুরমা-কুশিয়ারা-মেঘনা হচ্ছে এক অভিন্ন নদী। যার প্রবাহ বাংলাদেশে প্রায় ছয়শত সত্তর কিলোমিটার। সমুদ্রপৃষ্ট থেকে অনেক উঁচুতে এই টিপাইমুখ বাঁধটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৩৯০ মিটার। এই বাঁধের আওতায় ১৫শত মেগাওয়াট জল বিদ্যুত উৎপন্ন হবে আর ড্যাম বা জলাধারে মোট পানি সঞ্চয়ের ক্ষমতা হবে প্রায় ১৬ মিলিয়ন কিউবিক লিটার। এর ফলে বাংলাদেশ পানির প্রাকৃতিক প্রবাহ ও পানি বঞ্চিত হয়ে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ভূ কম্পনের মাত্রা বেড়ে যাওয়া সহ নানাবিধ পরিবেশ প্রতিকুলতার জন্য বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। ব্রম্মপুত্র নদীকে ঘিরে টিপাইমুখ সহ ভারতের আরও ১২টি জলবিদ্যুত উৎপাদন ও জলসঞ্চয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। এর মধ্যে সম্পুর্ণ শেষ হয়েছে ৪টি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে ৩টি এবং পরিকল্পনাধীন রয়েছে আরও ৫টি।

সবগুলো প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ১৩ হাজারের ও বেশি মেগাওয়াটের বিদ্যুত উৎপাদন ক্ষমতা সম্ভব হবে। হিমালয় পর্বতশ্রেণী বাহিত কিছু কিছু নদীর প্রবাহ ভুটান, নেপাল, পাকিস্তান, ভারত হয়ে বাংলাদেশে এসেছে। এ নদীগুলোর উপর প্রায় পাঁচ শতাদিক বাঁধ নির্মাণ করে প্রায় দুই লাখ মেগাওয়াট বিদ্যুত উৎপাদন করার চেষ্টা চলছে দীর্ঘ দিন থেকে। আশ্চর্যের বিষয় এর সঙ্গে বাংলাদেশকে সঙ্গে রাখার কিংবা সহযোগিতা করার কোনো উদ্যোগ নেই। অথচ আড়ম্বরের সাথে ঢাক ঢোল পিটিয়ে করা হয় সার্ক সম্মেলন।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ব্রম্মপুত্র নদীর উত্তর মাথায় যে এলাকা চীনের আওতায় পড়েছে সেখানে 'সাংপোতে' চীন ড্যাম বা বাঁধ নির্মাণ করবে বলে জানা গেছে। চীন এই বাঁধ দ্বারা ব্রম্মপুত্রের জল ডাইবার্ট করে তা গো'বি মরুভূমিতে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করছে। এই নিয়ে হয়তো চীনের সাথে ভারতের মনোমালিন্যতা বাড়তে পারে।
কিন্তু বাংলাদেশের জন্য ভারতের বহুমুখি বাঁধ ও জলনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনাগুলো যে বিশাল দৈত্যের মতো আমাদের ঘাড় মটকাচ্ছে তা থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? কথায় বলে 'নাই

মামার চেয়ে কানা মামাই ভালো'। ন্যায্য পানি থেকে বঞ্চিত হয়েও যদি হাজার দশেক মেগাওয়াট বিদ্যুত পাওয়ার একটা নিশ্চয়তা পাওয়া যেতো, তা হলে ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্কটা আরও মজবুত হতো।

সীমিত নদীর পানি এবং বৃষ্টির পানিকে সঞ্চয়াগারে রক্ষণ করার মাধ্যমে আমরা তা কাজে লাগাতে পারতাম। জানি ভারতের নিজেরই অনেক সমস্যা রয়েছে। বড় বড় অর্থনীতিবিদ, সাংবাদিক ও সমাজ উন্নয়ন গবেষকদের মতামতে ভারত যতই উন্নতির জয়গান গেয়ে যাক না কেন, ভারতে দারিদ্রতা তথা গরিবী হঠাও আন্দোলন এখনও ব্যাপক এবং প্রকট।

এত সমস্যার মধ্যে যদি ভারত প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে অক্ষম হয়, সেটা হবে ভবিষ্যতের জন্য নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মারার সমান।

১৬ ♦ বিছমিলস্নাহর রাজনীতি ও ধর্ম নিরপেক্ষতা ♦

দেশের রাজনীতি এখন বেশ উত্তপ্ত সংবিধানের 'ধর্ম নিরপেক্ষতা' নিয়ে। পত্রিকায় বিভিন্ন লেখকদের কলামে দেখছি নানাবিধ মন্তব্য এবং ধর্মীয় রাজনীতিবিদদের নানাবিধ মারাত্মক হুমকি। ধর্ম নিরপেক্ষতা নিয়ে আওয়ামী লীগের দাপাদাপি ও দেখছি। এসব লিখতে গিয়ে বিদেশের সমাজে প্রচলিত তিন 'ডাবলিউ' এর কথা খুব মনে পড়ছে। ইংরেজী অক্ষর 'ডাবলিউ' দ্বারা গঠিত তিনটি শব্দের উপর মানুষের যে আস্থা নেই তাই বুঝানো হয়।

এই তিন ডাবলিউ দ্বারা বুঝানো হচ্ছে ওয়েদার, (আবহাওয়া) ওয়েমেন, (মহিলা সম্প্রদায়) এবং ওর্য়াক, (কাজ অর্থাৎ চাকুরি)। পশ্চিমা সমাজে যেমন আবহাওয়া ঘন ঘন পাল্টে যায় তদ্রুপ নারীগণ যে কোনো সময় তার মতামত পাল্টাতে একটুও দেরি করে না। অপর দিকে যে কোনো মানুষের চাকুরি বা কর্মের ও ঠিক ঠিকানা নেই। যে কোনো সময় যে কোনো কারণে কাজ বা চাকুরি চলে যেতে পারে।

নিশ্চয়ই বিজ্ঞ কোন লেখক কিংবা সমাজদর্শী মানুষ বাস্তব অবস্থাকে পরখ করেই এমন মন্তব্যটি ছুড়ে ছিলেন বলে এটি এখন মানুষের মনে ও মুখে মুখে উচ্চারিত হয়। সমাজের অবস্থার পরিপ্রেড়িগতে রাজনীতিও নানাভাবে মোড় নেয়। সুতরাং রাজনীতির লাগাম টেনে ধরতে হলে রাজনীতিবিদদের অবস্থা তদ্রুপ তিন ডাবলিউ এর মতো হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আবুল মনসুর আহমেদের 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' পাঠ করুন কিংবা ফয়েজ আহমেদ, তারেক শামসুর রহমান, আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী, বদরউদ্দিন ওমর, আতাউস সামাদ, শফিক রেহমান, প্রমুখ রাজনৈতিক বিশেস্নষক ও সাংবাদিকদের লেখা পড়লে রাজনীতি সম্বন্ধে ওই একই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এর কারণ হচ্ছে রাজনীতিবিদরা সব সময়েই এক ধরনের মানসিক চাপ ও অস্থিরতার মধ্যে সময় কাটান। যদিও অনেক সময় তা বাহ্যিক ভাবে ধরা পড়ে না।

সেই অস্থিরতার কারণ হিসাবে যা উলেস্নখ করা যায় তা হলো (ক) বিরম্নধি দলের বক্তব্যকে কুপোকাত করা (খ) জনমনে আস্থা ফিরিয়ে আনা (গ) জবাবদিহিতা থেকে আত্মরক্ষা (ঘ) নিজের জনপ্রিয়তাকে ধরে রাখা (ঙ) দলের আদর্শ রক্ষা (চ) সমালোচনার জবাব (ছ) বিদেশে নিজ রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি রক্ষা (জ) আত্মীয়-স্বজনকে খুশ রাখা (ঝ) নিজের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবনা (ঞ) সমালোচনার জন্য সমালোচনা (ত) 'আমাদের সিদ্ধান্তই সঠিক' এই আস্থাকে প্রাধান্য দেয়া (থ) জুজুর ভয়ে তো আর বসে থাকা যায় না - মনোভাব (দ) সবার স্বার্থরক্ষা সম্ভব নয় (ধ) উপদেশদাতাদের যুক্তি মাথায় রাখা, ইত্যাদি কারণে রাজনীতিবিদরা প্রতিজ্ঞার বরখেলাপ, সিদ্ধান্তে অটল, ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে ডিগবাজী, ইত্যাদি আচরণ করে থাকেন।

যে বিছমিলস্নাহর রাজনীতি নিয়ে আজকে তোলপাড় হচ্ছে সেটাকে নানা ভাবে বিশেস্নষণ করা যায়। এতে আর কেউ লাভবান হোক বা না হোক দেশের শিড়্গা বঞ্চিত মানুষের সমর্থন আর ধর্মীয় অতি আবেগ প্রবণ মানুষদেরকে উসকানি দিয়ে দেশ ও সমাজে অশান্তির আগুন ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব। সংবিধানে জিয়াউর রহমানের প্রবর্তন করা 'বিছমিলস্নাহ' থাকবে এবং হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম' ও বহাল থাকবে।

আবার সংবিধানের অপর যায়গায় (৮:১) 'সর্ব শক্তিমান আলস্নাহর উপর পুর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' বাক্যটি থাকবে না বলে নানা মন্তব্য হচ্ছে। এখানে 'বিছমিলস্নাহ' ও 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম' শব্দ গুলোর দ্বারা যথাক্রমে বিএনপি পন্থি মুসলিম জনগণের আস্থার প্রতি সম্মান দেখানো আর ধর্মীয় উত্তেজনাকে শান্ত রাখার একটা কৌশল প্রয়োগ করছে আওয়ামী লীগ। অপরদিকে এরশাদ যেহেতু ১৪ দলের সাথে সম্পৃক্ত সেজন্য এরশাদকে ও শান্তনার বড়ি গেলানো হচ্ছে।

'সর্বশক্তিমান আলস্নাহর উপর পুর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা' এই বাক্য দ্বারা বিরম্নধি দল (তথা ধর্মীয় রাজনৈতিক দল) ও আওয়ামী লীগ লুফালুফি করছে। পুর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা ইত্যাদি শব্দগুলো মানুষের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হওয়ায় তার নিজের বিশ্বাসকে ইমানকে দৃঢ় করতে পারে।

কিন্তু একখানা কাগজের সংবিধান মানুষের মতো এসমস্ত শব্দ উচ্চারণ করে নিজের ইমান কিংবা বিশ্বাসের গভীরতাকে জানান দিতে পারে না।
কারণ সংবিধান কোনো মানুষ নয়, আলস্নাহর সৃষ্টি প্রাণী ও নয়। কিংবা আলস্নাহর তৈরি কোন কেতাব ও নয়। সংবিধানে 'ধর্মীয় শব্দ বা বাক্য' থাকলে জনগণ অধিক হারে ধার্মিক হয়ে নামাজ রোজা করবে কিংবা সৎ হয়ে যাবে এমন কোনো গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা নেই।

তদ্রুপ 'ধর্মীয় শব্দ বা বাক্য' না থাকলে দেশের জনগণ অধার্মিক হয়ে নামাজ রোজা ছেড়ে দিয়ে কেবল ঝগড়া ফ্যাসাদে মত্ত থাকবে এমন ও কোনো ভবিষ্যৎ বাণী কেউ দিতে পারবে না। অপর দিকে মুসলিম জাতি হিসাবে শুধু 'আলস্নাহর উপর পুর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা' শব্দটি প্রয়োগ করলেই তা শেষ হয়ে যায় না। আলস্নাহর পরেই আছে রাসুলের উপর আস্থা ও বিশ্বাসের ব্যাপার।

সেই বিশ্বাস যদি না থাকে তা হলে তো ইসলাম ধর্ম কেউ মানবেই না। এর পরেও শুধু রাসুলকে বিশ্বাসের কথা বললে শেষ হয়ে যায় না। রাসুলের সাথে সকল 'আসমানী কিতাবের' উপর 'ফেরেশতাদের' উপর 'ভালোমন্দ ভাগ্যের উপর' 'কবর খানায় জাগিয়া উঠার উপর' 'শেষ বিচার দিনের উপর' থাকতে হবে অগাধ বিশ্বাস।

সুতরাং শুধু আলস্নাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন দ্বারা নিজেকে মুসলিম বলে প্রমাণ দেয়া যায় না। দুনিয়ার প্রায় সকল আদিম জাতি, উপজাতি, অগ্নি উপাসক, এমন কি হিন্দু জাতি ও একজন সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করে। আমেরিকান সরকার ও তার মুদ্রায় লিখেছে 'আমরা গডে বিশ্বাসী' কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় তারা ধর্মে তেমন একটা বিশ্বাসী নয়, আবার বিশ্বাসী হলেও ধর্মীয় কানুনকে তারা তেমন পাত্তাই দিচ্ছে না।

অতএব দেখা যাচ্ছে ধর্ম হচ্ছে সম্পুর্ণ ভাবে মানুষের মনের ব্যাপার, বিশ্বাস ও চিন্তা চেতনার ব্যাপার। তাহলে এই বিশ্বাসকে নিয়ে কেন এত টানা-হেচড়া ? কেন রাজনীতিকে ধর্মের নামে আরও অধিক কলুষিত করা ? এইতো গেল দুই তিন দিনের পত্রিকা গুলোতে প্রকাশ হয়েছে মালয়েশিয়াতে অমুসলিমরা 'আলস্নাহ' শব্দটি ব্যবহার করার কারণে বৌদ্ধদের আটটি গীর্জা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ মৌলবাদী মুসলামানরা মনে করে 'আলস্নাহ' শব্দটি তাদের বাপ-দাদার সম্পদ।

সুতরাং 'আলস্নাহ' শব্দ ব্যবহার করতে হলে তাদের দল তাদের ধর্ম মানতে হবে। অথচ পবিত্র নাম 'মুহাম্মদ' শব্দটি মুসলমানরা ব্যবহার করেন বিনা বাধায়। এই 'মুহাম্মদ' নামধারী কত লোকেরা চুরি চামারি, বদমাসী, বাটপাড়ি করছে তাতে ধর্মের ইজ্জত যায় না, রাসুলকেও অপমান করা হয় না।

এই ধর্মের নামে রাজণীতির কারণে গত বৎসর ঢাকার বয়তুল মোকার্‌রমে নামী দামী ওলামাগণ মসজিদের ভেতরেই জুতা ছুড়াছুড়ি (ইটাইটি) করেছেন। পাকিস্ত্মানে তো মসজিদে হামলা করা একটি নিয়ম হয়ে গেছে। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলের নাম করন নিয়ে কী বিশ্রি কা-কারখানা হলো তার নীরব সাড়্গী সিলেটের জনগণ।

নামাজের ছুরা ফাতিহাতে 'দোয়ালস্নীন ও জোয়ালস্নীন' শব্দ নিয়ে কত যে দাঙ্গা ও রেষারেষি তার শেষ নেই। অথচ বিদেশে এসে এনিয়ে ঝগড়া হলে মসজিদে তালা ঝুলবে তাই আলাদা আলাদা মসজিদ তৈরির চলছে প্রতিযোগিতা। এছাড়া ফা- এবং মসজিদ কমিটি নিয়ে ঝগড়া ও মনোমালিন্যতা তো আছেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ধর্ম নিয়ে শান্ত্মির বাণী আওড়ালেও বাস্ত্মবে এনিয়ে রক্তপাত করতে কেউ দ্বিধাবোধ করেন না।

প্রত্যেকেই নিজস্ব আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য দেহ-প্রাণ বিসর্জন দিতে রাজী। অথচ যারা মাঠে মারা যায় তারা কেউই নেতা নয় কিংবা নেতার পুত্র কন্যা ও নয়। যারা যায় তারা কর্মী, সমর্থক ইত্যাদি আবেগপ্রবণ হুজুগে বিশ্বাসী ছাত্র ও সাধারণ মানুষ। সুতরাং ধর্ম নিয়ে যারা রাজনীতি করে তারা জনগণকে দাঙ্গা ও ঝগড়ার ময়দানে ঠেলে দিয়ে কেবল নিজেদের স্বার্থ ও নেতৃত্বকে রড়্গা করে। যে বা যারা ড়্গতিগ্রস্থ হয় তারা বাস্ত্মবে আশ্বাস ও প্রতারণা ছাড়া কিছুই পায় না।

দারিদ্রতার চরম যাতাকলে তাদের জীবন অতিবাহিত করতে হয়। তাই সকল বিবেকবান মানুষের কাছে প্রশ্ন রাখছি রাষ্ট্রে 'ধর্ম নিরপেক্ষতা' এই শব্দগুলো নিয়ে কেন একদল মানুষের এত মাথা ব্যথা? কেন সমাজে ও জনমনে এত উত্তেজনা ও অশান্ত্মি আনয়নের এত পায়তারা? 'ধর্ম নিরপেড়্গতা' প্রয়োগ কিংবা বাস্ত্মবায়িত হলে ক্ষমতাসীন সরকার কি প্রত্যেকের ঘরে ঘরে একজন করে দার্জ্জাল পাঠিয়ে দেবে ? যে দার্জ্জাল কাউকে ধর্ম কর্ম করতে দেখলেই তার কলস্না কেটে ফেলবে ? হায় ! এদেশের মানুষ রাজনীতিবিদ ও গোঁড়াপন্থীদের দ্বারা আর কত নাকানি চুবানী খাবে।

১৭♦ পাকিস্তান রাষ্ট্রটি আর আমাদের কত জ্বালাবে ? ♦

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট ধর্মের উপর ভিত্তি করে পাকিস্ত্মান রাষ্ট্রটির জন্ম হয়েছিল। দেশটি স্বাধীন হওয়ার পর পর কাশ্মীর নিয়ে ভারতের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। তারপর পুর্ব-পাকিস্ত্মান অর্থাৎ আমাদের এই বাংলাদেশকে করতে থাকে শোষণ। চীনের সকল পণ্য দ্রব্যাদি আমরা পেতে থাকি এই দেশে। উন্নয়ন ঘটতে থাকে কেবল পশ্চিম পাকিস্ত্মানে। এক রাষ্ট্র হয়েও রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে চলতে থাকে বৈষম্যতা। শুরম্ন হয় ভাষা কেড়ে নেয়ার ফন্দি, সংস্কৃতিতে আসে আঘাত। বুনিয়াদি গণতন্ত্রের নামে চলতে থাকে মৌলবাদী ও মওদুদিবাদী ধর্মের আমদানি আর উর্দু কেতাবের ব্যবসা।

১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে বেহুদা একটা যুদ্ধ বাঁধিয়ে এবং "শত্রম্ন সম্পত্তি" নামে একটি আইনের চালু করে উসকে দেয়া হয় সাম্প্রদায়িকতাকে। তারপর উনিশশো- উনোসত্তরে শ্রদ্ধেয় শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামী করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্রের মামলা ' চাপিয়ে দেয়া হয় স্বাধীনচেতা বাঙালি রাজনীতিবিদদের কাঁধে। দেশটি জন্মের পর থেকেই বিদ্বেষ সাম্প্রদায়িকতা আর ষড়যন্ত্রের আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে। "দেশ ধ্বংস হয়ে যাক তবু ও বাঙালির হাতে ক্ষমতা দেবো না" পাকিস্ত্মানি রাজনীতিবিদদের এই হীনমন্যতার কারণে শুরম্ন হলো বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন।

একাত্তর সালের ২৫শে মার্চ রাতে নিরীহ ঘুমন্ত্ম বাঙালির উপর ওরা অস্ত্র নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে হত্যাযজ্ঞ আর রক্তের হুলি খেলায়। হাজার হাজার মা বোনদের ইজ্জত আর লড়্গ লড়্গ প্রাণের তিরোধানে আমরা হয়েছি বিধ্বস্ত্ম। যুদ্ধের ক্ষতিপুরণ তো রয়ে গেল, রয়ে গেল আরও কত না বলা অশ্রম্ন-ভেজা বুক ফাটা আর্তনাদের ইতিহাস।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও আমরা শান্তি পাই নি ওদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে। উনিশশো বাহাত্তর থেকে চুয়াত্তর সালের মধ্যে পাকিস্ত্মান থেকে অনেক বাঙালি সামরিক অফিসার ও সৈন্য বাংলাদেশে ফেরত আসে। এসময় অনেক অফিসার এবং সৈন্যদের মগজ ধোলাই করেছিল তৎকালীন পাকিস্ত্মানের সামরিক বাহিনীর কয়েক জন অফিসার ও তাদের গোয়েন্দা সংস্থা এস.আই.এস। ওরা মৌখিক প্রতিজ্ঞা করে এসেছিল বাংলাদেশকে পাকিস্ত্মানি ও ইসলামি আদলে গড়ে তুলতে সর্ব প্রকার সহযোগিতা দেবে। এই প্রতিজ্ঞার কারণে তারা তাড়াতাড়ি বাংলাদেশে ফেরত আসার সুযোগ পায়।

এই কারণে ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক হত্যাকা-ের পর খুনিদেরকে লিবিয়ায় পাঠানোর জন্য তড়িৎ গতিতে ব্যাংককে পাকিস্ত্মানের বিমান এসে হাজির হয়। তারিখটি ছিল ৪

নভেম্বর ১৯৭৫ সাল অর্থাৎ রাজনৈতিক নেতাদের জেল-হাজতে হত্যার পরদিন। এরপর থেকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী চেলা-চামু-াদের দ্বারা অপরাজনীতির ছত্র-ছায়ায় আমরা হয়েছি ক্ষত-বিক্ষত। বাংলাদেশকে সম্পূর্ণভাবে মৌলবাদী ও মওদুদিবাদী কায়দায় গড়ে তুলার জন্য পাকিস্ত্মানি প্রশাসন এবং তাদের গোয়েন্দা সংস্থা এস.আই.এস অবিরত ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং বাংলাদেশকে রাষ্ট্র হিসাবে মেনে না নেয়ার জন্য যারা একাত্তর সাল থেকে বিরম্নধিতা এবং ষড়যন্ত্র করে আসছিল তারাই হত্যা আর অস্ত্রের জোরে হয়ে গেল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক। এতেকরে মানুষের ন্যায়িক অধিকার আর গণতন্ত্রের হলো অপমৃত্যু। বিশ্ববিদ্যালয় আর শিড়্গা প্রতিষ্ঠানের আবাসিক হল গুলো হয়ে উঠলো সাম্প্রদায়িকতা আর ধর্মীয় রাজনীতির নামে সন্ত্রাসের আখড়া। বাংলাদেশের মাদ্রাসা থেকে প্রচুর ছাত্ররা পাকিস্ত্মান আর আফগানিস্ত্মানে মোজাহিদিন আর তালেবানী শিড়্গায় হয়ে উঠলো বেপরোয়া।

(প্রমাণ: ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার প্রতিবেদন) ধর্মের নামে মসজিদ মাদ্রাসা স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সংগঠনের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ রেয়াল, দেহরাম দিনার ইত্যাদি বৈদেশিক মুদ্রাগুলোর ঝনঝনানিতে বাংলাদেশের ইসলামী সংস্থাগুলোর ব্যাংক ও বীমার ফান্ড ফুলে উঠেছে। এই ধারা আজো অব্যাহত আছে।

দেশ স্বাধীনের পর অবাধ হারে সাধারণ শ্রমিক শ্রেণী মধ্যপ্রাচ্যে গমনের সুযোগে অর্থ সংগ্রহের (ফা- রাইজিং) ব্যবস্থাটি আরও সহজ ও পাকাপোক্ত হয়। পাকিস্ত্মান রাষ্ট্রের সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন গোপন সংস্থাগুলো এসব কাজের জন্য সর্বদাই সকল প্রকার সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য ভারতের ড়্গতি করা আর বাংলাদেশকে পাকিস্ত্মান বা আফগানিস্ত্মানের মতো রাষ্ট্র বানিয়ে ধর্মের নামে একটি "ধর্মীয় শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থকে" টিকিয়ে রাখা।

মসজিদ মাদ্রাসা স্থাপন এবং হেফাজত এগুলো হচ্ছে লোক দেখানো সাইনবোর্ড। অধিকাংশ ইমাম কিংবা প্রিন্সিপাল এখনও এসব ভেতরের খবর জানেন না। সুতরাং বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ রড়্গার্থে ধর্মীয় রাজনীতি অত্যন্ত্ম ফরজ হয়ে পড়েছে। আর এই রাজনীতিকে ধরে রাখতে হলে অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে ও মজবুত রাখতে হবে।

একারণে এদেশের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমুহকে নিজেদের করায়ত্ব করার জন্য ভেতরে ভেতরে আছে প্রচ- প্রতিযোগিতা। দ্রব্যমুল্য নিয়ন্ত্রণ, শেয়ার বাজারে নিজেদের দাপট,

জঙি ও রগকাটা গ্রুপদের তোষণ, ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাছে ও বাংলাদেশের ইসলামী ছাত্র গ্রুপের কাছে অস্ত্র ও বোমা তৈরির যন্ত্রপাতির চালান অব্যাহত আছে সময়ের নানা আবর্তে। বৈদেশিক সাহায্যের টাকায় পাকিস্থানে ছাপা হয় উর্দু কেতাব। সেই কেতাবগুলো আমদানি হয় বাংলাদেশের সকল মাদ্রাসাতে। এতে বিরাট মুনাফা হয় পাকিস্থানি গ্রুপের।

এর ফলে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির কোনো মুল্যায়ন যেমন হচ্ছে না, তেমনি আন্তর্যাতিক ভাষা ইংলিশের ও কোনো উন্নয়ন ঘটছে না । নিজ মায়ের কোলেই বাংলা ভাষা হচ্ছে অপমানিত। বাংলা ভাষায় কি ধর্মীয় পুস্তক নেই ? কিংবা উর্দুর বদলে বাংলা ভাষায় কি বই ছাপানো যায় না ? আমাদের বুকের উপরে কেন আজো এই উর্দু সংস্কৃতি ? এই কেতাব আমদানির নামে, ব্যবসায়ীদের কাপড় আমাদানির উছিলায় কোটি কোটি টাকার বিদেশী জালমুদ্রা ও আসছে আমাদের মাতৃভূমিতে। (জানুয়ারী ২৩-২৪, ২০১০ প্রথম আলো, নয়া দিগন্ত, আমাদের সময়)

মাঝে মাঝে এয়ারপোর্টে ও দেশের কোনো কোনো বর্ডার এলাকায় ধরা পড়ে বৈদেশিক মুদ্রার পাচার এবং স্বর্ণ ও হিরোইন পাচারের ঘটনা। **ইসলামী নামধারী গ্রুপ গুলো তো আর প্রকাশ্যে সুদের ব্যবসা করতে পারে না তাই অর্থনৈতিক ভাবে মজবুত থাকার জন্য এসমস্থ গোপনীয় ব্যবসা নানা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে তারা করে থাকে**। টরন্টো থেকে প্রকাশিত "সাপ্তাহিক বাংলা কাগজের" ১৬ই ফেব্রুয়ারী ২০১০ সংখ্যার **সম্পাদকীয়তে** প্রকাশ পেয়েছে জামাত শিবিরের সহযোগী জঙ্গীদের অর্থায়নের বিশেষ খবরটি।

এছাড়া প্রথম পাতায় ৪০ উগ্রপন্থী দলের কা-কারখানা ও শেষ পাতায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিবিরের সংগঠন, সংযোগ ও নেটওর্য়াক সম্পর্কে প্রকাশিত হয়েছে অনেক তথ্য। পাকিস্থানের জামাআত-এ ইসলামী ও তার সহযোগী সাঙোপাঙো শাখা সংগঠনগুলো কি ভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে তা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত আরও অনেক পত্রিকার তথ্য থেকে জানা যায়।

এরা সবাই এখন বাংলাদেশকে তাদের সবচেয়ে নিরাপদ স্থান মনে করছে। আফগানিস্থানের মতো শ্বাপদসঙ্কুল ও বিশাল ও দুর্গম পাহাড় সমুহ না থাকলেও এদেশের সাধারণ মানুষের ধর্ম বিশ্বাসকে পুঁজি করে মসজিদ ও মাদ্রাসার সমর্থনে তারা তাদের সমস্থ নাশকতামুলক কার্যকলাপ চালিয়ে যাবার জন্য বদ্ধ পরিকর। বিশ্ব ইজতেমার সময়ে বিভিন্ন দেশ থেকে আসে অনেক বিদেশিরা।

এই সময়ে ওরা এই দেশের মাটিতে এই দেশেরই জন্ম নেয়া কুলাঙ্গারদের সহায়তায় আন্তর্যাতিক চোরাচালান সহ অন্যান্য নাশকতামুলক ব্যাপারে শলা পরামর্শ করে। এসময়ে তারা একে অন্যের সাথে সৌজন্য সাড়্গাতে মিলিত হয়, লাভ লোকসানের হিসাব হয়। কোন বিরম্নধি গ্রম্নপ? কোন সাংবাদিক? কোন লেখক? কিংবা কোন রাজনীতিবিদ তাদের পথের কাঁটা? ওই সব তারা হিসাব নিকাশ করে। তারপর ভাড়া করা হয় অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের। এভাবে বিচিত্র ও অবিশ্বাস্য পথে চলছে পাকিস্তানের ইন্ধনে এদেশের ধর্মীয় রাজনীতি।

পাকিস্তান আর পাকিস্তানীতে বিশ্বাসী মানুষগুলো শুধু ইসলাম ও ধর্মের গান গায় অথচ খোদ পাকিস্তানে বাংলাদেশের প্রায় ৩৩ হাজার যৌনকর্মী রয়েছে। (ঢাকা: বুধবার, ১৫ই জুলাই, ২০০৯ ইত্তেফাক সম্পাদকীয়) আর ভারতে যে কত হাজার আছে তা লেখা জুখা নেই।

অথচ ইসলামিক রাজনীতি হিসাবেও এই নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো কথাবার্তা নেই। বাঙালিদের এত বেইজ্জত করার পরও এখন সেই বাঙালি নারীরা সে দেশে যৌনকর্মে নিযুক্ত এটা কি দেশ ও সমাজের জন্য অবমাননা নয় ?।

কারা চাকুরির নামে নারী পাচার করে ? একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখুন। এনিয়ে মৌলবাদী কিংবা মওদুদিবাদি কারো মুখে কোনো কথা নেই। সুতরাং যে পাকিস্তান আমাদের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার জন্য, আমাদের স্বাধীনতাকে মেনে না নেয়ার জন্য, আমাদেরকে অপমান করার জন্য আমাদের পেছনে লেগেই আছে ঘর-শত্রম্ন বিভীষণদের সহায়তায়।

সেই পাকিস্তানের সাথে কুটনীতি যোগাযোগ সহ সকল প্রকার আদান প্রদান বন্ধ করা কি উচিত নয় ? পাকিস্তানের সাথে আমাদের কি এমন ব্যবসা ? যা না করলে আমরা উপোস মরে যাবো?

পাকিস্তান তো সেই জাতি, যারা আমাদেরকে সাম্প্রদায়িক মনোভাবে নিম্ন বর্ণের মানুষ মনে করে এবং বিদ্বেষ করে। যাদের মুখে সর্বদাই খই ফুটে 'খোদা কি কসম' আর 'শালা বেহেনচ্যোদ' বাক্যের শব্দাবলী, তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা কতটুকু প্রয়োজন ? এরা আমাদের আর কত কাল জ্বালাবে ?

১৮ ♦ জাতীয় বিপস্নব এবং সংহতি দিবস ♦

১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ আগষ্ট সামরিক বাহিনীর জুনিয়র অফিসাররা পরিষ্কার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পরিকল্পিত ও কলঙ্কিত হত্যাকা-টি ঘটায়। অথচ সিনিয়র অফিসাররা বলেন তারা কিছুই জানতেন না। এসব মিথ্যাপনা ও শঠতার কেউটে সাপেরা যে ভাবে হিংসার নীল নক্সায় ক্ষমতায় এসেছে তা কোনো বিবেকবান নাগরিক মেনে নিতে পারে না। বিরোধী দল ও তাদের দোঁসর সামরিক বাহিনীর সেসব লোকেরা যদি রাতের আধারে হত্যাকা- না ঘটিয়ে হরতাল আন্দোলনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ও তার সরকারের পতন ঘটাতো (যে ভাবে হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদকে গদি থেকে নামানো হয়েছিল) তাহলে তা হতো বৈধ এবং তারা পেতো আজীবন সম্মান ও প্রশংসা।

সেই নীলনক্সার প্রধান সহযোগী নায়ক খন্দকার মোশতাকের তিরাশী (৮৩) দিনের রাজত্বে কি ঘটে চলেছে জনগণ অনেক কিছুই জানতে পারে নি। জনগণ ছিল ভয় উৎকণ্ঠা ও চরম দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে। সেই সাত নভেম্বর **'জাতীয় সংহতি দিবস ও বিপস্নব দিবস,** হিসাবে অবৈধ ভাবে সমাজে বার বার প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেও দেশের অধিকাংশ জনগণ তা অস্বীকার করে। সংহতি মানে কি? তা কি বিএনপির প্রধানমন্ত্রী বলতে পারেন? সেদিন কি সারা বাংলাদেশের মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে পঙপালের মতো দেশ ছেড়ে পলায়ন করে গিয়েছিল ? যে কারণে তাদেরকে ঐক্যের জন্য ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল।

সে দিন কি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জনগণ নানা দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল ? যে কারণে তাদের মধ্যে ঐক্য আনার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছিল। কতকগুলো বখাটে সিপাহী ও বখাটে জুনিয়র অফিসার নিজ নিজ লোভ ও স্বার্থের কারণে মারামারি করেছে এতে জনগণের কি আসে যায় ? তাদের মারামারির কারণে জনগণের গায়ের চুল পড়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। যেজন্য ঐক্য বা সংহতির ডাক দিতে হবে। এই সংহতি দিবস হচ্ছে জাতির গায়ে একটি অনাকাঙ্খিত বিষফোঁড়া। চামড়ায় বিষফোঁড়ার দাগের মতো এটা একটা অমোচনীয় কলঙ্ক। ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে ইত্তেহাদ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত এক মুদ্রিত ইশতেহারে অলি আহাদ 'সাত নভেম্বরকে' বলেছেন পনেরই আগষ্টের প্রতিধ্বনি।

এই উক্তি থেকে এটা প্রকাশ্যই বুঝা যাচ্ছে যে, এই ষড়যন্ত্রে কাদের মদদ ছিল ? ওই দিন কিভাবে সিপাহী জনতার ঐক্যের বিপস্নব হয়েছিল তা **'ঢাকাবাসী'** ব্যতীত দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষেরা খুব একটা জানতো না। শৃঙ্খলাহীন ও মূল্যবোধহীন সিপাহীদের হাতে অস্ত্র থাকায় সেদিন **'ঢাকার জনগণ'** ভয়ে ত্রাসে লোক দেখানো সমর্থন দিয়ে সিপাহীদের

সাথে মায়াকান্নার মতই মায়ার হাসি হেসেছে। তারা জানতো শত চেষ্টা করলেও পনেরো আগষ্ট ও তিন নভেম্বরর নিহত লোকগুলোকে তো আর জীবিত করা যাবে না।

ওই সময় সিপাহীদের সাথে আরও যোগ দিয়েছিল তৎকালীন মুসলিম লীগের সমর্থক এবং আত্মগোপন করে থাকা বকধার্মিক স্বভাবের স্বাধীনতা বিরোধী চক্র। শুধু তাই নয়, জ্বীর্ণ বাংলার সেই মসনদ খানিতে ভাগ বাটোয়ারা বসানোর জন্য জাসদ পার্টির নেতা, কর্মীরাও ঐ বিশৃঙ্খল দিনগুলোতে অবৈধ সরকার ও সিপাহীদের সাথে স্বার্থের হাত মিলিয়েছিল।

ঢাকায় অবস্থিত জনগণ এই অস্বস্থিকর পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য সেদিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাস্তায় নেমেছিল। বাদবাকি '**তেষট্টি জেলার জনগণ**' দেশে কি হচ্ছে তা প্রকৃত ভাবে জানতো না, এবং তারা কোনো সিপাহীদের সমর্থন দেয় নি, মিছিলও করে নি। দেশের সমস্ত পত্রপত্রিকা এর জ্বলন্ত প্রমাণ। তেষট্টি জেলার সাংবাদিকগণ সেদিন নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে যান্ নি। সুতরাং এটা সমগ্র জনগণের বিপস্নব কিভাবে হল?

সকল বিবেকবান মানুষের মতো আমারও এটা একটা প্রশ্ন ? কেবল মাত্র "ঢাকা শহরের" অধিবাসীগণ যদি জনগণ হিসেবে রাষ্ট্রীয় আখ্যা পায় তাহলে বাকি **তেষট্টি** জেলার মানুষকে কি বলে আখ্যা দেয়া যাবে ? নাকি গদি দখলের প্রতিযোগিতায় 'বিপস্নব ও সংহতির, নামে এভাবে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে হিসাব থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে ?

বাংলাদেশে যে হরতাল (খালেদা, হাসিনা সরকারের আমলে) হয়েছে এবং হচ্ছে তা কিছুতেই গণতন্ত্রের নিয়ম কানুনে পড়ে না। বাংলাদেশে হরতালের নামে যা হয় তা হলো একধরনের সম্মিলিত সন্ত্রাস, সম্মিলিত হঠকারিতা, সম্মিলিতভাবে জেদ মেটানো। যানবাহন ভাঙা থেকে শুরু করে মানুষ হত্যা, জনগণের সম্পত্তির বিনাশ, সেই সুযোগে মানুষের মালামাল লুট, গরিব দিন মজুরদের উপর অযথা হয়রানি ও অত্যাচার ইত্যাদি হচ্ছে হরতালের উদ্দেশ্য। এখানে সরকার অপেক্ষা মানুষ'ই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বেশি।

অতএব যারা প্রকাশ্য দিবালোকে ডাকাতি করার মতো জনগণের ক্ষতি সাধন করে, তারাই আবার বেহায়ার মতো যখন বলে 'এটা তাদের জনকল্যাণের রাজনীতি' তখন মগজে কত ডিগ্রী তাপ সঞ্চারিত হয় তা হল্ফ করে বলা মুশকিল। একদল সর্বদাই আরেক দলকে দোষানাশা করে যাচ্ছে। যেন সবাই পুতপবিত্র ফেরেশতা, নিজের চুল বরাবর দোষত্রম্নটি নেই। আসলে এসব ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া কর্মের মধ্যে কিছু সংখ্যাক বেয়াড়া রাজনীতিবিদরা মনোবিকৃতিমুলক আনন্দ পায়।

যা তারা প্রকাশ করতে পারে না অথচ তা বন্ধও করতে পারে না। একদল ভুল করে আবর্জনা খেয়েছে বলে অন্যদল সেই জিদে আবর্জনা খাবে এমন মনোমানসিকতা দিয়ে রাজনীতি হয় না। এটা কোন রাজনীতির পরিচয় নয়, দেশপ্রেমের ও লক্ষণ নয়। শেখ হাসিনার জীবনে সরকার চালানোর অভিজ্ঞতা ছিল না, এখন দেশ চালাতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন যে, হরতাল কত বড় ভুল।

আর এই ভুলটা বুঝতে পেরেই হয়তো তিনি হরতালের বিপক্ষে এমন বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু বিএনপি দলের সরকার চালানোর অভিজ্ঞতা ছিল, তাদের দলে প্রাক্তন পাকদরদী মুসলিম লীগের ঝানু উপদেশ দাতারাও আছেন, সুতরাং সেই অভিজ্ঞতায় হরতাল গণতান্ত্রিক উপায়ে (কারো জানমালের ক্ষতি না করে) করার দৃষ্টান্ত স্থাপন তারা কেন করছে না ?

কেন তারা হাসিনা সরকারকে ও দেশের জনগণকে এটুকু বুঝতে দেন না যে, তারা আওয়ামী লীগের মতো হরতাল সন্ত্রাসী নয় ? তারা আওয়ামী দলের ভুলের মতো ভুল করবে না। তারা করবে গঠনমুলক রাজনীতি, তাহলে তাদের প্রতি আমাদের সমর্থন থাকতো আপাদমস্তক। আর এই সঙ্গে অপরিণামদর্শী হাসিনা সরকার ও উচিত শিক্ষা পেতো পরবর্তী নির্বাচনের ফলাফল দেখে।

১৯♦ ছোট্ট মুখে বড় কথা♦

প্রিয় পাঠক, আজকে আমি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রতিবেশী মুলক আচরণ ও যুদ্ধের কথাই লিখবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কারণ বিষয়টি এখন বাংলাদেশের রাজনীতির মাঠে একটা হট বা উত্তপ্ত বিষয়। ভারতের সাথে বাংলাদেশের কি রকম সম্পর্ক থাকা উচিত তা বিবেকবান মানুষদের শেখাতে হয়না। পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্র কোনো প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতময় সম্পর্ক জিইয়ে রেখে লাভবান হয়েছে এমনটি আমার জানা নেই।

প্রথমে নিজের সমাজের দিকে চক্ষু মেলে দেখুন ; যখন একই মায়ের পেটের দুই ভাই তাদের হিস্যা কিংবা আম গাছ নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় তখন বিচারের জন্য বৈঠকের পর বৈঠক হয়। প্রতিবেশী গ্রাম থেকে বুদ্ধিমান মুরব্বীরা আসেন বিষয়টি শান্তি পুর্ণ ভাবে ফয়সালা করার জন্য। অনেক সময় উভয় পড়োর নামী ও জ্ঞানী গুণী আত্মীয় স্বজন পর্যন্ত এসে বিষয়টি নিস্পত্তি করার জন্য অংশ গ্রহণ করেন।

জরীপে দক্ষ লোক, দলিল লেখক অনেকেই এসব বিচার মীমাংশায় অংশ নিয়ে বিষয়টি শেষ করতে চান। স্থানীয় চেয়ারম্যান এবং মেম্বারগণও প্রায় উপস্থিত থাকেন। অন্দর মহলের নারীগণ কয়েক দিন পর পর এসব পঞ্চায়েতি বিচার ও বৈঠকের কারণে চা নাস্তার আঞ্জাম

ও ঠেলা সামলাতে গলদঘর্ম হয়ে উঠেন। বিচারক, শ্রোতা, দর্শক অনেকেই বিরক্ত হয়ে উঠেন। তবুও বিষয়টি সহজে নিস্পত্তি হতে চায় না।

এটাই আমাদের সমাজের বাস্তবতা। অথচ যে রাজনৈতিক দলের পা-ারা ভারত বাংলাদেশের সম্পর্ক নষ্ট করেছে কিংবা এখনও নষ্ট করার জন্য উস্কানি দিচ্ছে তারা কি ভাবে আশা করে যে বাংলাদেশের একজন প্রধানমন্ত্রী রাতারাতি ভারত বাংলাদেশের সমস্যা একদিনে সমাধান করে ফেলবেন?

যেখানে দুই পরিবারের ঝগড়া মেটানোর জন্য সাত গাঁওয়ের মানুষকে গলদঘর্ম হতে হয়। মাসের পর মাস এমন কি বৎসরের পর বৎসর গড়ায় তবুও বিরোধ ও শত্রুতা শেষ হয় না। সেখানে দুইটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়াদি কী ভাবে এত তাড়াতাড়ি শেষ হবে ? সমস্যা তো একদিনে সৃষ্টি হয় নি। আমরা প্রত্যেকেই জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছি কোনো মানুষকে কিংবা তার গোষ্ঠীকে গালাগালি করে, দাপট দেখিয়ে কিংবা ডা-া মেরে কখনও নোয়ানো যায় না।

মানুষ বরং আরও বেশি বেঁকে বসে। অথচ সুসম্পর্ক বন্ধুত্ত কিংবা ভালোবাসার শাসন দিয়ে যে কোন কঠিন কাজ ও সহজ ভাবে করা যায়। পৃথিবীর বাস্তবতা এটাই যে (ক) কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয় (খ) উপকারির উপকার স্বীকার করতে হয় (গ) ছোট্ট মুখে বড় কথা, জন্ম দেয় ভালোবাসার বদলে ঘৃণার (ঘ) ইদুর হয়ে বাঘের মতো লাফালাফি উদ্রেক করে তাপ্পড় লাগানোর মনোবৃত্তি।

বাংলাদেশের বিরুধি রাজনৈতিক দলের মাথামোটা লোকগুলোর মাথায় উলিস্নখিত চারটি বিষয়ে যদি নুন্যতম জ্ঞান থাকে তবে তারা নিশ্চয়ই পত্র-পত্রিকায় আবোল তাবোল বক্তব্য দিতেন না। চীন এবং জাপানের লোকেরা ভাত খায়। এই খাদ্যশক্তির বিনিময়ে তাদের বুদ্ধির কমতি নেই। আমরা ও ভাত খাই কিন্তু সেরকম বুদ্ধি নেই কারণ কি ? কারণ আর কিছু নয় আমাদের রক্তগুলো দুষিত হয়েছে বিদেশী রক্ত ও বিদেশী ধর্ম আমদানি করার কারণে।

এরা আদিম ভাবেই কলহপ্রিয় জাতি। তাই ঝগড়া করার ছুঁতা এরা খুঁজতেই থাকে অহরহ। তারা আমাদের জাতীয়তাবাদ পছন্দ করে না, ভাষা পছন্দ করে না, নিজের নামের শেষে যে বিদেশী টাইটেল আছে সেটাও মুছতে চায় না। এরা রাজনীতির খোলা মাঠে বলে বেড়ায় আমরা খিলজীর বংশধর, আমরা ফিরোজ শাহের বংশদুত, আমরা মুজাদ্দেসে আল-ফেসানীর উত্তর সুরি, আমাদের দেহে শাহ ওয়ালি-উলস্নাহর রক্ত প্রবাহিত।

(জামায়াতী নেতাদের হুঙ্কার) এই তো ফাঁসির আগে বঙবন্ধু হত্যা মামলার আসামী শাহরিয়ার রশিদ দম্ভ ভরে বললো "আমার রক্তে আলী করমুলস্নার রক্ত প্রবাহিত, আমার পুর্ব পুরস্নষরা ইয়েমেনের অধিবাসী, আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না। আমাকে কলমা ও পড়ানো লাগবে না, কলমা আমার জানা আছে"।

এরকম প্রচ- দম্ভ আর অহঙ্কার নিয়েই এরা তৃণমুল বাঙালির মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খায়। এদের তথাকথিত উত্তরসুরিরা যখন এদেশে আসে তখন কোন স্বদেশী মহিলা তারা সঙে করে আনে নি। এদেশের বাঙালি মহিলাদের তারা বিয়ে শাদী করে স্থায়িত্ব লাভ করে। এখন প্রশ্ন হলো এসব বাঙালি মহিলা কারা ছিল ? এরা ছিল এদেশের তৃণমুল বাঙালিদের কন্যা। এই তৃণমুল বাঙালিদের মধ্যে ডোম, চ-াল, মাইমাল, কামার, কুমার তাতী ও কৃষকরা ছিল প্রধান। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার কারণে ও জাত পাত বিভেদের কারণে এরা অধিকাংশই মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়।

সুতরাং এসব মহিলাদের বিয়ে করে যাদের বাপ দাদারা এদেশে থেকে গেছে, তারা ভালই জানে মায়ের গর্ভে দশমাস কার রক্ত পান করে এদের জন্ম হয়েছে ? সুতরাং আমরা খিলজীর বংশধর, কিংবা মুজাদ্দেশে আল-ফেসানীর উত্তর সুরি এসব কথা না বলে আমরা ডোম, চ-াল,মাইমাল প্রভৃতি মায়ের রক্তে প্রতিপালিত হয়েছি বলে গর্ব করলে সত্য ও সুন্দরের প্রতিধ্বনি ভালই মানাতো। কিন্তু এসব বেহায়া রাজনীতিবিদরা যারা নিজের বংশ পরিচয় জানে না, তারা আবার কি রাজনীতি করবে ?

মিথ্যাই যাদের বেসাতি, মিথ্যাই যাদের অহংকার, তারা'তো কলহপ্রিয় জাতি হবে তাতে আর সন্দেহ কি ? তারা আজো চায় মধ্যপ্রাচ্যের মতো আমাদের এই নিরীহ জাতিটা যুদ্ধে কলহে অশান্তিতে ডুবে মরস্নক। তাই ঘুরে ফিরে ভারতের জুজুর ভয় বার বার আমাদেরকে দেখায়। হিংসা ও হানাহানির লড়্যে ধর্মকে ব্যবহার করে এরা সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয়ে দেশ ও সমাজের সর্বনাশ ঘটাতে চায়। অথচ ক্ষমতায় থাককালীন অবস্থায় সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক নিরীহ মানুষ হত্যার বিরস্নদ্ধে কোনো পদক্ষেপই এদের নিতে দেখি নি। শত্রস্নতা শুধু একদিনে গড়ে উঠে না, দিনের পর দিন নানা কারণে এটা গড়ে উঠে।

শত্রস্ন যখন পুরো মাত্রায় বেড়ে উঠে তখন তাকে শায়েস্তা করতে কেউ পিছ পা হয় না। কেউ আন্তর্যাতিক আইনকের তোয়াক্কা করে না। মানুষ যখন রাগান্বিত হয় কিংবা জাতি যখন উস্কানীতে ভেঙে পড়ে তারা তখন আর মৃত্যুকে পরোওয়া করে না। আজকের বিএনপি সহ সকল বিরস্নধি রাজনীতিবিদ ও তাদের সমর্থকরা চায় পাকিস্তান কিংবা আফগানিস্তান যে ভাবে চুরমার হচ্ছে তৃণমুল বাঙালির জীবনও তদ্রস্নপ হোক। কারণ যারা পরের মাথায় কাঁঠাল

ভেঙ্গে খায়; তাদের সন্তান সন্ততিরা কখনও যুদ্ধে যায় না, তাদের ঘর-বাড়িতে ও আগুন লাগে না, যে কোনো উছিলায় তারা নিরাপদ থাকে।

তাই তারা শত্রু সৃষ্টির জন্য সর্বদাই কল্পিত শয়তানের মতো পথ খুঁজে বেড়ায়। আজ যদি প্রতিবেশী দেশকে চরম শত্রম্ন হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এর জের ধরে ভারত যদি বাংলাদেশের চারিদিকে সৈন্য মোতায়েন করে এক বস্তা চাউল কিংবা তেল আমদানি বন্ধ করে দেয়। যদি সমুদ্র সীমা লঙ্ঘনের বিরম্নদ্ধে তৎপর হয় কিংবা আকাশসীমা লঙ্ঘনের দায়ে বাংলাদেশের যে কোনো বিমানকে ভূপাতিত করার নির্দেশ দিয়ে থাকে তাহলে আছে কি বাংলাদেশী বিরম্নদ্ধিদের কোন শক্তি যা দিয়ে ভারতের একগাছি চুল ছিড়তে পারবে ? আছে কি বিএনপি নেতা নেত্রীদেও এমন যাদু যা দিয়ে তারা বিপদ কাটিয়ে উঠে দেশ কে নিয়ে যাবেন শান্তির দোর গোড়ায় ?

২০♦ দিন বদলের সরকার♦

গেল দু'সপ্তাহ যাবত প্রায় পত্রিকাতে কোনো না কোনো লেখক কিংবা রাজনীতিবিদ বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের কার্যকলাপ নিয়ে নানাবিদ মুখ রোচক কথাবার্তা বলে যাচ্ছেন। ভূলত্রম্নটি সহ সমালোচনা করা ও দিক নির্দেশনা করা অবশ্যই গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে দিন বদল কথাটির দ্বারা আমরা কি বুঝি ? আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তার নির্বাচনের সময় সর্বত্রই ইংলিশ শব্দ 'চেইঞ্জ' কথাটির দ্বারা ঝড় তুলেছিলেন। কারণ আমেরিকার জনগণ যুদ্ধবাজ প্রেসিডেন্ট বুশের একগুয়েমি ও রাষ্ট্র পরিচালনার অদক্ষতায় অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করছিল।

যে কারণে তারা চাইছিল এই অবস্থার পরিবর্তন বা চেইঞ্জ ঘটুক। বাংলাদেশেও বিগত নির্বাচনের সময়ে আওয়ামী লীগ এই 'চেইঞ্জ' শব্দটিকে অনুকরণ করে বাংলায় 'দিন বদল' হিসাবে শেস্নাগান দিয়েছিল। কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর দু'চারজন কলাম লেখক ও সমালোচক বাংলাদেশের বর্তমান সরকারকে 'দিন বদলের সরকার' বলে অভিহিত করতে থাকেন। এরপর থেকে এই বাক্যটির ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে, ব্যবহার হচ্ছে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' শব্দ দু'টির।

কিন্তু দিন বদলের কথা বললেই কি রাতারাতি দিন বদল করা যায়? হাঁ প্রাকৃতিক ভাবে অবশ্যই দিন বদল হয়, কিন্তু যে অর্থে বা যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এই দিন বদলের কথা বলা হয়েছে তার স্বার্থকতা কখন ? এবং কোথায় ? অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে বৎসর

অতিবাহিত হওয়ার পুর্বেই যদি খাদ্য, বিদ্যুত, পানি, চাকুরি ইত্যাদি না দিতে পারো তো গদি থেকে হটে যাও।
আমরা তো তোমাকে ভোট দিয়েছি। এই ভোটের খোটা আর খুচায় কবির কবিতার কথা মনে পড়ে " শৈবাল দিঘীরে বলে উচ্চ করে শির, লিখে রাখো এক ফোটা দিলেম শিশির"। ভোট তো কাউকে না কাউকে দিতেই হবে ; আর যে বা যারা ভোট চায় তারা ওতো কিছু না কিছু কথা বলতে হবে। কথা বলতে গিয়ে জনগণকে আশ্বাস দিতে হয়।

শুধু বাংলাদেশ নয় পৃথিবীর সব দেশের ভোট প্রার্থীরা তাই করে থাকেন। মানুষকে আশ্বাস দেন অর্থনৈতিক মুক্তির, শিড়্গা, চাকুরি ইত্যাদির। দেশের যারা শিড়্গা বঞ্চিত তারা হয়তো এই পৃথিবী ও দেশের অর্থনৈতিক হালচাল অতটুকু বুঝে না। কিন্তু যারা এদেশের শিড়্গিত সমাজ, তারা তো ভালই জানেন বাংলাদেশের কি সামর্থ্য আছে? এদেশের যেকোন সরকার তার জনগণকে কতটুকু দিতে পারবে? যে দেশের মাটিতে সকল প্রকার মৃত্যুর হিসাব বাদেও বৎসরে প্রায় সাড়ে আঠারো লক্ষ মানবশিশু মাতৃগর্ভ থেকে চিৎকার দিয়ে হাজির হয় ভাত কাপড়ের জন্য, সে দেশকে সামাল দেবার মতো কে আছে এই পৃথিবীতে? শিড়্গিত সমাজের উচিত সমালোচনার ভেতর সরকাররকে সঠিক পথ দেখানো।

২১♦ বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা♦

১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ ফেব্রম্নয়ারি থেকে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত সুইজারল্যা-ের জেনেভা সম্মেলনে জাতি সংঘের "আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমার" আইনটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়। এরপর ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই আইনের আরও সুষ্টু ও পরিমার্জিত উন্নয়ন ঘটে। সেই আইনটিকে ইংরেজীতে (UNCLOS) আনক্লজ বলা হয়। অর্থাৎ 'ইউনাইটেড নেশন্স কনফারেন্স অন লো অব দ্যা সী'। সেই আইন অনুযায়ী একটি দেশ নিজ ভূখ-ের সঙ্গে সংযুক্ত এলাকার (টেরিটরিয়্যাল) উপর ন্যায়িক অধিকার দাবী করতে পারে, যার সীমারেখা হচ্ছে ১২ মাইল,(নোটিক্যাল)।

তৎসংলগ্ন 'লাগোয়া' এলাকা (কন্টেজিয়াস) হিসেবে আরও ১২ মাইল (নোটিক্যাল) নিজস্ব সমুদ্র সীমা হিসেবে গণ্য করতে হয়। তারপর হচ্ছে 'এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন' বা 'বর্ধিত অর্থনৈতিক সীমানা'। এর সীমা হচ্ছে ভূখন্ড ও সমুদ্রের জলস্পর্শ থেকে পুরো দুইশত মাইল। (টেরিটরিয়্যাল ও কন্টেজিয়াস সহ) মোট কথা দুইশত মাইল হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের সমুদ্র সীমার মাপকাটি। কিন্তু অত্যন্ত কৌতুহলের বিষয় এই যে, আশে পাশে অন্য রাষ্ট্র থাকলে এর সীমারেখা নিয়ে অনেকটা ঝামেলায় পড়তে হয়।

বিশেষ করে বঙ্গোপোসাগর এলাকাটি ইংরেজী ইউ অক্ষরের মত হয়ে যাওয়ায় এটার সীমা নির্ধারণ নির্ণয়ে সমস্যা হচ্ছে। এসবের একটা সুক্ষ্ম জ্যামিতিক নিয়ম আছে। যা বিশেষজ্ঞ ব্যতীত সহজবোধ্য নয়।

উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশের পুর্বে ও পশ্চিমে রয়েছে যথাক্রমে মায়ানমার ও ভারত। সুতরাং বাংলাদেশ যদি মুল ভুখন্ডের জলস্পর্শ সীমানা থেকে দক্ষিণ দিকে পুরো দু'শত মাইল নিজ এলাকা হিসেবে দাবী করে, তাহলে ভারত তার জলস্পর্শ ভুখন্ড থেকে পূর্ব দিকে দু'শত মাইল নিজস্ব হিসাবে দাবী খাটালে বাংলাদেশ সমুদ্রসীমার এক তৃতীয়াংশের ও বেশী এলাকাটি ভারতের এলাকা হয়ে যায়।

তদ্রুপ মায়ানমার যদি পশ্চিমের দিকে দু'শত মাইল নিজ সমুদ্রসীমা দাবী করে তাহলে আমরা সেন্ট মার্টিন দ্বীপ থেকে আর দক্ষিণ দিকে একটুও অগ্রসর হতে পারি না।

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার ভৌগলিক আইন ও জ্যামিতিক সুষ্টু হিসাবের কোনো দলিল দস্তাবেজ বা আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্য তথ্যাদি নেই। যে কারণে বর্তমান সরকার নেদারল্যান্ডের 'সামুদ্রিক আইন ও জরীপ বিশেষজ্ঞ' একটি ফার্মের কাছে ১১.৭৭ মিলিয়ন ডলারের চুক্তিতে কাজটি সম্পন্ন করার চুক্তি করেছে।

২০১১ সাল নাগাদ নেদারল্যান্ডের এই ফার্মটি সমুদ্র সীমার জরীপ,তথ্য ও আইনগত দিকটির 'দলিল দস্তাবেজ' তৈরি করে বাংলাদেশ সরকারকে হস্তান্তর করবে । তারপর বাংলাদেশ সরকার জাতি সংঘের কাছে এই দলিল বা ফাইলটিটি হস্তান্তর করবে।

মায়ানমার ও ভারত বহু আগেই তাদের জরীপ কৃত দলিল ও সমুদ্র সীমার দাবীনামা জাতি সংঘের কাছে জমা দিয়েছে। সুতরাং বর্তমানে বঙ্গোপোসাগরে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কাজটি আপাতত কয়েক বৎসরের জন্য স্থগিত থাকবে। সীমানা চিহ্নিত বা নির্ধারিত হয়ে গেলে নিজ নিজ এলাকায় খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান কিংবা উত্তোলন নিয়ে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ঝামেলা পোহাতে হবে না। দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশের সকল নাগরিকগণ দেশের সমুদ্রসীমা ও তার অন্তর্গত খনিজ সম্পদ সমুহ উত্তোলনের জন্য শান্তিপুর্ণ ও ন্যায় ভিত্তিক পদক্ষেপ কামনা করেন।

২২ ♦ জনগণ আর কত ষড়যন্ত্র দেখবে ? ♦

২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহের কথা প্রায় সকল বাঙালি নাগরিকদের জানা। এই ষড়যন্ত্রের কারণে অকালে প্রাণ হারালেন অফিসারগণ সহ সাধারণ মানুষ। এই হত্যাকা-কে উপলক্ষ্য করে ষড়যন্ত্র চলছে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন, পররাষ্ট্র মন্ত্রী দিপু মনি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ, শেখ ফজলে নুর তাপস, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার আ.ম.স. আরেফিন সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে।

এই মাত্র খবর পাওয়া গেল বঙবন্ধু হত্যা মামলার রাষ্ট্র পক্ষের প্রধান কৌশলী আনিসুল হক, সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তা এটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম, ও বিশেষ বিচারক এ.কে. রায় কে হত্যার হুমকি দিয়ে চিটি দিয়েছে ৫টি জঙ্গি সংগঠন।

তাদের কী এমন মহা অপরাধ যে তাঁদেরকে হত্যা করতে হবে ? তাহলে কি বাংলার মাটি থেকে ন্যায় বিচারকে উপড়ে ফেলা হবে? এথেকে কি প্রমাণিত হয় না যে আমরা যারা সাধারণ মানুষ আমরা কত অসহায়? শুধু হুমকি ও মৃত্যুর চিটি নয় আসছে ফোন বার্তা এবং ইমেইল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে শুধুই ষড়যন্ত্র আর ষড়যন্ত্রের কালো ইতিহাসে ভরপুর হয়ে রইলো বাঙালির ইতিহাস।

দেশের জনগণ কি ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাস ও গু-ামীর জন্য এই দেশটা স্বাধীন করেছিল লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের রক্তের বিনিময়ে? এসব ষড়যন্ত্রকারি কারা তা প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা এবং গডফাদারদের মুখের কথাবার্তা এবং মন্তব্য থেকে। প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের চিটির ভাষা ও টেলিফোনে বার বার হুমকি দেয়ার সুত্র থেকে। আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে জঙ্গি সংগঠনের আটককৃত বিভিন্ন অপরাধীদের জবানবন্দিতে।

যারা এদেশের সাধারণ মানুষের কোন উন্নতিকে দেখতে পারে না, মানুষ খুন করে ধর্মীয় সাম্রাজ্য বিস্তার যাদের নেশা, যারা নিজেদের কায়েমী স্বার্থ ও আধিপত্যকে বজায় রেখে নিজ বংশ গোষ্ঠীদেরকে টিকিয়ে রাখতে চায় তারাই এর হোতা, তারাই ষড়যন্ত্রকারি। এরা জনগণের মাঝে বিজ্ঞান শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা চায় না। কারণ জনগণ এরকম শিক্ষা পেলে তারাও সমাজ সচেতন হয়ে ষড়যন্ত্রকারিদের নির্মুল করে দিতে পারে এই ভয়ে এরা সাধারণ

মানুষকে মিথ্যা ও ভুয়া বানানো গল্প ও খবর তৈরি করে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে অন্ধকারে রাখতে চায়।

এদের ষড়যন্ত্রের লীলাখেলা দেখে দেশের বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান এমনকি পরিবারের নাগরিকরাও তা অনুকরণ করছে, আয়ত্ব করছে। এভাবে পুরো জাতি ষড়যন্ত্রের আয়ত্বে দুষিত হয়ে উঠছে। ঘরে ঘরে কেবলই ষড়যন্ত্রের খেলা। প্রবাসের মাটিতে চলছে বাঙালিদের মধ্যে নানাবিধ রঙিন ষড়যন্ত্রের খেলা। যে কারণে আমাদের প্রতি, আমাদের জাতির প্রতি, বিশ্বের বিবেকবান মানুষের রয়েছে অবহেলা, উদাসীনতা আর এড়িয়ে চলার প্রবণতা। এতসব ষড়যন্ত্রকে আর খাটো করে দেখলে চলবে না।

ষড়যন্ত্রের বিরম্নদ্ধে নিতে হবে কঠোর পদক্ষেপ ও সঠিক বিচার। আল-কোরআনে বলা হয়েছে "ফেতনা, হত্যার চেয়েও মারত্মক"। ফেতনার ডিম প্রসব হয় ষড়যন্ত্রের গর্ভে। ষড়যন্ত্র সৃষ্টি হয় নিজ বংশ ও গোষ্ঠীর স্বার্থ এবং নিজেদের মিথ্যা অহংকারকে টিকিয়ে রাখার মানসিকতা থেকে। সুতরাং এই মানসিকতা দুর হতে পারে উপযুক্ত শিক্ষা এবং শিক্ষার অপর পিঠে কঠোর শাস্ত্মি দানের আইনকে বলবৎ করে। অতএব ষড়যন্ত্রের দুর্গ বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির শেস্নাগান হোক "ষড়যন্ত্র নিপাত যাক, দেশ ও সমাজ মুক্তি পাক"।

২৩ ♦ নির্মম ফারাক্কা বাঁধ ♦

ভারতে যতই গণতন্ত্রের চিলস্নাচিলিস্ন হোক। যতই ধর্ম নিরপেক্ষতার বুলি আওড়ানো হোক, যতই উত্তম শাসনের জারিগান গাওয়া হোক কিন্তু কোন দিনও মানুষের প্রকৃত জান মালের নিরাপত্তা কেউ দিতে পারবে না। সাম্প্রদায়িকতার দাবানল থেকে কেউ কোনো নিরাপত্বার গ্যারান্টি দিতে পারবে না। যতক্ষণ না ভারতের প্রতিটি বৃহৎ জাতির জন্য তাঁদের নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিজ নিজ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজ্যের উত্থান ও বিকাশ না ঘটেছে। নতুবা এ দাঙ্গা থাকবে চিরকাল। ফারাক্কা বাঁধের কোনো শান্ত্মিপূর্ণ সমাধান বাঙালি জাতির জন্য নেই। কারণ এটা দেয়া হয়েছে একটি বিশেষ লুকায়িত উদ্দেশ্যে।

যেটার সুদুর প্রসারী চিন্ত্মাধারার তাৎপর্য হলো বাঙালি জাতির মধ্যে চির শত্রম্নতার বীজ বপন। **যাতে ভবিষ্যতে বাঙালি কোন জাতীয়তাবাদের উন্মেষ না ঘটে।** এটাকে কেবল মাত্র জার্মান বার্লিনের বিকল্প দেয়ালের সঙ্গেই তুলনা করা যায়। আমি অনেকটা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি যে বাঙালি কয়েক ডজন মানুষ যদি দিলস্নীর দরবারে মন্ত্রীত্ব লাভ করেন।

এমনকি প্রধানমন্ত্রীর পদও অলংকৃত করেন তবুও ফারাক্কা বাঁধের শান্তিপূর্ণ সমাধান বাংলাদেশের সাথে করতে পারবে না।

আমি সমস্ত জাতিকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি, যে জাতি ও গোষ্ঠীর কল্যাণ ও উপকারের দোহাই দিয়ে এ বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল তারা বেঁচে থাকতে এবং তাদের রামদা বর্শা, ছুলফি, ঝাটা, লাঠি এসব থাকতে তার সমাধান কোনদিনও হবে না। কারণ দু'ভাই যখন ঝগড়া করে। তখন একে অন্যকে বলে থাকে 'গায়ে একবিন্দু রক্ত থাকতে আমার দখলি আম গাছের ভোগস্বত্ব আমি দেব না। কিংবা আমার চালা ঘরের পানি-পতন অংশের এক ইঞ্চি জমি আমি বেঁচে থাকতে ছাড়মু না'। ব্যাপারটা ঠিক তেমনি।

শব্দ সংখ্যা: ২৩৫

২৪ ♦ ওদের ফাঁসি আর কত দুরে ? ♦

ইতিহাসের অধ্যায়কে দলে পিষে উলেস্নখ করা হয় ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর আম্রকাননে নবাব সিরাজ উদ-দৌলার প্রধান সেনাপতি মীর জাফর আলী খাঁনের কাঁধে ভর করেই বাংলার স্বাধীনতার সুর্য অস্ত্ম গিয়েছিল। বলা হয় সিরাজ-উদ-দৌলা ছিলেন পার্সিয়ান বংশবদ, তিনি বাঙালি ছিলেন না। সে সময় অবিভক্ত ভারতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার একচ্ছত্র অধিকারী ছিলেন নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁন। তারপর বাঙলার মসনদ পেয়ে যান আলীবর্দী খান। তারা কেউ-ই বাঙালি ছিলেন না ঠিকই, তাদের বাপ দাদার কোন মৌরসী তালস্নুক ছিলনা এখানে।

তারা সবাই ছিলেন বহিরাগত, সুযোগ সন্ধানী, ভাগ্যান্বেষী। সেই হিসাবে বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, পতুর্গীজ কিংবা ফরাসীরা ও ছিল সুযোগ সন্ধানী এবং ভাগ্যান্বেষী। শিড়্গা, ঐক্য এবং সাহসের অভাবে কোনো বাঙালি তৎকালীন বৃহৎ বাঙলার সম্রাট কিংবা একচ্ছত্র শাসক হতে পারেন নি। একারণে বাঙলা ও বাঙালির ইতিহাসে সব সময়েই বিদেশী শাসকরা এই ভূখে- তাদের রাজত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে। যদি অতীত কাল থেকে **শিক্ষা ঐক্য এবং জাতীয়তাবোধ** গড়ে উঠতো তাহলে বাঙালি ও বাঙলা ভূখ-টি বিজাতীয়দের দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হতো না।

আজকের আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, তুরস্ক, আবিসিনিয়ার মতো দেশ থেকে ভাগ্যের অন্বেষনে এসেছিল খান, শাহ, খাঁ, সৈয়দ, জঙ্গা, ভুইয়া, কর্রানি, এই সেই বংশ উপাধি নামের ব্যক্তি ও বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠি। কোনো কোনো সময় এদেরই বংশোদ্ভোত বখাটেরা পেয়ে

গেছে সুলতান বা শাসক হওয়ার সুযোগ। তাই এদেরই বংশ জাতরা বাঙলার মাটিতে জন্ম এবং বিয়ে শাদী করেও বাঙালি জাতীয়তাবাদকে মন থেকে গ্রহণ করতে পারে নি। একারণে বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং বাঙলা ভাষা অন্ধকারের আবর্তে ঘুরতে থাকে। সন্দ্বীপের সুধারাম গ্রামের কবি আব্দুল হাকিম ১৬৮০ সালে তাঁর "নুরনামা" গ্রন্থে ড়োগভে দুঃখে বলেছিলেন," যে জন বঙেতে জন্মি হিংসে বঙবাণী, সে জন কাহার জন্ম নির্ণয়ে না জানি'।

এই বাঙালি জাতির পরিচয়কে জাতি হিসাবে নেতৃত্ব দিয়ে বিশ্বের সমাজে স্থান করে দিয়েছিলেন যে অকুতোভয় সৈনিক তাঁর নাম 'শেখ মুজিবুর রহমান' (তাঁর উপর আলস্নাহর রহমত বর্ষিত হোক) । শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি যুগশ্রেষ্ঠ এই বাঙালিকে। হয়তো এই মহা নায়কের পুর্ব পুরম্নষরাও এসেছিলেন বাঙলার বাইরে থেকে। কিন্তু তিনি এদেশে জন্ম গ্রহণ করে পুর্ব পুরম্নষদের নাম উপাধির অহংকারে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাঙলা ভাষাকে ঘৃণা করেন নি।

তিনি ও ছিলেন শের-এ-বাঙলা এ কে এম ফজলুল হকের মতো খাঁটি বাঙালি। ষড়যন্ত্রের হোতা খন্দকার মোশতাক, রাশেদ চৌধুরী, খন্দকার আব্দুর রশিদ, নুর চৌধুরী, পাশা, হুদা, সৈয়দ ফারম্নক রহমানদের মতো বিদেশী বংশের নামধারী কুলাঙ্গার ও বাঙালি বিদ্বেষীরা আমাদের প্রিয় নেতাকে পরিবারসহ হত্যা করেছে।

৩৪ বৎসর পর হলেও ঐতিহাসিক রায়ে জাতি আজ আনন্দিত । খুনী নুর চৌধুরীকে ক্যানাডা থেকে ফেরত নেয়ার জন্য ক্যানাডার সকল দেশপ্রেমিক বাঙালিকে এখন দ্রম্নত পদক্ষেপ নিতে হবে। আসুন এব্যাপারে সম্মিলিত ভাবে আমরা একটা কর্মসুচী ও সিদ্ধান্ত নেই। যত তাড়াতাড়ি এদের ফাঁসি হয় ততই ন্যায়িক দায়বদ্ধতা থেকে আমারা রেহাই পাবো।

২৫ ♦ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক ♦

পৃথিবীর যে কোন দেশের গ্রামের কথা বলি কিংবা শহরাঞ্চলে বসবাসরত মহলস্নার কথাই বলি সেখানে সবাইকে প্রতিবেশী নিয়ে বসবাস করতে হয়। মানুষজাতি নিয়েই আমাদের সমাজ, সুতরাং মানুষের কাছে মানুষের সহাবস্থান থাকবে এটাই স্বাভাবিক ও চিরন্তন।

ঘুম থেকে উঠে প্রতিবেশীকে 'সালাম' দেয়া কিংবা 'সুপ্রভাত' বলার পরিবর্তে যদি একে অন্যের মুখ দর্শন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া হয় কিংবা চেহারার অবস্থা রুঢ় ও কঠিন প্রতিভাত হয় তখন সমস্ত দিনটাই অশুভ অনানন্দ ও দুশ্চিন্তার মধ্যে ডুবে থাকে। মনে অহরহ

চিন্তার ঢেউ জাগে হয়তো প্রতিবেশী আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। যদি ষড়যন্ত্র করে থাকে তাহলে তাহাকে দমানোর জন্য অবশ্যই আরও কঠিন পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রতিবেশীর উঠানের বৃষ্টির পানি কিংবা নুয়ে পড়া পেয়ারা গাছের পাতা আমার যায়গায় পতিত হলে আমি তাই নিয়ে একহাত দেখাবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি। একই মায়ের সন্তান হয়ে যখন দু'ভাই প্রতিবেশী হিসাবে একে অন্যের প্রতি হিংসায় মেতে উঠে তখন শান্তির বদলে নেমে আসে অশান্তি। এরই পরিণতি হিসাবে একদিন হয় রক্তপাত, অকাল মৃত্যু কিংবা মামলা-মকদ্দমার লাগাতর জীবন যন্ত্রণা।

সমস্ত পৃথিবীতে কমবেশি এই সামাজিক রোগ চেপে আছে নানা ভাবে। বিশেষ করে পাক ভারত উপমহাদেশে **'প্রতিবেশীর সাথে দ্বন্দ্ব'** বিষয়টি সর্বদাই প্রকট। হোক সেটা প্রতিবেশী হিসাবে কিংবা রাষ্ট্রীয় হিসাবে। ইতিহাস আমাদেরকে জানতে দিয়েছে ; এক কালে ছোট্ট ছোট্ট রাজ্যগুলো যেমন সর্বদাই একে অন্যের উপর চড়াও হতো নানা কারণে তদ্রুপ বিপদে আপদেও একে অন্যকে সাহায্য করতে একটুও কৃপণতা করতো না। আতীথেয়তা কিংবা সহানুভুতিতে এই সমাজে সব সময়েই ছিল উদার।

এই দু'রকম চরিত্র নিয়েই আমাদের সমাজ। রাষ্ট্রীয় ভাবে আমরা ভিন্ন ভূখন্ডের অধিবাসী হলেও আমাদের জাতীয় চরিত্র একই রকম ভাবে চলছে। জনসংখ্যা এবং অভাব অনটন বেড়ে যাওয়ার কারণে আমরা অতিমাত্রায় স্বার্থপর হয়েছি। সুতরাং সামান্য স্বার্থ কিংবা জ্ঞাতির জন্য এখন আমরা দ্বিগুণ স্বরে চিৎকার করতে দ্বিধা করি না। প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরে কি পেলেন এবং কি দিলেন সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে শান্তিপুর্ণ ভাবে সহাবস্থানের পরিবেশ তৈরি হয় কিনা সেটাই ভেবে দেখার বিষয়।

আমাদের ছোট্ট ভূখ-টি বার বার প্রাকৃতিক দুর্যোগে নাস্তানাবুদ হলেও আমাদের জনসংখ্যার কমতি কখনও হয় নি। এরফলে যেমন খাদ্য সমস্যা বাড়ছে তেমনি কৃষিজোতের জমি বহুল পরিমানে কমে গেছে। সুতরাং আমরা বাধ্য হয়েই খাদ্য, মশলস্না, সবজী, মাংশ, যন্ত্রপাতি সহ সবকিছুই প্রতিবেশী দেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

সুতরাং ধর্ম গেলো, পানি গেলো, ইজ্জত গেলো বলে চিৎকার চেঁচামেচি আর গালাগালি করে যারা শান্তিপুর্ণ সহাবস্থানের বদলে অশান্তি আনয়ন করতে চায় তারা নিশ্চয়ই দেশপ্রেমিক নয়, তারা কেবল নিজেদের খান্দান প্রেমিক।

শব্দ সংখ্যা: ৩৮০

২৬ ♦ যদি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ আসে ♦

অনেক আশাবাদী লেখক এবং সমাজ হিতৈষি সুশিড়্গত ব্যক্তিরা মনে করেন দেশকে যদি বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পুর্ণ করা যায় তাহলে অনেক কলকারখানা গড়ে উঠবে এবং প্রচুর বেকার সমস্যা কমে যাবে। এই ধারণা আমি ও মনেপ্রাণে পোষণ করতাম এবং এখনও করছি। ভবিষ্যতে ও করবো। কিন্তু গভীর ভাবে চিন্ত্মা করে দেখেছি, যে দেশের মানুষ একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি ব্যবহার করে গ্যাস সম্পদকে রড়্গা করতে জানে না, সেদেশে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ এলেও আশানুরম্নপ কোন লাভ হবে না।

প্রিয় পাঠক ; আপনারা নিশ্চয়ই জানেন বাংলাদেশে আপনি যতই রান্নার জন্য গ্যাস ব্যবহার করেন তার জন্য প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট গ্যাস বিল দিতে হয়। এজন্য আপনি যত ইচ্ছে গ্যাস ব্যবহার করম্নন তাতে আপত্তি নেই। বাস্ত্মব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে সেই রান্নার চুলাটি কেউ নেভায় না, মৃদু হলেও ২৪ ঘন্টা গ্যাস পুড়তেই থাকে। অথচ রান্নার কাজ শেষে গ্যাস নিভিয়ে দিলে কোন ড়্গতি হয় না।

প্রয়োজনের সময় একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি ব্যবহার করে আবার গ্যাস জ্বালানো যায়। গ্যাসের মিটার স্থাপনার অভাবে সরকার মানুষকে এই সুবিধা দিয়েছে। সুতরাং বিবেকহীনদের মতো ২৪ ঘন্টা গ্যাসের চুলস্নী জ্বালিয়ে রাখে যে জাতি; ওই জাতিকে কে সামলাবে? এখন গ্যাস সরবরাহ বা সাপস্নাইতে ঘাটতি দেখা দিয়েছে তাই সবার টনক নড়ছে, চেঁচামেচি শুরম্ন হয়েছে।

যে গৃহিণীরা একটি দিয়াশলাইর কাঠি ব্যবহারের অলসতায় চব্বিশ ঘন্টা গ্যাসের চুলস্নী জ্বালিয়ে রাখতেন সেই গৃহিণী এখন কেরোসিনের চুলস্নীতেই অত্যন্ত্ম বিরক্তির সাথে রান্না করছেন। আর এই বিরক্তির যত ঝাঁজ বা তেজ আছে সবই মিটাচ্ছেন কাজের বুয়া কিংবা কাজের মেয়েদের উপর। এই যখন অবস্থা তখন ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পেলে আমরা কি করবো ? একটু অনুমান করা যায় ? ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ এলেও কলকারখানা স্থাপনের কাজটি এত সহজ নয়।

এর কারণ প্রযুক্তি, দড়্গ শ্রমিক, মুলধন বা পুঁজির যোগান, বাজার প্রতিযোগিতা, দড়্গ ব্যবস্থাপণার অভাবে, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এবং দুর্নীতির কারণে মুনাফা আশানুরম্নপ হবে না। কল কারখানা স্থাপন করে যে চাকুরির সংস্থান হবে তার চেয়ে বেশি ড়্গতিগ্রস্থ হবে মানুষ ফ্যাক্টরী ও বিভিন্ন কেমিক্যাল কারখানা থেকে নির্গত দুষিত বর্জ্য দ্বারা। রোজগারের সমস্ত্ম টাকা শ্রমিককে দিতে হবে ডাক্তার, ঔষাধ পরীড়্গা নিরীড়্গার খাতে।

জ্বরাজীর্ণ স্বাস্থ্য এবং অপরিচিত রোগ বালাই দ্বারা শ্রমিক ও তৎ এলাকার জনসমষ্টি শুধু ভোগতেই থাকবে অশান্তিতে।

যথেষ্ট বিদ্যুৎ এলে বাঙালির ঘরে ঘরে টেলিভিশন, ভিডিও আর ফ্রিজের ব্যবহার বাড়বে। অতিরিক্ত ডিপ ফ্রিজ খরিদ করে (ব্যাঙ্কে টাকা জমানোর মতো নেশায়) মাছ মাংস ইত্যাদি যত পারা যায় ফ্রিজের মধ্যে রেখে গরিবদের ক্রয় ক্ষমতা ও নায্য মুল্যের চাহিদার মু-পাত করবে বাঙালি। এ ছাড়া ভিডিও গেইম, ফ্যাশনেবুল তোরণ, গেইট, হাই ভলটেইজ ফ্যান, এয়ারকন্ডিশন ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক বিলাস দ্রব্যের প্রতিযোগিতায় বাঙালি নাচতেই থাকবে। বিদ্যুত শক্তিকে উৎপাদন খাতে খরচ না করে আরাম আয়েশ স্বার্থপরতা এবং অপচয়ের স্রোতে বাঙালি বিদ্যুতের বারোটা বাজাবে। সরকারকে দিতে হবে ব্যাপক ভর্তুকি।

২৭ ♦ নতুন ঘরে পুরানো আসবাবপত্র ♦

বাংলাদেশের পতাকা বদলেছে, নাম বদলেছে, বদলেছে জাতীয় সঙ্গীত আর কিছুই বদলায় নি। কাজেই যে বা যারা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করছেন তারা ওই অতীতের আমলাতান্ত্রিক ধারায় কাজ করে যাচ্ছেন। নতুনত্ব ও পরিবর্তন কিছুই আসে নি। তারা নতুনত্বের কোন ধারনা, জ্ঞান বা প্রস্তাব কিছুই পান্‌নি। আর পেলেও তা আমলে নেয়া হয় নি।

এমনকি নিজ থেকেও নতুনত্বের কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয় নি। দেশে মানুষের অভাব নেই এবং তাদের মনমানসিকতা থেকে আধুনিক যুব সমাজের মন-মানসিকতা অনেক উন্নত। বর্তমান চাকুরিজীবী কর্মকর্তারা যে কাজ করছেন এবং যে নমুনায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তার থেকে ৬০ শতাংশকে অপসারন করে শিক্ষিত যুব সমাজকে চাকুরিতে নিয়োগ দেয়া হলে দেশের উন্নতির আশা-বেশি করা যায়।

বোমার আঘাতে বারুদের বিষ-বাষ্পে জ্বলন্ত ও পোড়ামাটির ভিয়েতনাম খুইয়েছে বহু কিছু। খুইয়েছে প্রায় ৬০ শতাংশ পুরুষ এবং ৩০ শতাংশ নারী। এত পুরুষ নিধন হওয়া সত্ত্বেও ভিয়েতনামের অফিস আদালত ও জনজীবন অচল হয়ে যায় নি। ফরাসী বিপ্লব প্রমাণ দেয় যেকোনো দেশে আমুল পরিবর্তন আনতে হলে আমলা, কর্মচারি ও অধিকাংশ পুরানোদের অপসারন করতে হবে। তা না হলে দেশের আমুল পরিবর্তন কিছুতেই সম্ভব নয়।

নতুন ঘরে পুরানো আসবাবপত্র (বা ফার্ণিচার) যেমন শোভা পায় না, পুরানো ফার্ণিচারে যেমন থাকে উলস কিংবা ঘুনে ধরা পোকা। বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও ঠিক তাই।

এমন ভাবে বসবাসের চেয়ে মানুষ পরাধীনতাকেই বেশি ভালবাসতে শুরম্ন করবে। শুধু ধর্মপ্রাণ হয়ে সফেদ দাড়ি রেখে যারা মনে করেন তারা ইসলামী আদর্শে দেশ সেবা করে পুণ্য কামাচ্ছেন তারা নিশ্চয়ই ভুল করে যাচ্ছেন। তাদের চারিপার্শ্বে, চোখের সামনে অন্যায় হচ্ছে অবিচার হচ্ছে অথচ সে প্রতিবাদ করছেন না, বিপস্নবে যোগ দিচ্ছেন না।
বুঝে নাবুঝে কেবল ধর্মীয় পাটির প্রত্যেক কথায় জ্বী হুজুর বলে যাচ্ছেন, তিনিদের দ্বারা ইহকাল কিংবা পরকালের কোনো মঙ্গল হবে না। যারা এভাবে নির্লিপ্তও উদাসীন থাকেন এবং আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পাশ কেটে চলেন তাদেরকে কেউ ভালবাসতে পারে না। বর্তমানে প্রয়োজন এদেশের প্রতিটি মানুষের ফরাসী বিপস্নব সম্বন্ধে জ্ঞান দান এবং নতুন বাংলাদেশে নামের ঘরটি থেকে পুরাতন ফার্ণিচার সরিয়ে ফেলা।

২৮ ♦ হরতালের রাজনীতি ♦

গত ২৬ নভেম্বর ১৯৯৮ তারিখে টরন্টো থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক দেশে বিদেশে' পত্রিকায় জনাব এমাজউদ্দীন আহমদ এর লিখা 'বাংলাদেশের হরতাল কালচার' নামে একটি প্রবন্ধ আমার পাঠ করার সৌভাগ্য হয়েছে। লেখকের অনেক বক্তব্যের সত্যতায় সমর্থন থাকলেও দু'টি ব্যাপারে আমি দ্বিমত পোষণ করি। তার প্রথমটি হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিনের জিয়ে থাকা সমস্যার সমাধান।

লেখক তার নিবন্ধে উলেস্নখ করেছেন 'পার্বত্য চট্টগ্রামের মত দেশের এক দশমাংশ এলাকা, সরকার সংবিধানের বিধি লঙন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলায় উপজাতীয় জনসমষ্টি ও বাঙালিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, ঐ এলাকায় বাঙালিদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদায় অবনমিত করে, সমগ্র এলাকাকে উপজাতীয় অধ্যুষিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা দিয়ে জাতীয় স্বার্থ যেভাবে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে তার প্রতিবাদে আরও একদিন হরতাল ডেকেছে বিরোধী দল সমুহ'।

দেশের জনগণ ভালই জানেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ওই এলাকা সমুহ অতীতকাল থেকেই আদিবাসিদের (উপজাতীয়দের) আবাসভূমি। তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের আমলে নানাভাবে নিগৃহীত ও বঞ্চিত হয়েছে। তাদের প্রতিবাদে কেউ কান দেয় নি। তারা বিচার চেয়েছে বিচার পায় নি। শেষ অবধি তাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকেছে, তাই বাধ্য হয়ে অস্ত্র হাতে নিয়েছে। কিন্তু এই রক্তপাত বন্ধ করার জন্য কিংবা মানবিক ন্যায্য অধিকার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিগত সরকারগুলো কোনো স্বতস্ফূর্ত চেষ্টা করে নি। যা করেছে তা ছিল লোক দেখানো ভাওতা মাত্র। বর্তমান সরকার সেই দ্বন্দ্বের একটা মীমাংশা করে দিয়েছে।

কিন্তু সংবিধানের বিধি কীভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে ? তা লেখক এমাজউদ্দীন কিংবা বিরোধি দলের কেউ'ই সংবিধানের ধারা উপধারা উলেস্নখ করে বলেন নি। কিংবা ব্যাখ্যা ও দেন নি। ব্যাপার গুজব রটানোর মতই নয় কি ? বিরোধী দলতো বার বার বলে আসছে 'ভারতের কাছে দেশ বিক্রি করে দেয়া হয়েছে' এসব পাকিস্ত্মানি আমলের জিগীর আজকাল পঁচা পুতিগন্ধময়। এই দেশটা কি কলা না টমাটো ? যে সের দরে বিক্রি করে দেয়া যাবে ? যে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, যে রাজনৈতিক দলের আমলে বাংলার মাটি থেকে ভারতের হাজার হাজার সেনাবাহিনী কোনো বিরোধ ছাড়া'ই নিরবে চলে গেছে। সেদল কখনও দেশ বিক্রি করার মতো উদ্ভট আক্কেলজ্ঞানহীন কর্মের পায়তারা করতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসি (উপজাতি) উচ্ছেদ এবং বাঙালিদের অবাধ হারে জমি দখলের ও বসতি স্থাপনের যে ডাকাতি চলছিল তাতে কেউ অবশ্যম্ভাবী সমস্যার কথা ভাবেনি। "জোর পুর্বক কিংবা কৌশল পুর্বক" উচ্ছেদ'ই যদি অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী হয়, তাহলে ইহুদিরা প্যালেস্টাইনিদের উচ্ছেদ করে ঠিক কাজটি'ই করেছে। সেখানে তাহলে কেন দুনিয়ার মুসলমানদের এত মায়া কান্না?

প্যালেস্টাইনিরা নির্যাতীত তাই আমরা তাদের ন্যায্য দাবীকে সমর্থন দেই। কিন্তু আদিবাসিদের (উপজাতীয়দের) বেলায় জনাব এমাজউদ্দীনের মতো বিজ্ঞ মানুষেরা কেন এত বিরাগভাজন বুঝতে পারি নি? শেখ হাসিনা যদি আদিবাসি (উপজাতি) অধ্যুষিত এলাকা ঘোষণা না দিয়ে পুনরায় বাঙালি এলাকা হিসাবে ঘোষণা দিতেন, তাহলে বিবাদটা আরও চরমে উঠতো।

অর্থাৎ আদিবাসি (উপজাতি) এলাকাটি বাঙালি এলাকায় পরিপূর্ণ রূপ নেওয়ার জন্য সেখানে আদিবাসি (উপজাতি) উচ্ছেদ কর্মটি আরও জোরদার হত। তৎসঙ্গে আদিবাসিদের অতীতকাল থেকে লালন করে আসা নিজ নিজ ধর্ম কৃষ্টি ও সামাজিক মুল্যবোধের ধ্বংস ধস নেমে আসতো। সুতরাং 'উড়ে এসে জুড়ে বসার' বিবাদটি মীমাংশার একমাত্র পথই হচ্ছে শেখ হাসিনা সরকারের সঠিক সিদ্ধান্ত্ম। পৃথিবীর বহু শান্ত্মিকামী দেশ এ সিদ্ধান্ত্মকে সঠিক সিদ্ধান্ত্ম বলে রায় দিয়েছে।

এখন বাঙালিদের সেখানে একই কালচার হিসাবে বসবাস করার দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সেখানকার ভূসম্পত্তি 'ভূমি ও বন সংরক্ষণ' নীতির আওতায় যাচাই করে দেখতে হবে। নামমাত্র মুল্যে তা খরিদ করলে চলবে না। ন্যায্য দাম নির্ধারিত করতে হবে। ঘুষ বখশিশের মাধ্যমে ইজারা কিংবা বন্দোবস্ত্ম নিয়ে এলে চলবে না। বিষয়টি বাণিজ্যে পরিণত করার নামই তো হচ্ছে অশান্ত্মি।

সুতরাং সরকারকে দেখতে হবে এই বন্দোবস্ত দেয়ার মধ্যে ক্রেতা কিংবা বন্দোবস্ত গ্রহণকারির স্বার্থ কি ? যদি সেই স্বার্থ রক্তপাত ও জনজীবন অশান্তির কারণ হবে বলে সম্ভাবনা থাকে কিংবা প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে কোনো সরকার'ই উক্ত এলাকা ইজারা দিতে পারে না। বা দেয়া উচিত হবে না। এতদ্ব্যতীত উক্ত এলাকার ভূসম্পত্তি সত্যিকারে অন্য কেউ ভোগদখল করে আসছে কিনা তা ও জানতে হবে এবং আদিবাসিদে (উপজাতিদের) ধর্ম, কৃষ্টি, সম্পত্তি ইত্যাদির নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয় তার নিশ্চয়তা দিতে হবে। দেশের যে কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হেফাজত করা ধর্মীয় এবং জাতীয় কর্তব্য।

জনাব এমাজউদ্দীন আরও বলেছেন সেখানকার বাঙালিদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে অবনমিত করা হয়েছে। আমার প্রশ্ন সেখানকার বাঙালিরা যে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক ছিল, তার কী'ই বা প্রমাণ আছে ? যে দেশে একটি বার্থ সার্টিফিকেট পেতে হলে হাজার নাকানি চুবানি খেতে হয়, সেদেশে আবার প্রথম শ্রেণীর নাগরিক, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক ইত্যাদি নতুন ইস্যু মগজ থেকে আমদানি করে সমাজে নতুন দ্বন্ধ বাড়িয়ে লাভ নেই।

অনেক দেশে রক্ষণশীল কায়দায় ওই সব শ্রেণী বিভাগকে অলিখিত ভাবে জিইয়ে রাখলেও বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এসব অচল। বরং নাগরিকদের বিভিন্ন গুণাবলী অনুযায়ী তাঁদেরকে জ্ঞানী নাগরিক, বিবেকবান নাগরিক, বীর নাগরিক, সৎ নাগরিক, সুশিক্ষিত নাগরিক, দেশপ্রেমিক নাগরিক ইত্যাদি বলা যেতে পারে।

২৯ ♦ পারিবারিক নারী নির্যাতন ♦

একটানা আড়াই ঘন্টা ধরে বাংলা কাগজে প্রকাশিত খুরশিদ আলম ভাইয়ের তৈরি প্রবিবেদনটি পাঠ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করি। জানি না প্রতিবেদনটি তৈরি করতে তিনি কত সপ্তাহ ব্যয় করেছেন। ১৮ জুলাইতে (২০০৭) প্রকাশিত প্রথম পৃষ্টায় পারিবারিক সহিংসতার ঘটনার কথাই আমি বলছি। নর্থ আমেরিকায় পারিবারিক সহিংসতার উপরে লিখিত এত দীর্ঘ প্রতিবেদন আমি আজ পর্যন্ত অন্য কোনো বাংলা পত্রিকায় দেখি নি। পত্রিকা পড়ার ধৈর্য এখন আর তেমন নেই।

কত পড়বেন ? কত লিখবেন ? এসবের তো কোনো শেষ নেই। অসংখ্য ধন্যবাদ খুরশিদ আলমের এই অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য। প্রতিবেদনটির বিভিন্ন বিচার বিশেস্নষণ, গবেষণা, নিরীক্ষণ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক খুঁটিনাটি সমুহ জড় করলে যে সারমর্মটি

পাওয়া যায় তার মূলে রয়েছে **'অতি লোভ'** এবং **'পাশ্চাত্যের শোষণ প্রক্রিয়া'** এই সব নির্যাতন বা সহিংসতার জন্য দায়ী।

আরও বেশি অর্থ চাই, এই মানসিকতায় স্ত্রী, সন্তানের সাহচর্য্য ত্যাগ করে দিনরাত শ্রমে ব্যস্ত থাকলে একটা দুরত্ব আপনা আপনি সৃষ্টি হয়। অভাব আছে, অভাব থাকবে সুতরাং টাকার পেছনে অবিরত না দৌড়ে কম বিলাসিতা এবং অপব্যয় থেকে যারা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, একমাত্র তারাই জীবনে শান্তির ছোয়া পায়। এই সত্যটি আমরা অনেকেই জানি কিন্তু এই যে সামাজিক প্রতিযোগিতা, কে কার চেয়ে বেশি অভিজাত্যতা প্রদর্শন করতে পারি? এই মানসিকতাই সর্বনাশের মূল।

দ্বিতীয়তঃ এখানকার ঘরভাড়া, দৈনন্দিন খরচা এবং ক্রেডিট কার্ডের অবাধ ব্যবহারে ঋণের বোঝা মানুষের মনকে সব সময় একটা চাপের মধ্যে রাখে। এখানে এমন কোনো দিক নেই, যেদিকে কোনো না কোনোভাবে মানুষকে শোষণ করা হচ্ছে। যে কারণে মানুষ আস্তে আস্তে খিটখিটে মেজাজের হয়ে যায়। বালিশে মাথা লাগিয়ে ঘুমাবার মুহূর্তে অধিকাংশ নারী পুরুষ ভাবেন : জীবনে কি পেলাম ? এই প্রশ্নই প্রত্যেকের মগজে **'হতাশা'** নামের এক অদৃশ্য ক্যানসারের বীজ বপন করে যায়।

এভাবে বিভিন্ন অবস্থা থেকে উৎপন্ন হয় আরও বহুমুখি **হতাশার** বীজ। তারপর নিজের অজান্তেই হয় অঙ্কুর উদগম। তারপর যা হবার হয়। তবে **হতাশার** জন্য অধিকাংশ ভাবে দায়ী এদেশের শ্রমিকশোষণ ব্যবস্থাটি। আমি এজন্য ক্যানাডা দেশটাকে আহামরি কিছু মনে করি না। চাকুরি ও খানা পিনার নিশ্চয়তার বিনিময়ে সারা জীবন শোষণ করে মানুষকে মানসিক ভাবে ফতুর করার যে অপ-কৌশল সেটাকে যে যেভাবেই দেখেন না কেন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের বিচারে আমি সেটা মেনে নিতে পারি না।

সহিংসতার ব্যাপারে অনেক পুরুষ আছেন বিদেশে এসে ও দিনরাত নিজের স্ত্রী, সন্তানের কথা না ভেবে শুধুই ফ্যামিলির অন্যান্য সদস্যদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য উঠে পড়ে লাগেন। স্ত্রীর মতামতকে তেমন গুরুত্ব দেন না, উপদেশ কানে তুলেন না। ভাবখানা এইঃ রোজগার আমি করছি, পরিশ্রম করছি, লোকশান হলেও আমার, লাভ হলেও আমার, তুমার এত মাথা ব্যথা কেন ? যে সমস্ত পুরুষদের এই মানসিকতা আছে, আমি অনুরোধ করবো যত দ্রুত সম্ভব এই মন-মানসিকতা ত্যাগ করুন।

নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবেন না। এদিগে স্ত্রী সকলের জন্য সার্ভিস দিতে দিতে এত ক্লান্ত থাকেন যে তার প্রতি অনেক পুরুষের কোনো সহানুভূতি নেই। তারা মনে করেন এ আর কী এমন কাজ ? রান্না-বাড়া, ঘর-দোয়ার ঠিকটাক করে রাখা, বাচ্চাদের যত্ন

এসব তো নারীর দায়িত্ব । সারা জীবন তো দেখে আসলাম আমার মা, চাচী, নানী, চৌদ্দ গোষ্ঠী তাই করে আসছে।

এই একচোখা লোক গুলো চিরকাল মা, চাচীদের শ্রম বা সার্ভিস দেখে এসেছে কিন্তু জীবনেও তাদের বুক ভর্তি হতাশা আর নিরানন্দ জীবনের অন্ধকার দিক ভুলেও খোঁজ করে দেখে নি। অনেক কান্ডজ্ঞানহীন পুরম্নষরা মনে করে স্ত্রীর কথা, উপদেশ বা যুক্তি মানলে লোকে তাকে স্ত্রৈণ বলবে।

ওইসব পুরম্নষরা আসলেই মারাত্মক কনজারভেটিভ এবং আত্ম অহংকারি। তারা নারী অধিকার কি ? সেটা বুঝতেই চায় না। বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশ ও ধর্মীয় অপব্যাখ্যার অনুশাসনে তারা লালিত পালিত হয়েছেন। তারা নিজের বিবেক বুদ্ধিকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করেন নি। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে তারা জীবনে উন্নত মানের বই পুস্ত্মক ও তেমন পাঠ করে নি কিংবা সামাজিক ন্যায়-নীতির ব্যাপারে তাদের আদৌ কোনো শুদ্ধ জ্ঞান নেই। তারা হতে পারেন ডিগ্রীধারী ডক্টর কিংবা ইঞ্জিনিয়ার।

এরম্নপ অবজ্ঞা আর অবহেলার পরিপ্রেক্ষিতে একজন স্ত্রী মনে করেন, আজই যখন এই অবস্থা তখন ভবিষ্যতে আমার কি হবে ? তারা তখন চারিদিকে অন্ধকার দেখেন। বাচ্চাদের মায়ায় সব অবহেলা ও অবজ্ঞাকে উপেক্ষা করে তারা সংসার চালিয়ে যান। এই অবস্থা প্রতিকারের জন্য উচিত শিক্ষা জীবনে হাইস্কুলের পাঠ্য সুচিতে এ ব্যাপারে যথেষ্ট টেক্সট বুক (নির্বাচিত পাঠ্য বিষয়) থাকা। যাতে করে বাল্যকাল থেকেই নারী অধিকার ও সামাজিক ন্যায়-বিচারের বিষয়টিতে তাদের কা-জ্ঞানে বাসা বাঁধে।

অপরদিকে কিছু কিছু নারীরা আছেন তিনিরা সন্তান পালনের নামে বাচ্চাগুলোকে এমন পরনির্ভরশীল করে গড়ে তুলেন যে, স্বামী বেচারার প্রতি তাদের কোনো খেয়াল নেই। বাচ্চাদের ব্যাপারে চুন থেকে পান খসলে রাগারাগি, গোস্বা, সারাদিন নানা উছিলায় জেরা, তর্ক, বকাবকি কিছুই বাদ যায় না। স্বামী বেচারা ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে একটু জিরাবে, টি ভি দেখবে কিংবা পত্রিকা পড়বে, তাতে ও ঠাঁই নেই। স্বামী ঘরে আসতেই নানাবিদ সমস্যার কীর্তন শুরম্ন হয়ে যায়। শুরম্ন হয়ে যায় ফোনে কার সাথে কি কথা হয়েছে এই সব নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা।

স্বামী তখন মনে করেন দুই বাচ্চা পেয়েই যখন এই অবস্থা, বাকি দিনের ভবিষ্যৎ কি হবে? তার ও ভেতরে বাসা বাধে **হতাশার**। যে স্ত্রীকে তিনি বিয়ে করে নায়িকার মতো সব সময় পেতে চেয়েছেন, আহারে বিহারে, চলনে ফিরনে। সেই স্ত্রীর দিকে তাকালে

মনে হয় তিনি যেন একজন দাসী বাদীর মত সার্ভিসধারি মানুষ, নিজের শরীরের দিকে খেয়াল নেই, নিজের সৌন্দর্য্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ্য নেই। যা করলে তার শারীরিক সৌন্দর্য নষ্ট হবে তা স্বামী বেচারা বাধা দিলেও নানা অজুহাতে তিনি তা করতে থাকেন।

অনেক স্ত্রী নিজের আত্মীয়-স্বজনদের স্পনছর করে আনার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন।

পার্ট টাইম কাজও করেন, তখন সময় নাই, সময় নাই, এই গান গেয়েই তারা একে অপরের কাছ থেকে দুরে সরে যান। স্বামী মনে করে, এই স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন এই দেশে এসে যখন স্যাটেল হবে আমি তখন হবো ঘরের অবহেলিত ড্রাইবার কিংবা চাকর। সুতরাং পারিবারিক অশান্তি ও সহিংসতার জন্য নারী কিংবা পুরুষ উভয়েই কোনো না কোনো ভাবে দায়ী। এজন্য উচিত নিজের ভুল০কোথায়? তা খোঁজে বের করা। অতিলোভ ও অপব্যয় থেকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করা। বাচ্চাদের প্রতি সীমাহীন আদরের অভ্যাস ত্যাগ করে তাদেরকে স্বাবলম্ভী করে তোলা, আর সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা ও সমাধানজনিত বই পুস্তক পাঠ করে নিজেকে শুদ্ধ করা।

পরিশেষে আমি এও বলতে চাই, যেদেশের সরকার বিচারের দাবীতে নারীদেরকে পুলিশ দিয়ে প্রকাশ্যে রাস্তায় পেটায়, (প্রথম আলো, ইত্তেফাক ২০০৪/৫) এসিড দগ্ধ নারী ও ধর্ষিতা নারী বিচার পায় না, ওই দেশে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে কী ভাবে? সরকারই যখন নারীকে পেটাচ্ছে তখন পুরুষরা ভালই জানে নারীকে পেটালে কিংবা এসিড দগ্ধ করলে এর কোনো শাস্তি হবে না। সরকারই এদেশের পুরুষ জাতিকে নারী নির্যাতনের জন্য উৎসাহ দিচ্ছে। সুতরাং এইসমস্ত স্বৈরাচারি সরকার এবং তাদের সমর্থকদের যারা আজো সমর্থন করে, তাদের মগজে আমি একটু খানি টোকা দিচ্ছি, আর কত ঘুমাবেন ?

৩০ ♦ ডক্টর ইউনুসের ঘোষণা ♦

"গরিব মানুষের সন্ধানদাতাকে এক মিলিয়ন ডলার পুরস্কার" প্রিয় পাঠক, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এই বাক্যটি আমাদের নোবেল লরিয়েট ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের একটি ঘোষণা। ঘোষণাটি তিনি প্রদান করেছেন গত ৯ জুন ২০০৮ তারিখে।

আমেরিকার বোষ্টন শহরের 'জন এফ কেনেডী প্রেসিডেন্সিয়াল লাইব্রেরী এন্ড মিউজিয়ামে' এক সুধী সমাবেশে সংবর্ধনা দেওয়ার সময় তিনি এ ঘোষণা দেন। ঘোষণাটি শুনার পর তাৎক্ষণিক ভাবে উপস্থিত শ্রোতাদের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল জানিনা।

নিশ্চয়ই তারা প্রচ- হাততালি দিয়েছেন। কিন্তু এরকম একটি খবর পাঠ করার পর আমি রাত্রে ঠিকমত ঘুমাতে পারি নি। বিশ্বে আমরা যারা নেহায়েত সাধারণ মানুষ, কদাচিত বিশ্ব মানবের মঙলের জন্য কোনো খবর শুনি, সেটা আমাদেরকে বড়ই আবেগ তাড়িত করে। ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের প্রতি আমার অনেক শ্রদ্ধা।

বাংলা ও বাঙালি জাতির জন্য তিনি আমাদের এক অচিন্তনীয় গৌরব। দু'হাজার ত্রিশ সালের পর বাংলাদেশে কেউ গরিব থাকবে না এমন একটা কল্পনা মনের মধ্যে উদয় হলে কী যে আত্ম-শান্তনার মুরলী বাজে তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব ? এই হিসাবটা কিছুতেই মিলাতে পারছি না বলেই আমি নিদ্রাহীনতায় কাতর।

শুনেছি (সত্য অসত্য জানি না) প্রায় ২০ থেকে ৩০ পার্সেন্ট পর্যন্ত গ্রামীন ব্যাংকের সুদ দিতে হয়। আমার কথা হলো সুদ যতই চড়া হোক তা যদি মানুষের জন্য নির্যাতনের পর্যায়ে না পড়ে কিংবা মানুষ ব্যবসার দ্বারা এই সুদাসল স্বতস্ফূর্ত ভাবে ফেরত দেবার ক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জন করে তাহলে অভিযোগের কোন কারণ নেই। কথা হচ্ছে দরিদ্র কারা ? এই সংজ্ঞাটি হয়তো ডঃ মোহাম্মদ ইউনুসের নিজস্ব অর্থনৈতিক সংজ্ঞার সাথে আমাদের চিরচেনা সংজ্ঞার মিল নেই। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই এখানে শুভংকরের ফাঁকি লুকায়িত আছে।

তা না হলে প্রায় ১৫কোটি জন-অধ্যুষিত একটি দেশে কীভাবে দরিদ্রতা নির্মূল সম্ভব তা আমাদের পক্ষে বুঝে উঠা সত্যি মুশকিল। সাধারণ দৃষ্টিতে একজন মানুষ কিংবা একটি পরিবারের সদস্যরা যখন তাদের মৌলিক চাহিদা অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র. বাসস্থান, শিক্ষা এবং

চিকিৎসা পেয়ে নিজের জীবনকে চালিয়ে নিতে পারবে সেই হবে স্বচ্ছল মানুষ কিংবা স্বচ্ছল পরিবার।

একটি দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় কত? এই হিসাব একটি দেশের গড় আয়ের হিসাব। এর অর্থ এইনয় যে, সেইদেশের প্রত্যেক মানুষের আয় সমান। এই আয়ের সঙ্গে হিসাব থাকে দেশের মোট উৎপাদন, আমদানি রফতানী, আয়কর তথা শুল্ক এবং মানুষের গড় ক্রয় ক্ষমতার হিসাব। পৃথিবীতে মানুষ যে পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর প্রতিপালিত হয়, সেই অবস্থার উপরে তার দরিদ্রতার মাপকাঠি বিবেচিত হয়।

একারণে বাংলাদেশের একজন স্বচ্চল চাষীর সঙ্গে আমেরিকার একজন চাষীর তুলনা কিছুতেই হতে পারে না। আমেরিকার একজন শ্রমিক মাথায় ঋণ ও নানাবিধ বিলের (মুল্য পরিশোধের) বুঝা নিয়ে মার্সিডিস গাড়িতে যে শান্তি পায়। বাংলাদেশের সেই শ্রমিক ঋণমুক্ত থাকায় পরম শান্তিতে রিক্সা চড়েও সেই আনন্দ পাবার কথা। দ্বিতীয় কথা হলো জনাব ইউনুসের এই 'গরিবী হটাও' চ্যালেঞ্জটির সাথে হয়তো অপর একটি শর্ত জড়িত আছে।

আমার যতদুর সম্ভব মনে হয় শর্তটির ব্যাখ্যা এরম্নপ হবে যেমন; যে বা যারা গ্রামীন ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে **গরিবী** হালত থেকে নিজেদের অতিক্রম করতে পারবে কেবল তারাই স্বচ্ছল হিসাবে বিবেচিত হবে। এই হিসাব অনুযায়ী গ্রামীন ব্যাঙ্কের যারা ঋণগ্রহীতা নয়, তারা ডক্টর ইউনুসের ফর্মুলায় নিশ্চয়ই গরিব নয়। যেহেতু তারা ঋণ নিচ্ছেনা সেই হিসাবে তারা **গরিব** নয়। সুতরাং তাদের মধ্যে যদি কেউ গরিব হয় তাহলে এই গরিবের সন্ধান দাতা নিশ্চয়ই এক মিলিয়ন ডলার পুরস্কার পাওয়ার দাবীদার হতে পারবেন না।

কারণ তারা গরিব হিসাবে গ্রামীন ব্যাঙ্কের ঋণগ্রহীতা নয়, সুতরাং তারা গরিব ও নয়। নিশ্চয়ই এই হিসাব ডক্টর ইউনুস সাহেবের ফর্মুলার মধ্যে লুকায়িত আছে। তা না হলে আমরা বিশ্বের ধনী ধনী দেশ যেমন: আমেরিকা, জাপান, জার্মান, নরওয়ে,সুইডেন, সুইজ্যারল্যান্ড প্রভৃতি দেশগুলিতে এত প্রাচুর্য্য এত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সেখানে প্রচুর হত দরিদ্র মানুষের সন্ধান অহরহ পাই।

মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ আমীরাত দেশগুলোর কথা না হয় বাদ দিলাম। কেননা আমরা'তো আর ওদের মতো প্রাকৃতিকভাবে তৈল সমৃদ্ধ দেশ নয়। জনাব ইউনুসের এহেন বক্তব্যের সাথে আরও দু একটা অঙ্ক কষা যায় এরকম। (ক) হয়তো তিনি ভেবে দেখেছেন দু হাজার ত্রিশ সালের মধ্যে নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে (যেমন বিশ্ব উষ্ণতার কারণে বাংলাদেশের ত্রিশশতাংশ জমিন পানিতে তলিয়ে যাবে) মানুষের জন সংখ্যা (দুর্যোগ ও

জন্ম-নিয়ন্ত্রনের কারণে) এমন পর্যায়ে নেমে আসবে যেখানে জনসংখ্যার চেয়ে খাদ্য ও সম্পদ কিছুটা উদ্বৃত থাকবে।

(খ) হয়তো তিনি এমন হিসাব ও কষে দেখেছেন যে, দু'হাজার ত্রিশ সালের আগেই তিনি এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন, কিংবা বার্ধক্য জনিত দুর্বলতার কারণে তার কর্মসুচিকে বাস্তবায়নের জন্য অক্ষম হবেন। আর এ সমস্ত কারণে তার দেওয়া ঘোষণা তথা গরিব মানুষের সন্ধান দাতাকে এক মিলিয়ন ডলার পুরস্কার দেয়ার চ্যালেঞ্জটি, চ্যালেঞ্জ হিসেবে ধর্তব্যের মধ্যে থাকবে না। যবনিকা